বখতিয়ারের তলোয়ার

শফীউদ্দীন সরদার

লেখকের কথা

ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ-বিন্-বখতিয়ার খলজীর নদীয়া বিজয় থেকে দাউদ কাররানীর রাজমহলের যুদ্ধ-বাংলা মুলুকের পৌনে চারশো বছরের ইতিহাস। গৌড়পাণ্ডুয়া-তাণ্ডার মুসলমান শাসনের এক অবিস্মরণীয় ও ঐতিহ্যময় অতীত। অথচ এ অতীত আজও প্রায় অন্ধকারে। ইংরেজ এবং তাদের সহযোগীদের চাতুর্যে এই অতীত আমাদের স্কুল-কলেজের পাঠ্য তালিকাতেও আসেনি। অন্য কথায়, মুসলমানদের এই ঐতিহ্যময় ইতিহাস মানুষকে জানতে দেয়া হয় নি। এ ইতিহাসের অল্পই আমরা সাধারণেরা জানি। ইতিহাস জানবো বলে নিছক ইতিহাস আমরা কম লোকই পড়ি। অথচ "নিজেকে জানো"-এ কথাটার মূল্য দিতে হলে নিজের ইতিহাসকে জানো-এ কথাটারও মূল্য দিতে হয়। আর আমি বিশ্বাস করি, নিজের ইতিহাসটা জানা অতি সহজ হয়, যদি ইতিহাসকে সাহিত্য-শিল্পের খোলা চত্বরে পাওয়া যায়। শিল্পসাহিত্যের কাঁধে চড়ে ইতিহাস অনায়াসেই সাধারণের নাগালের মধ্যে আসতে পারে। উদাহরণ-শ্রী শচীন সেনগুপ্ত মহাশয়ের ঐতিহাসিক নাটক "সিরাজউদ্দৌলাহ্"। ত্রুটিবিচ্যুতি যা-ই থাক, শচীন সেনগুপ্ত মহাশয়ই সিরাজউদ্দৌলাহ্ ও পলাশীর সাথে সাধারণ জনের অধিক পরিচয় ঘটিয়েছেন।

আলোচ্য এ পৌনে চারশো বচরের মধ্যে এত মাল-মশ্‌লা আছে, যা দিয়ে অগণিত কাব্য, মহাকাব্য, নাটক গীতি-গাঁথা, গল্প-উপন্যাস হতে পারে। কিন্তু ইতিহাস বা গবেষণার সীমাবদ্ধ গণ্ডীর বাইরে এ আমলের পদচারণা সাহিত্য-শিল্পের অঙ্গনে বড় একটা ঘটেনি। যা ঘটেছে তা নিতান্তই নগণ্য।

তাই, আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। আমার উদ্দেশ্য কয়েকখানা উপন্যাসের মাধ্যমে এই সুদীর্ঘ পৌনে চারশো বছরের ইতিহাসকে যথাসাধ্য জনগণের নাগালের মধ্যে আনা। আমার অপটু হাতের প্রয়াস আমি পেয়ে যাই, ভবিষ্যতের দক্ষজনেরা আরো সুন্দরভাবে এই যুগের উপর আলোকপাত করবেন।

'বখতিয়ারের তলোয়ার' উপন্যাস, ইতিহাস নয়। কল্পনার কাজ অনেক আছে এখানে। ইতিহাস যেখানে নীরব, কল্পনার সাহায্যেই সে শূন্যস্থান পূরণ করতে হয়েছে। কিন্তু তাই বলে কল্পনা ইতিহাসকে ক্ষুণ্ন বা বিকৃত করবে-এ মওকা জ্ঞাতসারে আদৌ কোথাও রাখিনি। আমার লক্ষ্য ইতিহাস তুলে ধরা, মিথ্যা ঐতিহ্য তৈয়ার করা নয়। পাঠকদের তুষ্টির উপর নির্ভর করছে আমার শ্রমের সার্থকতা।

বখতিয়ারের তলোয়ার আমার ঐতিহাসিক উপন্যাস সিরিজের একখানা। লেখার কালে-এর পেছনে প্রেরণা যুগিয়েছেন অগ্রজপ্রতিম অধ্যাপক আব্দুল গফুর ও এস্ মুজিবুল্লাহ্ সাহেব। বিশেষ প্রেরণদাতা এই অধাপক সাহেবকে জ্বালিয়ে মারছি অদ্যাপিও। অনুজপ্রতিম ইউসুফ শরীফের সাহায্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে উনিই আমাকে ঢাকার পত্রিকা জগতে এনেছেন এবং ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখায় উদ্বুদ্ধ করেছেন। সাহিত্য জগতে আমাকে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস তাঁর দীর্ঘদিনের। এই উপন্যাসের "বখতিয়ারের তলোয়ার' নামকরণটা তাঁরই যা শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক আব্দুল গফুর সাহেব সঙ্গে সঙ্গে উৎফুল্ল কণ্ঠে সমর্থন করেন। উৎসাহদানের ক্ষেত্রে সুসাহিত্যিক ও কবি রুহুল আমিন খান, মান্নান মুন্সি, শাহ মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম, হাসনাইন ইমতিয়াজ, আহম্মদ সেলিম রেজা, নজরুল গবেষক দরবার আলম, সাহিত্যিক মফিজ খান, ই.ফা.বা. নাটোর শাখার প্রাক্তন সহকারী পরিচালক জাইদুর রহমান, জামাতা এ্যাডভোকেট আব্দুল ওয়াহাবসহ কম যান না আরো অনেকেই। সমধিক উল্লেখযোগ্য বন্ধুবর হাসিবুল হাসান। তাঁর সাহায্য ও সহযোগিতার কথা প্রকাশ করা আমার ভাষা নেই। প্রায়দিনই এসে এসে প্রতি পাতা পড়ে পড়ে তাঁর মূল্যবান মন্তব্য দিয়ে তিনি আমার পেছনে হাল ধরে রয়েছেন প্রায় সুদীর্ঘ বিশ বছর যাবৎ এবং আজও। অসংখ্য গ্রন্থের বোদ্ধা পাঠক বন্ধুবর হাসিবুল হাসানের এই নিরলস সহাযোগিতা বিশেষ করে ইসলামিক ভাবধারার এই ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখার ক্ষেত্রে তাঁর একটানা সাহচর্য একদিকে তাঁর বন্ধুত্বের, অন্যদিকে তাঁর সাহিত্য ও ইসলাম-প্রীতির এক প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। ভ্রাতৃপ্রতিম প্রখ্যাত আলেম ও ইসলামিক চিন্তাবিদ জনাব মুহিউদ্দীন খান সাহেব মদীনা পাবলিকেশান্স-এর তরফ থেকে আমার এই উপন্যাসটি ছাপানোর দায়িত্ব নিয়ে আমার ভেসে বেড়ানো কিস্তিটাকে কূলে ভিড়িয়ে দিলেন। আমার জিন্দেগীর এ-ও এক অবিস্মরণীয় মদদ। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জবান আমার কমজোর। এদের সবাইকে আমি আন্তরিক শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছি এবং আল্লাহ তাআলার কাছে সকলের সার্বিক কল্যাণ কামনা করছি।

ভূমিকা লিখে দিয়ে অগ্রজপ্রতিম অধ্যাপক আব্দুল গফুর আর একবার আমাকে ঋণের জালে জড়ালেন।

'দৈনিক ইনকিলাব' পত্রিকাটি আমার এই উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে ইনকিলাব সাহিত্যে ছাপিয়ে আমাকে এক অতুলনীয় মদদ দান করেছেন। এই চরমতম কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ হিসাবে রহমানুর রাহীমের কাছে হেফাজতির সাথে এই পত্রিকার উত্তরোত্তর উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করছি।

ঘরে বসে হরঘড়ি এই ঘটনা লেখারকালে আমার ফায়-ফরমায়েস্ খেটে দিয়েছে-খানিকটা ঘরণী, অধিকটা আমার জননীতুল্য তামাম তনয়ারা-বিশেষ করে সুরাইয়া পারভীন (লিপি)। পুত্রদেরও উৎসাহ আছে এর পেছনে। আল্লাহ তাআলার অপরিসীম করুণাধারা এদের সবার উপর বর্ষিত হোক। আমীন।

শুকুলপট্টি, নাটোর,
পোঃ+জেলা-নাটোর
ফোন নং ২৯০

শফীউদ্দীন সরদার
১১/২/৯২ ইং

বখতিয়ারের তলোয়ার

এক

সামাল-সামাল-

হুঁশিয়ার-হুঁশিয়ার-

আওয়াজ উঠলো অকস্মাৎ। জান কাঁপানো আওয়াজ। আসমান জমিন চমকে গেল আচানক এই আওয়াজে। আলামতটা আন্দাজ করে উঠার আগেই রোল উঠলো আফসোসের।—

হায়! হায়! হায়!

গজবের আলামত! আওয়াজ আসছে রাস্তা থেকে। সংগে সংগে রাস্তার দিকে দৌড় দিলো দুইপাশের বাসিন্দা। রাস্তার দুইপাশের আদমী-আউরাত, বাল-বাচ্চা। রাস্তার পাশে এসেই তাদের চোখ উঠলো আসমানে। সর্বনাশ!

জায়গার নাম গরমশির। আফগান মুলুকের এক প্রচীন জনপদ। এক প্রান্তিক এলাকা। গরমশিরের একদিকে সিস্তান ও অন্যদিকে গজনী। জনপদের দুইপাশে লোক বসতি, মাঝখানে রাস্তা। বালি-কাঁকড়-পাথর ঢাকা পথ। ঘটনা এই পথের উপর।

ঘটনার উৎসটা মামুলী। একটা পাল্‌কী যাচ্ছে রাস্তা বেয়ে। সুসজ্জিত পাল্‌কী। সোনালী ঝালর দিয়ে পাল্‌কীর দুয়ার ঘেরা। কোন আমির-উমরাহ্‌র পর্দানশীন জেনানা আছে পাল্‌কীতে। জোয়ান জোয়ান চার বেহারা পাল্‌কী কাঁধে ছুটছে। গতি তাদের দুরন্ত।

কোন অরক্ষিত পাল্‌কী নয়। পাল্‌কীর সাথে একদল পাহারাদার সেপাই আছে। নাঙ্গা তলোয়ার হাতে পিছে পিছে আসছে তারা।

এই সেপাই-সেনা এখন অনেক পেছনে। বেহারাদের গতিতে কোন শিথিলতা নেই। একটানা ছুটছে তারা। কিন্তু পাহারাদার সেপাই আছে পিছিয়ে। তেপান্তর পেরিয়ে এসে সেপাইদের গতি অনেক ঢিলে হয়ে গেছে। লোকালয়ে পৌছে হেফাজতির আমেজে তারা এখন ধাপ ফেলছে ধীর লয়ে। অগ্রগামী পাল্‌কী প্রায় লা-ওয়ারিশ।

ঠিক এই মুহূর্তে হঠাৎ এক পাগলা হাতী সামনে পড়লো পাল্‌কীর। লোকালয়ের একপাশে পাহাড়-টিলা সম্বলিত বিস্তৃর্ণ এক প্রান্তর। সেই প্রান্তর থেকে ছুটে হাতীটা অকস্মাৎ এই লোকালয়ের রাস্তায় এসে নামলো এবং পাল্‌কীটাকে তাক করে সামনের দিকে ছুটতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে আসমান-ছোঁয়া ধূলোর তুফান তার পেছন দিকের দিগন্ত গ্রাস করে ফেললো।

এক লহমার ব্যপার। চোখের পলক না পড়তেই পাল্‌কী আর পাগলাহাতী একদম মুখোমুখী হয়ে গেল। মাঝখানে আর জাররা মাত্র ফাঁক। হাতীটা আর কয়েক কদম

এগুলেই তার পায়ের তলে পিষ্ট হবে বাহকসহ পাল্কীটা। দিশেহারা বাহকেরা আঁতকে উঠলো আতংকে। করণীয় স্থির করতে না পেরে তারা পাল্কী ফেলে পথ থেকে উর্ধশ্বাসে পালালো। ফলে, পাল্কী আর পাল্কীর ভেতরে অসহায় যাত্রীটা পথের উপর পড়ে রইলো পাগলাহাতীর পায়ের তলে পিষ্ট হওয়ার এন্তেজারে। নিদারুণ এই পরিস্থিতি লক্ষ্য করে আহাজারীর আওয়াজটাও দুই পাশের ইনসানের গলার মধ্যে আটকে গেল। কাতারের পর কাতার বন্দী হয়ে বেহুঁশ জনতা বিকট হা করে নিস্পন্দ হয়ে গেল।

কিন্তু একি! কোথা থেকে অগ্রাহ্য এক ছোট্ট-খাট্টো আদমী ছিটকে এলো রাস্তায়। পালকীর একদম সামনে এসে দাঁড়িয়ে সে হাতীর দিকে দুই হাতে পাথর ছুঁড়তে লাগলো। নিশ্চিত মউতের মুখে লোকটাকে এই ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখে লা-জবাব দর্শকদের হা করা মুখমন্ডলের আয়তন আরো অধিক প্রসারিত হয়ে গেল।

কিন্তু আদমীটি অকুতোভয়। তিল পরিমাণ কম্পিত বা না-উম্মিদ না হয়ে সে রাস্তা থেকে পাথর তুলে এক ধারছে ছুড়তে লাগলো। হাতীটাও মানুষটাকে জড়িয়ে ধরার অভিপ্রায়ে বাড়িয়ে দিলো শুঁড়। এই বুঝি ধরলো তাকে জড়িয়ে। ঠিক এই মুহূর্তে ভারী এবং চোখা এক প্রস্তর খণ্ড হাতীর কপাল লক্ষ্য করে সবলে ছুঁড়ে মারলো লোকটা। আর এতেই হলো মুসিবতের চূড়ান্ত ফয়সালা! পাথরটা এমন জোরে হাতীর কপালে এসে ঠকাশ্ করে লাগালো যে, কপালের চামড়া এতে অনেকটখানি খুবলে গেল। যন্ত্রণায় গর্জন করে লাফিয়ে উঠলো হাতীটা এবং কি জানি কি খেয়ালে সঙ্গে সঙ্গে পাক খেয়ে ঘুরে, উল্টো দিকে দৌড় দিলো।

এতক্ষণে দম সরলো দুই পাশের জনতার। জবান খুঁজে পেয়ে তারা সমস্বরে আওয়াজ দিলো- সাব্বাস্-সাব্বাস!

ঢল নামলো মানুষের। রাস্তার দুই পাশের মানুষ বন্যার বেগে নেমে এলো রাস্তায়। হৈ হৈ করে ছুটে এলো পাহারাদার লোক লস্কর। সবাই এসে পালকী আর ঐ পাথর-ছুঁড়া আদমীটার চারপাশে বৃত্তাকারে দাঁড়ালো। তাজ্জব হয়ে দেখতে লাগলো বেপরোয়া লোকটাকে। স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে উচ্চতায় বেশ কিছুটা খাটো এক নওজোয়ান। লোহার মতো মজবুত তার দেহ খানা। বাহু দুটো অস্বাভাবিক লম্বা। ঝুলে আছে জানু তক। মুখাকৃতি এক কালে দর্শনীয়ই ছিল। গুটি বসন্তের ছোবলে সে মুখ এখন অমসৃণ। হঠাৎ করে চাইলে কুৎসিৎই দেখায়। নিবিড় ভাবে চাইলে সে মুখ আবার আকর্ষণ করে সবাইকে। পরনে তার তালী দেয়া মামুলী লেবাস। তদবিরের অভাব আর তকদিরের উপেক্ষা তার সারা অঙ্গে ভাস্বর।

জনতার মধ্যে থেকে কে একজন বলে উঠলো- তাইতো বলি-এমন বেপরোয়া বেয়াকুফটা কে? ও পাড়ার ঐ কলন্দরী কম্‌বখ্‌ত্?

পালকীর দুয়ার খুলে গেছে ইতিমধ্যেই। উঠে গেছে ঝালর। বোরকা ঢাকা একখানা মুখ পালকীর ভেতর থেকে ইতিমধ্যেই ঝুঁকে পড়েছে বাইরের দিকে। ঐ বাহাদুর নওজোয়ানটি তখনও দাঁড়িয়েছিল পাল্কির দুয়ার আগলে নিয়ে। পালকির দিকে পেছন দিয়ে দাঁড়িয়েছিল আনমনে। বাইরের ঐ মন্তব্য শুনে কি যেন কি ভাবছিলো। পেছন থেকে এমন সময় তার কানে এলো এক মিহিকন্ঠের আওয়াজ-কসুর মাফ করবেন, জনাবের পরিচয়টা কি পেতে পারি?

অকস্মাৎ এই নারী কন্ঠের আওয়াজে চমকে উঠলো নওজোয়ান। তড়িৎ বেগে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো-জি?

বোরকাবৃত মুখ থেকে পুনরায় আওয়াজ এলো-আপত্তি না থাকলে জনাবের নামটা জানতে চাই।

কোন বর্ষিয়সী মহিলা কন্ঠনয়। এ কন্ঠ তরুণীর। তাৎক্ষণিকভাবে খানিকটা হকচকিয়ে গিয়ে বাইরের মন্তব্যের সাথে সুর মিলিয়ে নওজোয়ান জবাব দিলো- নাম? মানে কম্‌বখ্‌ত্।

বিস্মিত হলেন প্রশ্নকারী তরুণী। বললেন-কম্‌বখ্‌ত্! মানে আপনার নাম-

তাজ্জব হয়ে প্রশ্নকারিণী চিন্তা করতে লাগলেন। নওজোয়ানটি সংগে সংগে সমর্থন দিয়ে বললো-জি হাঁ।

তরুণী ফের সওয়াল করলেন-তা কি করে হয়? কম্‌বখ্‌ত্ কি কখনও কোন ইনসানের নাম হয়?

ইষৎ হেসে নওজোয়ান এর জবাবে বললো-হয়। কোন ইনসানের বখ্‌ত্ যখন তার ইয়ার হয়না- দুষমন হয়,তখন তার নাম বখ্‌ত্ ইয়ার না হয়ে কম্‌বখ্‌ত্ই হয়।

পেরেশান দীলে তরুণীটি বললেন -দেখুন, আপনি আমার যে উপকার করলেন, তা সঠিকভাবে প্রকাশ করার জবান আমার দখলে নেই। আমার এই জিন্দেগী এখন আপনারই মেহেরবানীর দান। তাই বেত্তমিজের মতো আপনার সাথে তর্কে লিপ্ত হয়ে আপনার অসম্মান আমি করবোনা। তবে কথা কি জানেন, নিজের জান বাজী রেখে যে পরের জান বাঁচায়, তার নামটা জানার খাহেশ সব লোকেরই হয়।

সুরেলাই শুধু নয়। কন্ঠস্বর সুরেলা ও মধুর। প্রতিটি শব্দই যেন মৌ-রসে সিক্ত। এই মৌসিক্ত জবানে বেদনার অভিব্যক্তি স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

হুঁশ ফিরলো নওজোয়ানের। সে শরমিন্দা কন্ঠে বললো- জি মানে-

তরুণীটি বললেন-নামটা যদি কমবখ্‌ত্ও হয় আপনার, তবু আপনি আমার জন্য নেক্‌বখ্‌ত্। আপনার নেকবখ্‌তের ছোয়াবে আমার কমবখ্‌তের বালা মুসিবত সাফা হয়ে গেল।

ঃ জি?

ঃ আপনার নামটা আমি পালটে দিলাম। আজ থেকে নাম আপনার নেক্‌বখ্‌ত্‌। অন্ততঃ আমার কাছে।

মৃদু হেসে মাথাটা খানিক পাল্‌কীর মধ্যে টেনে নিলেন আরোহিণী। নওজোয়ানটি থতমত করে বললো– তা– মানে, নামটা আমার অনেক খানি ঐ রকমই। বখ্‌ত্‌ আমার ইয়ার মানে দোস্ত–বন্ধু না হলেও, নামটা আমার আসলে বখ্‌ত্‌–ইয়ারই।

ঃ মানে?

ঃ মানে মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার।

ঃ ও, আচ্ছা।

খুশী হলেন ভদ্র মহিলা। ফের বললেন– তা আপনার মকানটা কি এখানেই?

ঃ জি–হাঁ, ঐ মহল্লায়।

ঃ আপনার আব্বা–আম্মা ভাই–বেরাদর সবাই এখানে থাকেন?

ঃ জি–না, আমার কেউ নেই।

ঃ নেই!

ঃ এ দুনিয়ায় আমি একদম লা–ওয়ারিশ। আব্বা–আম্মা, ভাই–বেরাদর– কেউ আমার নেই।

ঃ একদম এতিম?

ঃ বিলকুল।

ঃ কায় কারবার আছে কিছু?

এবার ক্লীষ্ট হাসি ফুটে উঠলো বখতিয়ারের মুখে। বললো– জি–না, ওদিকটাও সাফা।

ঃ নকরী করেন?

ঃনা।

তবে?

ঃ বেকার!

হোঁচট খেলেন বেচারী। যারপরনেই তাজ্জব হয়ে আবার তিনি বাইরের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। ব্যথিত কণ্ঠে বললেন–রোটি? মানে খানা আসে কোত্থেকে?

বখতিয়ার এবার হাসলো। নির্মল এক হাসি। বললো,পরোয়ার দেগার দিলে ছাপপড় ফেঁড়েই আসে। না দিলে, তামাম দুয়ার বন্ধ। তখন ও আশা রাখিনে।

তরুণীর মুখ থেকে কিছুক্ষণ কোন শব্দ বেরুলোনা। বোরকার ভেতর থেকে বখতিয়ারের মুখের দিকে করুণ নয়নে চেয়ে রইলেন। এর পর বললেন– আমার একটা আরজ ছিল।

ঃ জি?

ঃ আমি যদি আপনাকে কিছু সোনাদানা দেই, আপনি কি তা কবুল করবেন?

তরুণীটির বোরকা ঢাকা মুখের দিকে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে চেয়ে রইলো বখতিয়ার। পরে প্রশ্ন করলো–সোনা দানা! মানে আপনি আমাকে দেবেন?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ গজব!

ঃ এ্যাঁ!

বখতিয়ার এবার সোচ্চার কণ্ঠে বললো– ওসব আমি রাখবো কোথায়? আমি থাকি রাস্তায়। ওসব তো লুটেরা আর রাহাজানরা সঙ্গে সঙ্গে লুটে নেবে।

ঘাব্‌ড়ে গেলেন তরুণী। আবার একটু ভাবলেন। ভেবে নিয়ে বললেন– আচ্ছা, আমি যদি আপনার কোন উপকারে আসতে চাই, সে মওকা আমাকে দেবেন?

ঃ মানে?

ঃ মানে আপনি আমার যে উপকার করেছেন, তার বিনিময় দেয়ার তাকত আমার নেই। স্রেফ আমার দীলের তৃপ্তির জন্যে আপনার কোন উপকার করার মওকা আমাকে দেবেন কি?

ঃ যেমন?

ঃ আপনার একটা নকরীর ব্যবস্থা করতে চাই আমি। আর তা করতে আমাকে আদৌ কোন তকলিফ পেতে হবে না।

ঃ নকরী?

ঃ জি–হাঁ। আপনি যদি রাজী থাকেন।

ঃ আচ্ছা, আমি ভেবে দেখবো।

ঃ ভেবে দেখবেন?

ঃ জি,আমাকে চিন্তা করে দেখতে হবে।

তরুণীর অধরে একটা হাসির রেখা ফুটে উঠে আবার মিলিয়ে গেল। বললেন– চিন্তা করে দেখার পর যখন আপনি স্থির করবেন– নকরী আপনার চাই, তখন আমাকে পাবেন কোথায়?

ঃ আপনার মকানে।

ঃ আমার মকান আপনি চেনেন?

ঃ আপনি বলে দিলেই চিনবো।

ঃ ও–আচ্ছা। তাহলে আপনি তাই করবেন। মতলব স্থির করার পর আপনি সিধা গজনীতে চলে আসুন। আমরা এখন আপততঃ রাজধানীতেই আছি। আমার আব্বা সুলতানের আরিজ।

ঃ আরিজ?

ঃ জি, সৈন্য বিভাগের অধ্যক্ষ। সেপাই সেনার নকরী– বেতন তাঁরই হাতে। আপনি সিধা তাঁর সাথে দেখা করবেন।

ঃ আচ্ছা।

ঃ আমার প্রতি আপনার আজকের এই নজীরবিহীন রহমের কথা শুনলে আমার আব্বা আপনার প্রতি যারপর নেই খুশী হবেন। আপনার কথা তাঁকে আমি আগেই বলে রাখবো। তাঁর কাছে গেলেই আপনি নকরী একটা পেয়ে যাবেন।

ঃ তিনি আমাকে কি করে চিনবেন?

ঃ ও, তাইতো!

তরুণীর খেয়াল হলো। বললেন–এই নিন। এটা তাঁকে দেখালেই তিনি চিনবেন।

বলেই তিনি আঙ্গুল থেকে নিজের নামাঙ্কিত অঙ্গুরীটি খুলে বখতিয়ারের দিকে বাড়িয়ে ধরলেন। কিঞ্চিৎ চিন্তা করে বখতিয়ার তা তাজিমের সাথে গ্রহণ করলো।

জনতার ভিড় এখন পাল্‌কী থেকে অনেকখনি দূরে গেছে। পাহারাদার বাহিনী পালকীর কাছে এসেই সাহেবজাদীর হেফাজতি নিশ্চিত করার ইরাদায় উৎসাহী জনতাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। সাহেবজাদী বাৎচিতে রত আছেন দেখে বাহিনীর অধিনায়ক পালকীটার একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন। হঠাৎ এই দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ায় তাঁর এখন অত্যন্ত ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থা। সেপাইরা পালকীটাকে দূর দিয়ে ঘিরে নিয়ে পাহারায় দাঁড়িয়ে আছে। বাহকেরাও ফিরে এসেছে ইতিমধ্যে। দূরে দাঁড়িয়ে থর থর করে কাঁপছে। সাহেবজাদীর তরফ থেকে কোন নির্দেশ না–আসা তক্ এদের কারোই কিছু করার নেই।

বখতিয়ারকে অঙ্গুরীটি তুলে দেয়ার আগে বাহিনীর অধিনায়ক নড়ে চড়ে উঠলেন এবং তুলে দিতে দেখে গলা ঝেড়ে ভীতকণ্ঠে বললেন–গোস্তাকী মাফ হয় সাহেব-জাদী, ওটি ওকে দিয়ে দেয়া ঠিক হবেনা।

সাহেবজাদীর গ্রীবা কিঞ্চিৎ বেঁকে গেলো। তিনি শক্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন–কেন?

সংকুচিত কণ্ঠে অধিনায়ক বললেন–ওটি খুবই মূল্যবান হুজুরাইন। ওটি খোয়া গেলে আপনার আব্বা হুজুরকে কি জবাব দেবো আমি?

ঃ বটে!

আরো অধিক তীক্ষ্ণ হলো তরুণীর কণ্ঠস্বর। বললেন– কোথায় ছিলেন এতক্ষণ? আমার জানটাই যখন খোয়া যেতে বসেছিল, তখন কোথায় ছিলেন আপনি?

কেঁপে উঠলেন অধিনায়ক। বললেন– জি, মানে–

ঃ আমার জানের চেয়েও কি এ অঙ্গুরী অধিক মূল্যবান?

ঃ না, মানে–

ঃ আমার জানটাই যদি খোয়া যেতো তাহলে আমার আব্বা হুজুরকে কি জবাব দিতেন আপনারা?

ঃহুজুরাইন।

ঃ যান, কথা না বাড়িয়ে এবার পাল্‌কী তোলার ব্যবস্থা করুন।

অন্যদিকে মুখ ঘুরালেন সাহেবজাদী। সংগে সংগে সেপাই–সেনারা আদিষ্ট কাজে তৎপর হয়ে উঠলেন। অঙ্গুরীটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বখতিয়ার এবার প্রশ্ন করলো– আপনার নাম দিলারা?

ফের সামনের দিকে ঘুরে এলো বোরকা ঢাকা মুখখানা। বখতিয়ারের মুখের উপর স্থির ভাবে নজর রেখে সাহেবজাদী পাল্টা প্রশ্ন করলেন– কি করে বুঝলেন?

ঃ এই যে অঙ্গুরীতে লেখা।

ঃ আপনি লেখাপড়া জানেন?

ঃ জি, বছপন কালে কয়েকদিন মকতবে গিয়েছি।

ঃ সাব্বাস্!

ঃ জি?

ঃ হ্যাঁ, আমার নামই দিলারা– মানে দিলারা বানু বেগম।

ঃ খুব মিষ্টি নাম।

ঃ কি বললেন?

ঃ নামটা আমার খুব পছন্দ।

ঃ তাই?

ঃজি।

শরম পেলেন দিলারা বানু। ইষৎ কেঁপে উঠলো তাঁর সর্বাঙ্গ। তিনি তাড়াতাড়ি পালকীর মধ্যে প্রবেশ করলেন।

ইসায়ী সপ্তম শতকের আউয়াল ওয়াক্তে সারে জাহান চমৎকৃত করে তৌহিদের যে শাশ্বত বারতা আরবের মরু বুকে এক নয়া দিগন্তের দ্বারোন্মোচন করে, গুমরাহীর আবিলতা দুই পাশে সরিয়ে সে বারতা–প্রবাহ অল্প কালের মধ্যেই বিশ্বের এক বিপুল অংশে বিদ্যুৎ বেগে ছড়িয়ে পড়ে। সুদূর আরব থেকে ইরান–তুরান পেরিয়ে সে প্রবাহ ক্রমেই প্রাচ্যের দিকে ধাবিত হয় এবং শত বর্ষের মধ্যেই সে প্রবাহ ভারতবর্ষের পশ্চিম দ্বারে এসে দুর্বার আঘাত হানে। তৌহিদের অমর বাণী বিভিন্ন সময়ে বিচ্ছিন্ন ভাবে প্রাচ্যে এসে পৌঁছলেও, তৎকালীন ভারতবর্ষে পাক ইসলামের প্রতিষ্ঠা তিন পর্যায়ে সম্পন্ন

হয়। ইসায়ী আট শতকের সবেরাওয়াক্তে মোহাম্মদ–বিন–কাসিম সিন্ধু ও মূলতানের মাটিতে সর্বপ্রথম উড়িয়ে দেন দ্বীন ইসলামের পতাকা। ইসায়ী দশ শতকে ছুটে এলেন গজনী বীর সবুক্তগীন ও তৎপুত্র সুলতান মাহমুদ। তাঁরা এসে সুগম করেন ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে পাক ইসলামের অনুপ্রবেশের রাহা। অবশেষে দ্বাদশ শতকের আখের ওয়াক্তে হাজির হলেন মুঈজ উদ্দীন মোহাম্মদ বিন সাম। ভারতবর্ষে দ্বীনের নিশান কায়েমী ভাবে প্রোথিত হলো মুঈজ উদ্দীন মোহাম্মদ বিন সাম ওরফে মোহাম্মদ ঘোরীর হাতে।

ইসায়ী দ্বাদশ শতকের ভারতবর্ষ শত তখ্‌তের দেশ। হাজার বীরের পদক্ষেপে ভারতবর্ষ কম্পমান। চাহমান বীর পৃথ্বিরাজ দিল্লীর তখ্‌তে বসে তখন বুলন্দ কণ্ঠে হাঁক ছাড়ছেন বীরত্বের। নিজ শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করার ইরাদায় গাহ্‌ড়বালরাজ জয়চন্দ্র মুগুর ভাঁজছেন বিক্রমে। অন্যান্য রাজন্যবর্গের অসামান্য প্রতাপে আর্যবর্ত তখন বেজায় উষ্ণ। গায়ের গরম চেপে রাখতে না পেরে রাজা জয়চন্দ্র এই সময় আনযাম করলেন রাজসূয় যজ্ঞের। সদর্পে দাওয়াত দিলেন তৎকালীন আর্যবর্তের তামাম রাজ–রাজাদের। এলান দিলেন– তাঁর যজ্ঞে হাজির হয়ে তাঁর তাবেদারী করবেন যিনি, তিনি জয়চন্দ্রের নেক নজর ও অপরিসীম অনুকম্পা কামাই করবেন। গরহাজির থেকে জয়চন্দ্রের সাথে বেত্তমিজী করবেন যিনি, রাজা জয়চন্দ্র তাঁকে সবংশে বেঁধে তখ্‌তসহ দুর দরিয়ায় সবলে নিঃক্ষেপ করবেন।

রাজা জয়চন্দ্রের এই যজ্ঞ আরো জমজামাট হয়ে উঠলো রাজ কন্যার কারণে। ঠিক এই সময়ই জয়চন্দ্রের উদ্ভিন্নযৌবনা ও অসামান্য খুবসুরাতের অধিকারিণী কন্যা শ্রীমতি সংযুক্তা দেবীর খাহেশ হলো স্বয়ংবরা হবেন তিনি। অর্থাৎ মাতাপিতা ও অন্য কারো পছন্দ করা বর গ্রহণ না করে, আগ্রহী তামাম বরকে জমায়েত করে যাকে তিনি পছন্দ করবেন তারই গলায় মালা দিয়ে তাকেই তিনি শাদী করবেন। পিতা জয়চন্দ্র কন্যার এই খাহেশটাকে যুতসই ভাবে কাজে লাগালেন। তিনি স্বাড়ম্বরে ঘোষণা দিলেন, তাঁর যজ্ঞে যে সমস্ত রাজরাজা আর বীরপুরুষগণ হাজির হবেন, তাঁর পরমা সুন্দরী তনয়া তাঁদেরই মধ্যে যে কাউকে পতিরূপে বরণ করবেন। শ্রীমতী সংযুক্তা দেবীর তুলনাহীন খুবসুরাতের কথা চার পাশের রাজনবর্গ সবিশেষ জানতেন। সেই সাথে রাজা জয়চন্দ্রের পরাক্রমের কথাও অজানা কারো ছিল না। ফলে, জয়চন্দ্রের রোষ থেকে মুক্তি পাওয়ার সাথে রাজকন্যা সংযুক্তার মালা পাওয়ার লালচে জয়চন্দ্রের যজ্ঞে এসে যোগ দিলেন একজন বাদে আর্যবর্তের তামাম রাজন্যবর্গ।

যজ্ঞে যিনি এলেন না, তিনি চাহমান বীর পৃথ্বিরাজ। গাহড়বাল রাজ জয়চন্দ্রের সাথে দিল্লীশ্বর পৃথ্বিরাজের পরাক্রমের প্রতিযোগিতা দীর্ঘদিনের। জয়চন্দ্রের পরাক্রমকে থোরাই পরোয়া করে তাঁর যজ্ঞ থেকে পিছিয়ে রইলেন পৃথ্বিরাজ। ঐ যজ্ঞে তিনি যোগদান করতে গেলেন না। কিন্তু পৃথ্বিরাজের দীলে বড় আফসোস পয়দা হলো রাজকন্যা সংযুক্তার চিন্তায়। লাস্যময়ী সংযুক্তার পানি প্রাপ্তির খাহেশ দস্তুরমতো দুর্বার

ছিল পৃথ্বিরাজের দীলেও। তাই তিনি শেষ পর্যন্ত নীরব থাকতে পারলেন না। অশ্ব হাঁকিয়ে হাজির হলেন জয়চন্দ্রের রাজধানীতে। প্রকাশ্যে জয়চন্দ্রের যজ্ঞে যোগদান না করে, সংযুক্তাকে লুটে নেয়ার ইরাদায় অশ্ব নিয়ে লুকিয়ে রইলেন যজ্ঞ স্থলেরই নিকটে।

শুরু হলো স্বয়ংবর সভা। হাজেরান রাজ–রাজা আর বীর পুরুষদের এক কাতারে আসন দিয়ে সমাদরে বসানো হলো। রাজা জয়চন্দ্র দেখলেন– তাঁর সভায় চারপাশের তামাম রাজাই উপস্থিত, নেই শুধু পৃথ্বিরাজ। তার অর্থ পৃথ্বিরাজ তাঁর পরাক্রমকে আদৌ পরোয়া করেননি। জয়চন্দ্রের পক্ষে এটা নিতান্তই মানহানিকর ব্যাপার। রাজসূয় যজ্ঞ করেন তিনিই, যার চার পাশের রাজন্যবর্গ কেউ তাঁকে অগ্রাহ্য করার দুঃসাহস রাখেন না। পৃথিরাজের এ আচরণ জয়চন্দ্রের ইজ্জতের উপর নির্মম কুঠারাঘাত। রাজা জয়চন্দ্র এ জিল্লতি বরদাস্ত করতে যাবেন কেন? নিজের শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ন রাখার নিদর্শন স্বরূপ তিনি পৃথ্বিরাজের মূর্তি গড়ে সেটা এনে স্থাপন করলেন যোগদানকারী রাজন্যবর্গের কাতারে।

হরেক রকম প্রক্রিয়ায় সুসজ্জিতা হয়ে রাজকুমারী সংযুক্তা এসে দাঁড়ালেন স্বয়ংবর সভায়। হাতে তার সদ্য গাঁথা তাজা ফুলের মালা। কাতারবদ্ধ রাজ পুরুষদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে তিনি সবাইকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। সুপুরুষ পৃথ্বিরাজকে দেখে এবং তার বীরত্বের কথা শুনে রাজকুমারী সংযুক্তা তাঁকেই মনে মনে পতিত্বে বরণ করে নিয়েছিলেন। সভায় এসে দাঁড়িয়ে তাই পৃথ্বিরাজকে তালাশ করতে লাগলেন তিনি। এদিক ওদিক নজর দিতেই দেখলেন–পাণি প্রার্থীদের কাতারের শেষ প্রান্তে পৃথ্বিরাজের পরিবর্তে দীনবেশে দাঁড়িয়ে আছে পৃথ্বিরাজের মূর্তি। জমায়েত রাজপুরুষদের সবাইকে অগ্রাহ্য করে সংযুক্তা গিয়ে মালা দিলেন সেই মাটির গড়া মূর্তির গলায়।

পিতার দুষমনকে পতিরূপে বরণ করায় ছিঃ ছিঃ রবে মুখর হলো স্বয়ংবর সভার প্রাঙ্গণ। গোস্বায় জ্ঞানশূন্য গাহ্‌ড়বাল রাজ জয়চন্দ্র, কলংকিনী কন্যাকে কোতল করার ইরাদায় খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে ধাবিত হলেন সবেগে। কিন্তু তাঁর মকসুদ হাসিল হলো না। ইতিমধ্যেই আড়াল থেকে সভার মাঝে ছুটে এলেন পৃথ্বিরাজ। সংযুক্তাকে সঙ্গে সঙ্গে অশ্বের পৃষ্ঠে তুলে নিয়ে ছুটিয়ে দিলেন অশ্ব।

তৎক্ষণাৎ গর্জে উঠলো শতাধিক তলোয়ার। সমবেত রাজ–পুরুষদের পৌরুষে হাত দিয়ে একা এক পৃথ্বিরাজ সংযুক্তাকে এই ভাবে লুটে নিয়ে চলে যাবে–এটা কেউ বরদাস্ত করতে পারলেন না । জয়চাঁদের নেতৃত্বে তাঁরা সবাই এসে ঘিরে ফেললেন পৃথ্বিরাজের অশ্ব।

শুরু হলো লড়াই। সংযুক্তাকে অশ্বপৃষ্ঠে নিয়েই পৃথ্বিরাজ লড়তে লাগলেন শতাধিক রাজপুরুষদের বিরুদ্ধে। বীরত্বের সাথে লড়ে তামাম রাজপুরুষদের পরাভূত করে সগৌরবে স্বমুলুকে ফিরে এলেন পৃথিরাজ। সঙ্গে করে নিয়ে এলেন গাহ্‌ড়বালের রাজ

কন্যা শ্রীমতি সংযুক্তাকে। ধন্য ধন্য রব উঠলো চারদিকে। জয়চাঁদের পরাক্রমকে মসীলিপ্ত করে পৃথ্বিরাজের বীরত্বের উত্তপ্ত কাহিনী উত্তর ভারতের জনপদ মুখর করে তুললো।

এমনই এক ওয়াক্তে আর এমনই সব সুবিখ্যাত বীরবিক্রমের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষে প্রবেশ করলেন দ্বীন ইসলামের সৈনিক মুঈজউদ্দীন মোহাম্মদ ঘোরী। তৌহিদের দুর্নিবার তলোয়ারের সামনে কদলী বৃক্ষের আকারে লুটিয়ে পড়তে লাগলেন দ্বীনের-রাহা-অবরোধকারী তামাম বীর পালোয়ান। প্রস্তুতির স্বল্পতা হেতু তরাইনের পয়লা রণে মোহাম্মদ ঘোরীর অগ্রগতি সাময়িকভাবে খানিকটা বিলম্বিত হলেও, তরাইনের দ্বিতীয় রণে কাটা গাছের গুঁড়ির মতো গড়িয়ে পড়লেন উত্তর ভারতের তৎকালীন ঐ কিংবদন্তীর নায়ক চাহমান বীর পৃথ্বিরাজ। চন্দোয়ারের যুদ্ধে তৃণ শয্যায় শায়িত হলেন রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদনকারী রাজা গাহ্ড়বাল বীর জয়চাঁদ। খামোশ হলো খিতাবধারী এমনই আরো অনেক আর্যবীরের বেশুমার আস্ফালন। দিল্লী, আজমীর ও বারানসীতে কায়েমীভাবে প্রোথিত হলো পাক ইসলামের ঝান্ডা। সিপাহসালার কুতুব উদ্দীন আইবকের উপর এই নয়া মুলুকের শাসন ভার অর্পন করে মোহাম্মদ ঘোরী পা বাড়ালেন নিজ মুলুক গজনীর অভিমুখে।

এই নয়া রাজ্য স্থাপন করে ওয়াপস আসার মুখেই মোহাম্মদ ঘোরীর সামনে পড়লো আফগানিস্তানের গরমশির। গরমশিরের এক পাশে বালি কাঁকড় পাহাড়াময় বিস্তীর্ণ এক প্রান্তর। মাঝে মাঝে কাঁটা গাছের ঝোঁপঝাড়। এই ঝোঁপঝাড় আর পাহাড় টিলার ফাঁক দিয়ে পথ। এই পথে ধূলি উড়িয়ে পথ ধরেছেন সুলতান মোহাম্মদ ঘোরী। লোকালয়ের অনেক খানি ফারাগ দিয়েই যাচ্ছেন তিনি। সঙ্গে তার বেসুমার লোক লস্কর হাতী-ঘোড়া। গরমশিরের কাছে এসেই তার হস্তীবাহিনীর একটা হাতী ক্ষেপে গেল আচানক। বাহিনীর সেপাইরা হাতীটাকে কব্জা করার আগেই ঐ পাগলা হাতী ছুটে এলো গরমশিরের রাস্তায় এবং দিলারা বানুর পাল্‌কীর সামনে ছিটকে এসে পড়লো।

অল্প কিছু আগের ঘটনা এসব। বখতিয়ারের পাথর খেয়ে পাক খেয়েছে পাগলা হাতী। বিভ্রান্ত হয়ে দৌড় দিয়েছে পশ্চাৎ দিকে। দিলারা বানুর পাল্‌কীটাও উঠে গেছে ইতিমধ্যেই। বাহকেরা পাল্‌কী নিয়ে ছুটে গেছে অনেক দূরে। তারা এখন ঘটনাস্থলের লোক চক্ষুর আড়ালে। উৎসাহী কিছু ইনসানের খুচরো কথার জবাব দিয়ে বখতিয়ারও ধীরে ধীরে উঠে এসেছে রাস্তা থেকে। পথ এখন ফাঁকা।

এই ফাঁকা পথ পুনরায় সরগরম হয়ে উঠলো মোহাম্মদ ঘোরীর একদল সেপাই সেনার পদক্ষেপে। হাতীটা পাথর খেয়ে যেদিক দিয়ে দৌড় দিলো সেইদিক থেকে ধেয়ে এলো একদল অশ্বারোহী ও পদাতিক সেপাই। সংগে তাদের দিওয়ানা সেই হাতীটা। হাতীর পায়ে শিকল। কপালে সেই পাথর কাটা ক্ষত। লহর চিহ্ন লেগে আছে তখনও। মোহাম্মদ ঘোরীর মূল বাহিনী থেকে হাতীর খোঁজে ছুটে এসেছে বিপুল সংখ্যক

সেপাই। চারদিক থেকে ঘিরে সবাই মিলে হাতীটাকে আটকিয়ে পায়ে তার শিকল পরিয়ে দিয়েছে। হাতী এখন শান্ত।

রাস্তার দুইপাশে ফের ভিড় করে ছুটে এলো গরমশিরের লোকজন। তারা একনজরে দেখতে লাগলো ধাবমান ঐ হাতী সহ সুলতানের সেপাইদের। বালবাচ্চারা অনেকেই সপুলকে আওয়াজ দিলো, সেই হাতী, সেই হাতী-

এই ফৌজের সামনে ছিলেন সুলতানের এক কম বয়সী ফৌজদার। ফৌজদার ফরমান আলী। দুই পাশের ইনসানদের উৎসুকভাবে হাতীর প্রতি ইঙ্গিত করে বাৎচিৎ আর বালবাচ্চাদের তামাসা করতে দেখে ফৌজদারটি গরম কণ্ঠে বললেন-এই, কেয়া হুয়া? এত হল্লা কিসের?

ফৌজদারের মেজাজ দেখে রাস্তার পাশের লোকজন খামোশ হয়ে গেল। কারো মুখে আপাততঃ কোন কথা ফুটলো না। ফৌজদার সাহেবের মেজাজ আরো বিগড়ে গেল। তিনি হুংকার দিয়ে বললেন-কি হলো? সব বোবা বনে গেলে নাকি? এত তামাসা কিসের? আমরা কি আজব কোন চিড়িয়া যে, আমাদের দেখে তামাসা শুরু করেছো?

জনতার মধ্যে থেকে একজন অদ্না আদমী বলে উঠলো--না হুজুর, আপনাদের দেখে নয়, ঐ হাতী দেখে।

ফরমান আলী বললেন-হাতী!

ঃ জি হুজুর, একটু আগে এই হাতীটা এখানে এসে এক গজব পয়দা করেছিলো। এখন দেখছি, এক দাবড়ান খেয়েই বাছা খামোশ হয়ে গেছে।

জাররা ফাঁপড়ে পড়লেন ফৌজদার। প্রশ্ন করলেন-এক দাব্‌ড়ান খেয়ে মানে? কে দাবড়ান খেলো?

ঃ ঐ হাতীটা।

ঃ কে দাব্‌ড়ালো হাতী?

বখতিয়ার পাশেই ছিল। সে বললো-আমি।

ফৌজদার সাহেব ধীরে ধীরে এগুচ্ছিলেন। ঘোড়ার লাগাম টেনে তিনি থেমে গেলেন। ফৌজদারকে থামতে দেখে গোটা ফৌজেরই গতিবেগ ঝিমিয়ে গেল। ছোট্টখাট্টো বখতিয়ারকে নিরিখ করে দেখে ফৌজদার ফের প্রশ্ন করলেন-তুমি মানে?

বখতিয়ার নির্বিকার কণ্ঠে জবাব দিলো-আমি মানে আমি।

ঃ তুমি হাতী দাব্‌ড়িয়েছো?

ঃ জি। এদিকেই ওটা আসছিলো। আমি ওটাকে ওয়াপস পাঠিয়ে দিয়েছি।

ঃ মোজাক করছো আমার সাথে?

ঃ মোজাক!

ঃ আমার বিশ বিশটে তাগ্‌ড়া জোয়ান সেপাই এই ক্ষেপাহাতীর গতি ফেরাতে পারেনি, গোটা বাহিনী এনে হাতীটাকে পাক্‌ড়াও করতে হলো, আর তুমি একটা একমুঠো এক আদমী, তুমি ফেরালে পাগলা হাতীর গতি! খন্নাসপনা করার কোন ঠাঁই খুঁজে পেলে না।

বখতিয়ার এর জবাবে শানদার কণ্ঠে বললো–আমি কোন খন্নাসপনা করিনি। খন্নাসপনা করেছে আপনার ঐ হাতীটা।

ঃ খামোশ!

কিছু মাত্র বিচলিত না হয়ে বখতিয়ার ফের প্রশ্ন করলো––এ হাতী কার?

ছোট্ট একটা লোককে এমন অচঞ্চল দেখে ফরমান আলী সাহেব তাজ্জব কণ্ঠে বললেন–মানে!

ঃ মানে, এ হাতীর মালীক কে?

ঃ সে খবরে তোমার কি কাজ?

ঃ আমার কোন কাজ নেই। হাতীর মালীককে গিয়ে বলবেন, সামলাতে যা পারেন না, তা পোষার খাহেশ না থাকাই তার ভাল। এতে অন্যের অনেক মুসিবত হয়।

ফৌজদার তাঁর তলোয়ার কোষমুক্ত করলেন। গর্জে উঠে বললেন–হুঁশিয়ার কমবখত্‌!

ঘোড়ার লাগাম টেনে তিনি বখতিয়ারের দিকে ঘুরলেন। এতদ্দৃশ্যে দুই পাশের লোকজন সন্ত্রস্ত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে দৌড় দিলো। এক ধাপও না নড়ে ওখানেই ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থেকে বখতিয়ার ফের নির্ভীক কণ্ঠে বললো–হাতে তলোয়ার আর সাথে ফৌজ থাকলে তামাম কণ্ঠই শানদার হয়। ন্যায় অন্যায়–কোন কথায় কর্ণপাত করার জরুরতই তাদের থাকেনা। কিন্তু তাদের ইয়াদ রাখা উচিত, মাথার উপরে এমন একজন আছেন, যিনি কারো বেইনসাফী আদৌ বরদাস্ত করেন না।

তলোয়ার হাতে অশ্ব থেকে লাফিয়ে পড়লেন ফরমান আলী। সঙ্গে সঙ্গে সেপাইরাও তাদের অসি কোষমুক্ত করলো। বখতিয়ারের দিকে অগ্রসর হয়ে ফরমান আলী বললেন–তার অর্থ?

অবিকৃত কণ্ঠে বখতিয়ার জবাব দিলো–একজন নিরস্ত্র পথের লোকের বিরুদ্ধে একটা গোটা বাহিনী যেখানে এক সাথে তলোয়ার কোষমুক্ত করে সেখানে অর্থের ব্যাখ্যা অর্থহীন। আপনার দীলের খাহেশ হাসিল করে আপনি আপনার বাহাদুরী জাহির করে চলে যান। প্রাণের ভয়ে দৌড় দিয়ে আমি নিজের অসম্মান করবো না।

কাঁচা বয়স হলেও ফরমান আলী এলেম হাসিল করা লোক। খানদান ঘরের শরীফ আদমী। বখতিয়ারের এ কথায় তিনি শরমিন্দা বোধ করলেন। হাত ইশারায় সেপাইদের নিরস্ত্র করে অপেক্ষাকৃত শান্ত কণ্ঠে বললো–বটে!

বখতিয়ার ফের বললো–অবশ্য সত্যি সত্যিই দৌড় দিলে বখতিয়ারের নাগাল ধরতে কোন অশ্ব কোন দিন পারে নি, আজকেও পারবেনা। কিন্তু কোন ভীরুর ভয়ে দৌড় দেয়াকে আমি বেইজ্জতি মনে করি।

একটা মামুলী আদমীর এতবড় বুকের পাটা ফরমান আলী তাঁর জিন্দেগীতে দেখেননি। নিজের অজ্ঞাতেই হাতের অসি পুনর্বার উত্তোলন করতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিলেন এবং হাতের অসি কোষবদ্ধ করে শ্লেষের সাথে বললেন–আচ্ছা! এয়সা মাফিক বাহাদুর তুমি?

বখতিয়ারের বলার মধ্যে কোন উঠানামা নেই। সে একইভাবে বললো–বাহাদুর আমি নই আর সে বড়াইও আমি করিনে। কিন্তু আমার বড় আফসোস, কে সেই বদনসীব যিনি এমন একটা কমজোর আর বুযদীল বাহিনী পয়সা দিয়ে পুষছেন।

সঙ্গে সঙ্গে ফরমান আলীর হাত আবার তরবারির বাঁটের উপর পতিত হলো। তিনি ক্ষিপ্তকণ্ঠে বললেন–খবরদার! অনেক বরদাস্ত করেছি। এবার জবাব দাও–ঐ হাতীর জন্যে কি মুসিবত হয়েছে তোমার?

এবার বখতিয়ারের কণ্ঠে একটা পরিবর্তন এলো। সে কিছুটা উদাসকণ্ঠে বললো–না, আমার হয়নি। হয়েছিল এক আওরাতের।

ঃ আওরাতের! কি মুসিবত হয়েছে তার? ঘরবাড়ী তছনছ করে দিয়েছে।

ঃ জি না। তার জানটাই তছনছ করে দেওয়ার উপক্রম করেছিল। খানিকটা আমার চেষ্টা আর অধিকটা আল্লাহপাকের রহমের জন্যেই দিলারা বানু নামের একটা খানদান ঘরের জেনানা আজ জান নিয়ে নিজ মুলুকে ওয়াপস্‌ যেতে পারলেন।

চমকে উঠলেন ফরমান আলী। বললেন–দিলারা বানু! নিজ মুলুকে ওয়াপস্‌ যেতে পারলেন মানে? তার বাড়ী কোথায়?

ঃ গজনীতে।

ঃ গজনীতে! কোথায় ছিলেন তিনি?

ঃ ছিলেন নয়, এই পথ দিয়ে পাল্‌কীতে চড়ে আসছিলেন।

ঃ আসছিলেন! কোথা থেকে আসছিলেন?

ঃ তা জানিনে। মনে হয় সিস্তান থেকে।

ঃ সে কি! তার আব্বার নাম?

ফরমান আলী উদ্ভ্রান্ত হয়ে উঠলেন। বখতিয়ার একইভাবে জবাব দিলেন–তাঁর আব্বার নাম জানিনা। তবে শুনলাম–তার আব্বা গজনীর শাহানশাহ্‌র আরিজ।

ইয়া আল্লাহ!

ফরমান আলী আর্তনাদ করে উঠলেন। বললেন–ওতো আমারই বহিন! আমার একমাত্র বহিন।

বখতিয়ারও যারপর নেই তাজ্জব বনে গেল। বললো–এ্যাঁ! সে কি! আপনার বহিন?

ফরমান আলীর চোখে তখন অন্ধকার, মুখে তখন আহাজারী। তিনি ব্যস্তকণ্ঠে বললেন–হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার বহিন! ঐ দিলারা বানু আমার বহিন! আপনি তাকে বাঁচিয়েছেন?

জবাবে বখতিয়ার বললো–বাঁচানোর মালীক আল্লাহ! আমি সেরেফ উপলক্ষ–মানে একটা অছিলা।

এবার ফরমান আলী ছুটে গিয়ে বখতিয়ারকে দুইহাতে ছড়িয়ে ধরে আফসোস করে বললেন–আমার কসুর মাফ করে দিন ভাই সাহেব, আমার গোস্তাকী মাফ করে দিন। আপনার মতো এমন একজন উপকারীর সাথে আমি নেমকহারামের মতো মস্তবড় বেয়াদপী করে ফেলেছি।

ফরমান আলী পেরেশান দীলে আকুলীবিকুলী করতে লাগলেন। বখতিয়ার এতে বুঝতে পারলো. দিলারা বড় পেয়ারের বহিন ফৌজদারের। সে ফৌজদারকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো–আরে না–না। বেয়াদপীর কি আছে? আপনি কি আর জানতেন এদিকে কি ঘটে গেছে বা আপনার বহিনের জান বাঁচানোর আমিই সেই অছিলা?

বখতিয়ারকে ছেড়ে দিয়ে ফরমান আলী প্রশ্ন করলেন–ব্যাপারটা কি ভাঁই? কি এখানে ঘটেছিলো?

বখতিয়ার অল্প কথায় তামাম ঘটনা বয়ান করে নিজের নাম পরিচয় দিতেই, পাগলা হাতী দুস্‌রাবার ক্ষেপে গেল। পায়ের শেকল ছিঁড়ে লাফিয়ে উঠলো হাতীটা এবং পুনরায় সে দিওয়ানা হয়ে সামনের দিকে দৌড় দিলো। হাতীর পেছনে সেপাই–সেনারা হৈ হৈ রবে দৌড়াতে লাগলো আবার। অল্প কথায় শুকরিয়া জ্ঞাপন করে এবং বখতিয়ারকে গজনীতে তসরীফ আনার দাওয়াত দিয়ে ফৌজদার ফরমান আলীও হাতীর পেছনে ছুটলেন।

দুই

দেশভেদে মওসুম ও মওসুম ভেদে ইনসান। আল্লাহ তায়লার সৃষ্টির বিস্ময়কর বৈচিত্রের কারণে শীতাতপ আর বৃষ্টিপাতের বিশাল তারতম্য সারা বিশ্বের সর্বত্র বিরাজমান। এতে করে এক এক স্থানের জলবায়ুর কিসিম হয়েছে আলাদা, ইনসানের পেশা হয়েছে পৃথক। জুদা হয়েছে ইনসানের তনুমনের প্রকৃতি, ভেদ এসেছে মানব দেহের গড়ন–বরণ–সামর্থ্যে।

শান্ত–নরম আবহাওয়ার নিদ্রালু পরিবেশ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষকে করে আরাম প্রিয় ও খেয়ালী। দেহ করে কমজোর, উর্বর করে মাথা। শুষ্করুক্ষ জলবায়ুর বে–রহম জুলুমে ইনসানের দেহ হয় মজবুত, দৃঢ় হয় মনোবল, সাহস হয় দুর্বার, হিম্মত হয় অসামান্য। তারা স্বভাবে হয় পরিশ্রমী, মানসিকতায় কষ্ট সহিষ্ণু।

গরমশিরের আবহাওয়া এই শেষ পর্যায়ের। ইনসানের ইতিবৃত্তও তদ্রূপ। গরমশিরের লোক বসতির বাইরে ক্রোশেরপর ক্রোশ জুড়ে খাঁ খাঁ প্রান্তর। লক্ষাতীত বছরের সীমাহীন দহনে সে প্রান্তর প্রাণহীন। যতদূর দৃষ্টি যায় চাপ চাপ পাথর। নুড়ি আর কাঁকর। মাটির মাত্রা সে তুলনায় নিতান্তই মামুলী। পাথর নুড়ির সমুদ্দুর পেরিয়ে নজর যেখানে আটকে যায়, সে দিগন্তে দেরাখঘেরা গ্রামগঞ্জ বা ছায়াঘেরা অরণ্য বিরাজ করে না, বিরাজ করে পাহাড়ের পর পাহাড় আর টিলার পর টিলা। প্রাণহীন, স্পন্দনহীন, জিন্দেগীর উম্মিদের একান্তই ওয়াদাহীন। পাশ্ববর্তী পাঁচমুলুকের দস্তানও ঐ একই।

তবু তৎপরতার শেষ নেই মানুষের। সুবেহ্ সাদিকের সাথে সাথেই সিস্তান, গজনী, বুখারা আর গরমশিরের সুদুর প্রসারী মুর্দা পথ রাহাগীরদের কাফেলায় জিন্দা হয়ে উঠে। মাল–মানুষ–জানোয়ার এক মুলুক থেকে পাড়ি দেয় আর এক মুলুকে। বিরামহীন অগ্নিবৃষ্টি দিনমান বর্ষিত হয় পথচারীদের মাথার উপর। নির্বিকার পথচারী এই অগ্নিবর্ষণ উপেক্ষা করে একের পর এক দুর্গম আর খতরনাক প্রান্তরগুলি পেরিয়ে যায়। রাত্রির আগমনে ক্ষান্ত হয় পথচারীদের পথ চলা। মালামাল আর ইতরপ্রাণী সমভিব্যহারে তারা আরাম আয়েশের আনযাম করে নিকটবর্তী সরাইয়ে।

দূর প্রান্তর পেরিয়ে গরমশিরের দিকে একটানা এগিয়ে আসছে এক গাধাওয়ালা মযদুর। গাধার পিঠ মাল বোঝাই। দ্বিপ্রহরের খরতাপে ঝলসে গেছে গাধাওয়ালার সর্বাঙ্গ। দীর্ঘ পথ অতিক্রমের মেহনতে নেতিয়ে গেছে ভারবাহী পশুটি। নেতিয়ে গেছে পশুপতি নিজেও। তবু গতিতে কোন পরিবর্তন নেই তাদের। পেরেশানীকে পরাস্ত করে এগিয়ে আসছে একটানা। দলে দলে পশু পাল ঐ একই পথে আসছে আর যাচ্ছে: শত শত উট–ছাগল আর বেশুমার দুম্বা। আসছে যাচ্ছে রাহাগীরদের কাফেলা। উটওয়ালা, অশ্বওয়ালা

ঐ একই পথে অবিরাম সামনে পিছে ছুটছে। পশুপদের কঠিন ঘায়ে উড়ন্ত ধূলোবালি ক্ষণে ক্ষণে পথটাকে গ্রাস করে ফেলছে। ঐ ধূলোবালির পর্দা ঠেলে মালটানছে গাধা আর গাধা টানছে মানুষটি। মাল-মানুষ আর পশু রাস্তার সাথে দোস্তী করে রং এ বর্ণে একাকার হয়ে গেছে। বৈষম্য শুধু, প্রথমগুলো নড়ছে, দ্বিতীয়টি অনড়।

গরমশিরের আধাটেক ক্রোশ পশ্চিমে লোক বসতির বাইরে দিয়ে পথ যেখানে বাঁক নিয়েছে, সেখানে এক সরাই খুলেছেন গরমশিরের এক কারবারী। মালসহ গাধা নিয়ে গাধাওয়ালা এই সরাইয়ে এসে উঠলো।

মালের মালীক অনেক আগেই এই সরাইয়ে এসে এন্তেজারে ছিলেন। সময় মতো মাল এসে পৌঁছে কিনা-এ নিয়ে তার দুশ্চিন্তার শেষ ছিল না। এই সরাইএ আটা-আলুর তিনিই প্রধান সরবরাহক। সরাইওয়ালা হুঁশিয়ারী সহ গতকালই তাঁকে জানিয়েছে-মালের মজুত খতম। আপাততঃ চালানোর মতো কিছুমাল অতিসত্ত্বর না পেলে, সরাই তাকে বন্ধ করে দিতে হবে-যা তার দাদু সাহেবের আমলেও কখনও করতে হয়নি। সৎ নিয়ত সত্ত্বেও মালওয়ালা সন্ধ্যার মধ্যে মাল পাঠাতে পারেননি। অন্ততঃ কিছুমাল আজকের দুপুরের মধ্যে না পৌছলে, সরাইওয়ালার সাথে তার নির্ঘাত একটা রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের সম্ভাবনা। এই কিছুমালও তিনি সময়মতো রওনা করাতে পারেননি। অনেকটা অসময়েই তিনি মাল দিয়েছেন এই গাধাওয়ালা মযদুরকে। অনেক দূরের পাল্লা। মালের পরিমাণও অনেক। পথের মধ্যে বিরাম নিয়ে না এলে এ বোঝা একটানা টেনে আনা কঠিন। অথচ বিরাম নিয়ে আসতে গেলে সাঁঝের আগে মাল এসে গরমশিরে পৌঁছবেনা। তাই, তাড়াতাড়ি আসার জন্যে গাধাওয়ালাকে পুনঃ পুনঃ তাকিদ দিয়ে তিনি ঘোড়া নিয়ে আগেই ছুটে এসেছেন সরাইওয়ালার পেরেশানীতে প্রলেপ দেয়ার উম্মিদে। তিনি এসে পৌঁছলেন ঠিকই, কিন্তু মাল কখন এসে পৌঁছে এটা তিনি কিছুই সঠিক জানতেননা। ফলে, এসে অবধি মালওয়ালা লাগাতার এন্তেজারে ছিলেন। দ্বিপ্রহরের মাঝামাঝিই মাল এসে পৌঁছলো দেখে, খুশীতে তিনি আত্মহারা হয়ে গেলেন। হৈ হৈ করে ছুটে এসে খোশদীলে বললেন- আরে এই যে বাপ ইওজ, কামাল কিয়া বাপ! তুমি এসে পড়েছো ইতিমধ্যেই? মারহাবা! মারহাবা!

মাল বাহকের পুরো নাম হুসামউদ্দীন ইওজ খলজী। খলজী সম্প্রদায়ের লোক। জাতিতে খাস তুর্কী। এদের আদি মুলুক তুর্কীস্তানে। এখন কয়েক পুরুষ ধরে এরা এই গরমশিরে আছে।

মাল নামাতে নামাতে ইওজ খলজী বললো-বহুৎ পেরেশান হতে হয়েছে চাচা। গাধার পেটে সকাল থেকে দানাপানি পড়েনি। নিজের পেটও ফাঁকা। কিন্তু আপনার জরুরী তাকিদ থাকায় কোথাও আমি থামিনি।

মালের মালীক অত্যন্ত প্রীত হলেন। বললেন-সাব্বাস্! তুমি বহুৎ ইমানদার আদমী। এর আগে যতজনকে মালটানতে দিয়েছি, প্রায় ব্যাটাই একটা না একটা ফ্যাসাদে ফেলেছে আমাকে। তুমি বাপ সাচ্চা আদমী। ঠিক ঠিক কথা রেখেছো আমার।

মাল নামানো শেষ হলে মালীক এসে ইওজের হাতে মজুরী গুণে দিলেন। চুক্তি মোতাবেক পাওনার চেয়ে কিছু পয়সা বেশীই দিয়ে দিলেন। গুণে দেখে বাড়তি পয়সা বাড়িয়ে ধরে ইওজ খলজী বললো-চাচা, ভুল করে কিছু পয়সা জিয়াদা দিয়ে ফেলেছেন। বাড়তি পয়সা ওয়াপস্ নিন।

মালওয়ালা দিলওয়ালাও বটেন। হাসি মুখে বললেন-নারে বাপজান, ভুল করিনি। ওটা আমি ইচ্ছে করেই দিয়েছি।

ঃ ইচ্ছে করে?

ঃ হ্যাঁ বাপজান। ওটা তোমার ইমানদারীর বকশিস্। ওটা ওয়াপস্ নেয়া যাবেনা।

ঃ না-না, তা কি করে হয়?

ঃ হয়-হয়। দুনিয়ায় এত নাফরমানী হতে পারে আর জাররা পরিমাণ ভাল কাজ হতে পারেনা? অবশ্যই পারে।

মালের মালীক সরে গেলেন। সাধাসাধি করেও বাড়তি পয়সা ফেরত দিতে না পেরে ইওজ খলজী সে পয়সা সামনের জেবে ফেললো এবং মেহনতের পয়সাগুলো ভেতরের জেবে রেখে সে আহার বিরামের ইরাদায় গাধা নিয়ে সরাইখানার অন্দরে প্রবেশ করলো।

মরামাটির দেয়াল দিয়ে ঘেরা এক প্রশস্ত এলাকাজুড়ে সরাই। অভ্যন্তরে নয়া আর এক মুলুক। মাল-মানুষ-পশুপাল সবার জন্যে এজমালী অবস্থানের ঢালাও এক আনযাম। আস্তাবলে নিয়ে গিয়ে দানাপানি খাইয়ে ইওজ আগে গাধাটাকে ঠান্ডা করলো। এরপর সে নিজের পেট ঠান্ডা করার ইরাদায় খানাপিনার চত্বরের দিকে রওনা হলো।

দীল আজ তার প্রসন্ন। পেটের জ্বালা মেটাতে আজ আর তাকে আসল পয়সায় হাত দিতে হচ্ছেনা। বকশিস যা পেয়েছে তাই সে একা খেয়ে শেষ করতে পারবেনা।

সে জেব থেকে বকশিসটা বের করে ফের গুণে দেখলো। দু'তিন জনের পুরো পেট গোস্ত রুটি হয়ে যায় এ পয়সা দিয়ে। অথচ সে একা। একজন মেহমান কেউ সাথে থাকলে খানাটা আজ জমতো ভাল। মেহমানহীন খানাপিনায় উদরই শুধু পুরতি হয়, ফুর্তির খুশ্বু থাকেনা। ইওজ খলজীর মানসিকতা এই কিসিমের।

দস্তরখানায় যাওয়ার আগে ইওজ একবার বাইরে এলো কাছে কোনো পরিচিত কেউ আছে কিনা তা দেখতে। এ দিক ওদিক নজর দিতেই সে দেখতে পেলো চেনা চেনা একটা লোক ধীর কদমে সরাই এর দিকে আসছে। লহমা কয়েক খেয়াল করেই লোকটাকে সে পয়চান করতে পারলো। তারই পড়শী, তারই দোস্ত এবং তারই সম্প্রদায়ের জানবাজ নওজোয়ান মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি।

বখতিয়ারকে দেখতে পেয়ে যার পর নেই খুশী হলো ইওজ খলজী। বড় পছন্দ মাফিক মেহমান তাকে এই মুহূর্তে জুটিয়ে দিলেন পরোয়ারদেগার। বখতিয়ার শুধু দোস্তই নয় ইওজের, বখতিয়ার তার গৌরব। গরমশিরে বসবাসকারী তামাম তুর্কী জাতির বখতিয়ারই ইযযত। চরম সংকটেও সে না-উম্মিদ হয় না। হাত পাতে না কারো কাছে। এক আল্লাহ ছাড়া কারো সামনে মাথাও নত করে না।

বখতিয়ার আরো নিকটবর্তী হতেই ইওজ খলজী লক্ষ্য করলো বখতিয়ার বড় কাহিল হয়ে পড়েছে। তার তালী দেয়া ছেঁড়াফাটা রং-চটা লেবাস আরো বেশী বিবর্ণ হয়ে গেছে। অবসন্ন দেহ খানা কোন মতে টেনে নিয়ে সে শ্লথ গতিতে সরাইয়ের দিকে আসছে।

দৌড়ে গেলো ইওজ। বখতিয়ারকে জড়িয়ে ধরে বললো-আরে-দোস্ত্, তুমি এখানে এ সময়ে? হাল হকিকত ভালতো?

জবাবে বখতিয়ার খলজী বললো-না দোস্ত্, বড় পেরেশান হয়ে পড়েছি। জব্বোর খাটুনী যাচ্ছে সেই সবেরা ওয়াক্ত থেকে।

ইওজ খলজী প্রশ্ন করলেন- খাটুনী! কি করছ সবেরা থেকে?

ঃ মোট বইছি। সকাল থেকে এক ধারছে মোট টানার খোথ্রায় পড়ে গেছি।

ঃ মোট টানার বোথ্রা!

ঃ আর বলোনা ইয়ার। সবেরা ওয়াক্তে রাস্তায় এসে দেখি, এক লাকরী ওয়ালা ইয়াবুড়ো এক লাকরীর বোঝা পাশে নিয়ে রাস্তায় বসে ধুঁকছে। কাছে গিয়ে দেখি- যইফ এক বিমারী আদমী। ঐ অত ভারী বোঝা টান্তে গিয়ে সে একদম লাচার হয়ে পড়েছে। আর বোঝা টানার তাকত্ নেই। অথচ জানলাম -ঐ লাকরীগুলো বাজারে নিয়ে বেচতে পারলে তবেই তার বালবাচ্চাদের রুটি হবে। কি আর করি! মওলা বলে নিলাম বোঝা মাথায়। কিন্তু ও-ব্বাবা! লাকরীওয়ালার বিমারটা ইতিমধ্যেই এমন বেড়ে গেছে যে, ওর আর উঠার শক্তি নেই। অগত্যা ঐ বিমারীকেও এক হাতে টেনে নিয়ে আস্তে আস্তে হাজির হলেম বাজারে এবং লাকরী বেচে রুটির আনযাম কিনে নিয়ে বিমারীকে ফের পৌছে দিলাম তার মকানে।

শুনে ইওজ খলজী উল্লাসে লাফিয়ে উঠে বললো-সাব্বাস্! এ না হলে বখতিয়ার। তুমি দোস্ত্ বেহেস্তের গোটা একটা কামরা আজই কিনে ফেললে।

ক্লান্তির মধ্যেও হেসে ফেললো বখতিয়ার। বললো-এত সস্তায় বেহেস্তের কামরা কেনা গেলে ওখানে কেনার মতো কোন কামরাই আর এতদিন অবশিষ্ট নেই দোস্ত্! অনেক আগেই তামাম গুলো বিক্রি হয়ে গেছে।

বখতিয়ারের মুখের দিকে চেয়ে ইওজ খলজী বললো-মানে?

বখতিয়ার জবাব দিলো-মানে দুনিয়াটা পয়দা হওয়ার পর থেকে মানুষের মুসিবতে বেশুমার মানুষ লক্ষ লক্ষ বছর ধরে এর চেয়ে বহুগুণে জেয়াদা মেহনত দিয়ে আসছে। আর কামরা থাকে?

ইওজ খলজী হাসতে হাসতে বললো-থাকে দোস্ত্, থাকে। আল্লাহ তায়ালার কেরামতি তোমার আমার সাধ্য আছে বোঝার? কত কামরা আছে ওখানে, তার হদিস কি?

পেরেশানিতে বখতিয়ার তখন কাহিল। কোন কিছুর গভীরে যাওয়ার বা কোন কিছুতে গুরুত্ব দেয়ার মানসিকতা তার ছিল না। তাই সে পাতলাকণ্ঠে বললো- তাহলে দোস্ত্ ঐ একটা নয়, এর পরও আরো কয়েকটা কামরা আজকেই আমি খরিদ করে ফেলেছি। ইচ্ছে করলে ওর দু' একটা তুমি এখনই গিয়ে দখল করতে পারো।

ঃ মোজাক করছো?

ঃ মোজাক! বিলকুল না। ঐ লাকরীওয়ালার মকান থেকে বেরিয়ে এসে দেখি, কামরা কেনার আর এক মওকা আমার চোখের সামনে সমানে ডিগবাজী খাচ্ছে।

ঃ কি রকম?

ঃ এতিম কয়টা নাতী-নাতনী সহকারে ঘটি, বাটি, হাঁড়ি, পাতিল, খাটিয়া, চার-পেয়ী এয়সা মাফিক হাজারটা সামান নিয়ে এক বুড়ি বেটি রাস্তার উপর এন্তার মাথা কুটছে। অর্থাৎ গাধাওয়ালা, খচ্চোরওয়ালা, টাঙ্গাওয়ালা- যাকে পাচ্ছে তাকেই গিয়ে হাতে পায়ে ধরছে তার সামান গুলো গরমশিরের বাইরে ঐ বস্তিতে পৌছে দিতে। কিন্তু ন্যায্য ভাড়ার অর্ধেকটাও তার দেয়ার সামর্থ্য নেই জেনে তার দিকে কেউ নজর দিচ্ছে না। বেলা যতই বাড়ছে বুড়ি ততই নাজেহাল হয়ে পড়ছে। রুজিরোজগারের অভাবে গরমশিরের বসবাস তুলে দিয়ে বস্তিতে যাওয়ার ইরাদায় সে রাস্তায় এসে নেমেছে। এখন অবস্থা তার না ঘরকা, না ঘাট্‌কা।

ইওজ খলজী ব্যস্তকণ্ঠে প্রশ্ন করলো-তারপর?

জবাবে বখতিয়ার বললো-ফের গিদ্ধর বনে গেলাম।

ঃ গিদ্ধর!

ঃ বিলকুল। গিদ্ধর মাফিক ঘাড়ে-পিঠে-মাথায় করে সামান গুলো তুলে নিয়ে তিন তিনটে ক্ষেপ মেরে এই যে এখন ফিরছি। বাব্বা! একটা দুটো সামান! জোয়ানী আমার পানি হয়ে গেছে।

বখতিয়ারের হালত দেখেই ইওজ তা আন্দাজ করতে পেরেছিল। সে প্রশ্নে করলো- তা বুড়টি বেটি দিলো কত?

ঃ দিতে তো চাইলোই কিছু। সাধা সাধিই করলো। কিন্তু আমিতো জেনে গেছি– ঐ কয়টা পয়সাই ঐ বেটির সম্বল। ও পয়সা আমি নিলে ঐ মাসুম বাচ্চা গুলোকে আজ স্রেফ পানি খেয়ে থাকতে হবে। কাজেই–

ঃ তুমি তা নাওনি?

ঃ হ্যাঁ, নেইনি।

ঃ তোমাকে আজ খেতে হবে না কিছু?

এর জবাবে বখতিয়ার নির্বিকার কণ্ঠে বললো– গতকাল দুপুরে পুরোপেট খেয়েছি। পানি খেয়েই আজকের দিনটা কাটিয়ে দিতে পারবো। কিন্তু ঐ বাচ্চারা তো পানি খেয়ে দিন কাটাতে পারবে না।

ঃ আচ্ছা।

ঃ এইদিক দিয়েই যাচ্ছি, তাই ভাবলাম– সরাইওয়ালাকে বিনি পয়সায় লোটা খানেক পানি কোরবানীর মওকা দিয়ে কিছুটা সওয়াবের হকদার করে যাই।

ঃ খুব ভাল। তো এই খাটুনীটা হররোজ কিছু পয়সা কামানোর ইরাদা নিয়ে খাটলে তো কাউকে পানি কোরবানীর মওকা দিতে হয় না।

ঃ মানে?

ঃ পেট চালানো নিয়ে সমস্যা কিছু থাকে না।

একটা ঈষৎ হাসির রেখা ফুটে উঠলো বখতিয়ার খলজির মুখে। সে বললো– দোস্ত, সেরেফ পেট চালানোর চিন্তাই এ দুনিয়ার একমাত্র বড় চিন্তা নয়। তোমার বালবাচ্চা আছে, তোমার কথা আলাদা। আমার ঘাড়ে তো দায়-দায়িত্ব নেই কিছু। আমি কেন সেরেফ ঐ পেটের ধান্দায় বাঁধা পড়ে জিন্দেগীটা বরবাদ করতে যাবো?

ঃ অর্থাৎ?

ঃ পারি না পারি, একটা বড় কিছু করার চিন্তা করবো। ঘর সংসারের নামে এই টানাপোড়েনের জিন্দেগী আমি বরদাস্ত করতে পারিনে।

ঃ মানে, বাদশা হতে চাও তুমি?

ঃ বড় কিছু করতে গেলে, বাদশাই হোক আর শেখই হোক, ক্ষমতা তো থাকতেই হয় দখলে। আর না হোক, আমাদের এই কওমের আর দ্বীনের খেদমতে জাররা পরিমাণ অবদান রাখতে পারলেও তো জিন্দেগীটা সার্থক বলে মনে করতে পারি।

উল্লাসিত কণ্ঠে ইওজ খলজী বললো– ব্যস্‌-ব্যস্‌-ব্যস্‌! বহুৎ উম্‌দা বাত। এর জুটি নেই! নাও, এবার এসো দেখি–

ইওজ খলজী বখতিয়ারের হাত ধরে টানতে লাগলো। বখতিয়ার বিস্মিত কণ্ঠে বললো–এসো মানে? কোথায়?

ঃ কোথায় আবার সরাইয়ে।

ঃ সরাইয়েই তো যাচ্ছি।

ঃ হ্যাঁ, তাই এসো–

টেনে নিয়ে যেতে যেতে ইওজ তাকে মেহমান হওয়ার দাওয়াত দিলো। সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়ালো বখতিয়ার। বললো– নেহি। এ কক্‌খনো হতে পারে না।

ঃ কেন হতে পারেনা?

ঃ আমি জোয়ান আদমী। ভাবী সাহেবা আর বালবাচ্চার হক মেরে তোমার মেহনতের পয়সা আমি কক্‌খনো খেতে পারিনে।

হো হো করে হেসে উঠলো ইওজ। হাসতে হাসতে বললো– আরে ইয়ার, মেহনতের পয়সা তোমাকে খাওয়াতে যাচ্ছে কে? তোমাকে তো খাওয়াবো আমি হাওয়া থেকে পাওয়া পয়সা।

ঃ হাওয়া থেকে পাওয়া।

ঃ একদম হাওয়া থেকে। ঐ একজনের রহম থাকলে, বাতাসেও পয়সা এনে বয়ে দিয়ে যায়, বুঝলে?

ঃ না।

ইওজ তার বকশিস পাওয়ার কাহিনীটা বয়ান করে বখতিয়ারকে শুনালো। অতঃপর বখতিয়ারের আপত্তি সত্ত্বেও ইওজ তাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গিয়ে দস্তরখানায় বসালো এবং খাজিনদারকে শাহী মেজাজে খানা প্রদানের হুকুম করলো।

আহার বিরামের পর দুই দোস্ত যখন সরাই থেকে বেরুলো তখন বেলা অনেক পড়ে গেছে। সর্বগ্রাসী সূর্যের তেজ অনেকটা কমজোর হয়ে এসেছে। গল্পে গল্পে দুই ইয়ার গরমশিরে ঢুকতেই তাদের সামনে পড়লো আলী মর্দান। বখতিয়ারের সমবয়সী আর এক ভবঘুরে। ফারাগ শুধু, বখতিয়ার খলজী পেলে খায়, না পেলে সে অনাহারেই দিন কাটায়। কিন্তু আলী মর্দান খাটতেও রাজী নয়, আবার অনাহারে থাকতেও সে নারাজ। ফলে, জাল-জুচ্চুরী আর ধাপ্পাবাজীর আশ্রয় নিতে সে কুণ্ঠাবোধ করে না। জাতিতে সেও একজন তুর্কী এবং বংশে খলজী। অন্য কথায়, সেও একজন খলজী জাতীয় আফগান। কিন্তু তার আচরণে খলজী বা আফগানদের স্বভাবজাত সরলতার অনেকখানি অভাব। বখতিয়ারকে দেখেই সে আওয়াজ দিয়ে বললো– কিয়া গজব! আরে ইওজ, খোদ সাহেবজাদাকে এই ভাবে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছো তুমি? গুনাহগার আর বলে কাকে? শিগগির শিগগির গাধার পিঠে তুলে নাও।

ইওজ খলজী ঘাবড়ে গিয়ে বললো–সাহেবজাদা!

ঃ জরুর।

ঃ সাহেবজাদা কোথায় দেখলে তুমি?

ঃ এই তো নাক বরাবর।

ঃ মানে!

ঃ আরে আমাদের এই বখতিয়ার আর বখতিয়ার আছে ভেবেছো? এখন তো সে বিলকুল এক সাহেবজাদা। জন্বোর এক সাহেবজাদীর ওতো এখন দীলের মানুষ, জানের জান!

বড় বড় চোখে বখতিয়ারের দিকে তাকিয়ে ইওজ খলজী বললো- কিয়াবাত! মুহাব্বত কি পয়গাম?

জবাব দিলো আলী মর্দান। বললো-আরে ওসব পয়গাম প্রস্তাব নয়, একদম ফয়সালা। কৈ দেখি বাবা, বিবিজানের দেয়া সেই অঙ্গুরীটা রাখলে কোথায় দেখি?

ইওজ আরো উৎসাহিত হয়ে উঠলো। বললো- অঙ্গুরী! মা'শা আল্লাহ! এতদূর?

ফের আলী মর্দান বললো-তো আর বলছি কি? অঙ্গুরী তো অঙ্গুরী, সোনাদানা, হিরে-জহরত, নকরী-তক্‌মা কত কি যে দিতে চাইলেন সাহেবজাদী, কিন্তু আমাদের এই শাহানশাহের তবু দীল খোলাসা হলো না।

ঃ এঁ্যা, সে কি!

ঃ বুরবকের মতো তামাম কিছুই নাকোচ করে দিয়ে সেরেফ বোরকা ঢাকা মুখখানা হা করে দেখতে লাগলেন। কি খোদাবন্দ, ঠিক বলিনি?

বখতিয়ার খলজীর মুখের দিকে তিরসা নজরে চেয়ে আলী মর্দান হাসতে লাগলো। বখতিয়ার খলজী মুখ ঘুরিয়ে নিলো। বলেই চললো আলী মর্দানঃ তবু যদি আসলী মুখখান দেখতে পেতে বাবা, তবু একটা কথা ছিলো। মুখের উপর ঝোলানো ঐ বস্ত্র খণ্ড দেখেই সোনাদানা তামাম কিছু নাকচ করে দিলে? আসলী মুখ দেখলে তো ধরে রাখাই যেতোনা এই দোস্তকে আমাদের। পরনের কাপড় খুলে বিলকুল নাঙ্গা হয়েই পালকীর পেছনে দৌড় দিতো!

এবার প্রচণ্ড শব্দ করে হাসতে লাগলো আলী মর্দান। বখতিয়ার আর বরদাস্ত করতে পারলো না। সে গর্জে উঠে বললো-খামোশ! এই খন্নাস্‌পনা আমার বেজায় না-পছন্দ্!

বখতিয়ারের চোখ দিয়ে আগুন ছুটতে লাগলো। বখতিয়ারকে ভয় পায় না গরমশিরে তার সমবয়সী এমন কেউ ছিল না। আলী মর্দান মস্তানীতে অনেকের চেয়ে অগ্রগামী হলেও বখতিয়ারকে সে মনে মনে দস্তুর মতো ভয় করতো। স্বগোত্র, অধিকতর মেলামেশা, আর সমবয়সীর দাবীতে আলী মর্দান বলতে বলতে তাল হারিয়ে

ফেলেছিল। বখতিয়ারকে নিয়ে তামাসা করতে গিয়ে সে তার নিজের খন্নাস্‌পনাই উলঙ্গ করে তুলেছিল। বখতিয়ারের ধমক খেয়ে চমকে উঠলো আলী মর্দান। বখতিয়ারের চোখের দিকে চেয়ে কথা বলার তামাম সাহস উবে গেলো আলী মর্দানের। কিছুটা থতমত করে সে খামোশ হয়ে গেলো।

ইওজ খলজী কয়দিন খুব ব্যস্ত ছিল বাইরে। ফলে, গরমশিরের এই গরম খবর সে কিছুই জানতো না। একটা বিলকুল ভিন্নতর আস্বাদের আভাসে সে খুবই আগ্রহী হয়ে উঠলো এবং বখতিয়ারকে প্রশ্ন করলো-ব্যাপার কি দোস্ত? কি বলতে চায় আলী মর্দান?

সেদিনের ঘটনাটা সংক্ষেপে ব্যক্ত করে বখতিয়ার খলজী বললো- একটা নকরীর আশ্বাস দিয়ে গেছেন বটে! কিন্তু আলী মর্দান তার খন্নাস্‌পনার কারণে তিলকে একদম তাল বানিয়ে ফেলেছে।

শুনে ইওজ খলজী উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। বললো- বলো কি! নকরী? নকরীর আশ্বাস দিয়ে গেছেন?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ তবু তুমি যাওনি!

ইওজ খলজীর তখন প্রায় শ্বাসরুদ্ধ অবস্থা। কিন্তু বখতিয়ারের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়াই নেই। সে ঠাণ্ডা কণ্ঠে বললো-না, যাইনি। কারণ, একমাত্র সৈন্য বিভাগে ছাড়া অন্য কোন নকরীই আমার পক্ষে কবুল করা সম্ভব নয়।

ঃ সে কি!

ঃ তবে, ভদ্র মহিলার আব্বা যখন 'আরিজ' তখন ফৌজেই একটা নকরী পাওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে মনে করি।

দিশেহারা কণ্ঠে ইওজ খলজী বললো- তাই যদি মনে করো, তবে যাওনি কেন এতদিন? আলতু ফালতু ব্যাপার নয়, একটা নকরী বলে কথা! যার তার নসীবে এটা জোটে?

বখতিয়ার হেসে বললো-আরে দোস্ত, কোন আউরাতের দাওয়াতে ব্যস্ত হতে নেই। ওটা বেলেল্লাপনা!

ঃ তাই বলে কি যেতেই নেই?

ঃ যাবো ভাবছি একদিন। গিয়ে দেখি নসীবটা আমার কতখানি শানদার।

মুখ খোলার মওকা পেলো আলী মর্দান। এই ফাঁকে সে বললো-দোস্ত, মস্তানই বলো আর খন্নাসই বলো, অবস্থা বড় খারাপ! রুটির বড় কহর পড়েছে দেশ দুনিয়ায়। সুদিন যদি পেয়েই যাও একটা, এই ভুখানাঙ্গারা যেন নেক নজরটা না হারায় ইয়ারের।

মশহুর শহর গজনী। আলাপ্তগীন–সবুক্তগীন–সুলতান মাহমুদের গজনী। বর্তমানে ভারত বিজয়ী মোহাম্মদ ঘোরীর শাহী মোকাম গজনী। যেমনই এর জৌলুস্ তেমনই এর শানশওকত। ধন–ঐশ্বর্যে ভরপুর এই ঐতিহ্যবাহী নগরীর প্রতিটি চত্বর। এর রাস্তাঘাট, মহল–ময়দান, দপ্তর–ইমারত–সর্বত্রই ঐশ্বর্য আর আভিজাত্যের ছাপ দেদীপ্যমান। বখতিয়ার খলজী একদিন সত্যিসত্যি হাজির হলো এই রাজধানী শহর গজনীতে।

অচেনা এই নয়া মুলুকে প্রবেশ করে বখতিয়ার একদম নিঃসঙ্গ হয়ে গেল। তার তালী–দেয়া লেবাস আর অবিন্যস্ত চেহারা দেখে রাজধানীর কেতাদুরস্ত আদমীরা তাকে গণ্যের মধ্যেই আনলোনা। অপাংক্তেয় বোধে সবাই তার পাশ কাটিয়ে চলতে লাগলো। সকলের সব অবজ্ঞা উপেক্ষা করে বখতিয়ার একটানা শাহী প্রাসাদের নয্দিকে চলে এলো এবং তালাশ করে আরিজ সাহেবের দপ্তরে এসে হাজির হলো।

প্রশস্ত এলাকা জুড়ে আরিজ সাহেবের দপ্তর। সামনে এক প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে অসংখ্য ইমারত। বেশুমার সেপাই–সেনা গিজ গিজ করছে এখানে। আরিজ সাহেবের কক্ষটা এ সবের অপর দিকে। ছিমছাম পরিবেশে প্রকাণ্ড এক ইমারতে আরিজ সাহেব বসেন। সেপাই–সেনার আনাগোনা এদিকে খুব পাতলা। কয়েকজন টহলদার সেপাই ছাড়া বিনা হুকুমে অন্য কারো এ চত্বরে প্রবেশ করা নিষেধ।

প্রাঙ্গণের ফটকে এসে বখতিয়ার একটু থামলো। আশে পাশে কোথাও কেউ নেই দেখে সে এক পা দু'পা করে ভেতরে প্রবেশ করলো এবং শেষ পর্যন্ত আরিজ সাহেবের কক্ষের দিকে রওনা হলো।

পয়লা পয়লা কোন বাধাই এলোনা। কিন্তু আরিজের কক্ষের কাছে আসতেই হৈ হৈ করে ছুটে এলো সেপাই–সেনা, পাইক–পেয়াদা। তারা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে বখতিয়ারকে পেরেশান করে তুললো। শেষ–অবধি দিলারাবানু প্রদত্ত অঙ্গুরীটি দেখিয়ে বখতিয়ারকে প্রমাণ করতে হলো যে, সে কোন চোর, ডাকু, লুটেরা নয়। কোন বদ মতলব নিয়ে সে এখানে আসেনি। এখানে আসার সে হকদার এবং সে মর্মে যথাযথ এযাযত তার আছে।

নিরক্ষর সেপাই। কার অঙ্গুরী কি সমাচার–এসব নিয়ে সওয়াল করার আর কোন জরুরত তাদের রইলোনা বা সে সাহসও তাদের হলো না। মূল্যবান অঙ্গুরী দেখেই খামুশ হয়ে গেল তারা। অতঃপর সেরেফ সসম্ভ্রমে তারা রাস্তাই ছেড়ে দিলোনা, বখতিয়ারকে নিয়ে গিয়ে আরিজ সাহেবের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে দিলো। সেপাইদের তৎপরতা দেখে দ্বার রক্ষীও বাধা দিতে এলোনা। বখতিয়ার খলজী ভেতরে প্রবেশ করলো।

আরিজ সাহেব কক্ষের মধ্যেই ছিলেন। নিজ আসনে বসে তাঁর জনৈক সহকারীর সাথে আলাপে রত ছিলেন। সামনের দিকে চাইতেই তাঁর নজর পড়লো বখতিয়ারের উপর। এমন এক জন অগ্রাহ্য লোক এসে সরাসরি তাঁর কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করবে, খোয়াবেও তিনি এমনটি কল্পনা করতে পারেন না। কাঙ্গাল–মিসকীন কেউ হয়তো সদ্কার তালাশ করতে করতে ভুল করে তাঁর কক্ষের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। তিনি হুংকার দিয়ে দ্বার রক্ষীকে তলব দিতে যাচ্ছিলেন। ঠিক এই সময় বখতিয়ার আরো এগিয়ে এসে সসম্ভ্রমে সালাম দিয়ে বললো–জনাব, আমি আপনার ছেলেমেয়েদের কথাতেই আপনার সাথে মোলাকাত করতে এসেছি।

আরিজ সাহেব আসমান থেকে পড়লেন। বললেন– আমার ছেলেমেয়েদের কথাতে! বলো কি! তোমার নাম?

বখতিয়ার নতশিরে জবাব দিলো–ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী।

ঃ মকান?

ঃ আগে তুর্কীস্তানেই ছিল। এখন আমরা গরমশিরের বাসিন্দা।

ঃ গরমশির!

ঃ জি। কয়েক পুরুষ ধরে আমরা ওখানেই আছি।

এ জবাব আরিজ সাহেবের মনোপুত হলোনা। তিনি নাখোশ কণ্ঠে বললেন– আমার ছেলেমেয়েদের সাক্ষাৎ তুমি পেলে কোথায়?

ঃ জি– গরমশিরেই।

ঃ মানে!

আরিজ সাহেব তাজ্জব বনে গেলেন। তাঁর বালবাচ্চারা জিন্দেগীতেও কখনও গরমশিরে যায়নি। অথচ এ ব্যাটা বলে কি! আরিজ সাহেবের আন্দাজ করতে তকলিফ পেতে হলো না যে, এ আদমী দিওয়ানা। তার চেহারা দেখেই এ সন্দেহ আরিজ সাহেবের প্রথমে একবার হয়েছিল। এবার তিনি নিঃসন্দেহ হলেন। দারোয়ানকে ডেকে তাকে বের করে দেয়ার কথা ভাবতেই বখতিয়ার খলজী বললো– মানে ঐ গরমশিরের সদর রাস্তায় পালাক্রমে তাদের সাথে মোলাকাত হয় আমার। আপনার মেয়ে বিদেয় হতেই–

গর্জে উঠলেন আরিজ সাহেব। বললেন–চোপরাও বেয়াদপ!

চমকে উঠলো বখতিয়ার। তার হাত তখন জেবের মধ্যে দিলারা বানুর অঙ্গুরীর উপর। ওটা বের করে দেখানোর জন্যে সে জেবের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে। ধমক

খেয়ে থমকে গেল বখতিয়ার। যারপর নেই তাজ্জবও হলো সে। তার ধারণা ছিল, তার নাম আর গরমশিরের কথা শুনলেই আরিজ সাহেব খুশি হয়ে তাকে বসার আসন দেবেন। কুশলাদি জিজ্ঞাসা করে দোওয়া খায়ের করবেন। কিন্তু ধারণা তার বিলকুল উল্টে গেল। সে বুঝতে পারলো, দিলারা বানু তার আব্বাকে কোন কিছুই বলেননি। বললে কখনও এমনটি হওয়ার কথা নয়।

বখতিয়ারের দীলে বড় চোট লাগলো। সেদিন ঐ অতবড় মুসিবতের পর যিনি আপনা থেকেই অত দরদ দেখালেন, গজনীতে পৌছেই তিনি তামাম কিছু ভুলে গেলেন! এমন একটা ওয়াদার কোনই কদর দিলেন না!

চিন্তা করে বখতিয়ার দিশেহারা হয়ে গেল। সেই সাথে আউরাতকুলের উপর দীল তার বিরূপ হয়ে উঠলো। আজব এক চিড়িয়া এই ইহ দুনিয়ার আউরাতেরা। তাপ লাগালেই গলে যায়। তাপ ফুরালে যে কি সেই।

কিন্তু অধিকক্ষণ চিন্তা করার ফুরসৎ সে পেলো না।

তখনই তার কানে এলো আরিজ সাহেবের দুসরা হুংকার–এয় কুই হ্যায়? ইস্‌কো বাহারমে নিকাল দো–

বখতিয়ারের ঘোর কাটতেই তার পাশে এসে দাঁড়ালো এক সেপাই। সেপাই তার করণীয় করার উদ্যোগ করতেই বখতিয়ার খলজী মরিয়া হয়ে বললো–আপনার ছেলেও কিছু বলেননি আপনাকে? মানে ফরমান আলী সাহেব?

আরএকবার তাজ্জব হলেন আরিজ সাহেব। তাঁর কোন ছেলের নামই ফরমান আলী নয়। কি জানি কি খেয়াল হতেই আরিজ সাহেব সেপাইকে হাত ইশারায় থামিয়ে দিয়ে বখতিয়ারকে প্রশ্ন করলেন–ফরমান আলী! কোন ফরমান আলী?

জবাবে বখতিয়ার খলজী বললো–ফৌজদার ফরমান আলী। সুলতানের ফৌজ নিয়ে তিনিই তো মাহিনা খানেক আগে গরমশিরের ভেতর দিয়ে এলেন?

তৎক্ষণাৎ আরিজ সাহেব আবার প্রশ্ন করলেন–মানে খুবই কম বয়সী ফৌজদার? দপদপে উজ্জ্বল চেহারা?

ঃ জি –হাঁ।

ঃ তারও তো এক বহিন ছিলো। কি যেন নাম তার–

আরিজ সাহেব হাতড়াতে লাগলেন। বখতিয়ার খলজী বললো–দিলারার কথা বলছেন?

ঃ হাঁ–হাঁ, দিলারা, মানে দিলারা বানু। তুমি কি এদের কথাই বলছো?

ঃ জি–হাঁ। এদের কথাই।

আশ্বস্ত হলেন আরিজ সাহেব। তার বিভ্রান্তির গিটটা খুলে গেল। একটু থেমে ধীরে সুস্থে বললেন–তুমি ভুল করেছো হে! ওরা আমার সন্তান নয়। ভূতপূর্ব আরিজ জান মোহাম্মদ সাহেবের ছেলে মেয়ে ওরা।

ঃ জি!

ঃ তোমার বদনসীব! ওরা আর কেউ এখন গজনীতে থাকেনা। শাহান শাহর হুকুমে কয়দিন আগে জান মোহাম্মদ সাহেব বদলী হয়ে সপরিবারে আমাদের নয়া মুলুক হিন্দুস্থানে চলে গেছেন। শাহানশাহ তাঁকে সেনা বিভাগ থেকে শাসন বিভাগে পার করে নিয়েছেন। ফৌজদার ফরমান আলীও তাঁদের সাথেই চলে গেছেন।

বখতিয়ার আবার আর এক ধাক্কা খেলো। ডোবা থেকে না উঠতেই ফের দরিয়ার মধ্যে পড়ে গেল। মাথাটা তার বন বন করে ঘুরতে লাগলো। এই এক পয়গামে বখতিয়ারের তামাম উৎসাহ আর আশা–আকাঙ্খার সমাধি হয়ে গেল। পন্ড হলো শ্রম। সে আর এখানে দাঁড়াবে কিনা ভাবতেই আরিজ সাহেব কিছুটা নরমসুরে প্রশ্ন করলেন–জান মোহাম্মদ সাহেবের ছেলে মেয়ের সাথে তোমার গরমশিরেই সাক্ষাৎ হয়েছিল?

ভগ্নোৎসাহ বখতিয়ার উদাস কণ্ঠে জবাব দিলো–জি।

ঃ তারাই তোমাকে আসতে বলে?

ঃ জি।

ঃ কেন আসতে বলে তা জানো কিছু?

ফের আরিজ সাহেবের প্রশ্নের দিকে মনোযোগ দিয়ে বখতিয়ার খলজী জবাব দিলো–জি। আমাকে একটা নকরী দিতে চেয়েছিলেন।

ঃ নকরী! তা তোমাকে হঠাৎ নকরী দিতে চাইলো কেন?

ঃ সেটা তাঁদের মেহেরবাণী। আমার প্রতি তাঁরা খুবই সদয় ছিলেন।

ঃ ও, তাই বলো–

আরিজ সাহেব কিঞ্চিৎ দূরে উপবিষ্ট তাঁর সেই সহকারীর দিকে তাকালেন। তাঁর দৃষ্টিতে কিছুটা সহানুভূতি পরিলক্ষিত হলো। তিনি সহকারীকে বললেন–কি করা যায় দেখুন তো। জান মোহাম্মদ সাহেবের ছেলে মেয়েদের আশ্বাসে গরীব বেচার তকলিফ করে এতদূরে এসেছে–

লহমা খানেক সোচ্‌ করে সহকারীটি বললেন– নকরীরতো কিছু খোঁজ খবর নেই তেমন। তবে ইয়ার বক্‌স গতকালই বলছিলেন–তাঁর বাগিচার মালীটা হঠাৎ চলে গেছে। সত্বর একটা মালী তাঁর দরকার।

আরিজ সাহেব উৎসাহিত হয়ে বললেন–তাই নাকি?

ঃ জি, এই রকমই তিনি বলছিলেন।

ঃ বহুৎ খুব!

অতঃপর আরিজ সাহেব বখতিয়ারকে প্রশ্ন করলেন–বাগ বাগিচার তদারকির কাজ কিছু জানা আছে?

আরিজ সাহেবের আগের কথায় ক্ষুদ্র একটা আশার আলো বখতিয়ারের দীলের মধ্যে প্রজ্বলিত হয়ে উঠতেই এ কথায় তা আবার তৎক্ষণাৎ দপ্ করে নিভে গেল। বিভ্রান্ত কন্ঠে সে বললো–জি?

ভরসাভরা কণ্ঠে আরিজ সাহেব বললেন–কোশেশ করলে নকরী একটা নসীবে তোমার জুটেও যেতে পারে। এখন দরকার বাগানের কাজে সামান্য একটু অভিজ্ঞতা।

গলাঝেড়ে বখতিয়ার এবার সুস্পষ্ট কণ্ঠে বললো–কসুর মাফ করবেন জনাব, এ কিসিমের নকরী আমার না–পছন্দ।

ঃ না–পছন্দ!

এমন একজন তুচ্ছ লোকের মুখে এতবড় কথা আরিজ বা তার সহকারী কেউ আশা করেননি। শুনে তারা উভয়েই তাজ্জব বনে গেলেন। বিস্মিতকণ্ঠে আরিজ সাহেব পুনরায় প্রশ্ন করলেন– না–পছন্দ মানে?

ঃ মানে এ ধরনের নকরী আমার পক্ষে কবুল করা সম্ভব নয়।

ঃ বটে!

এবার তাঁরা দুইজনই রুষ্ট হলেন। আরিজ সাহেবের সহকারী তিক্ত কণ্ঠে বললেন–তাহলে কোন ধরনের নকরী হুজুর বাহাদুরের পক্ষে কবুল করা সম্ভব?

এই তাচ্ছিল্য বখতিয়ারকে পীড়া দিলো। পরিস্থিতি পক্ষে থাকলে এর উপযুক্ত জবাব দিতে পারতো সে। নিজেকে পুরোপুরি সংযত করে নিয়ে বখতিয়ার একেবারেই স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো–একমাত্র সেপাই–এর কাজ ছাড়া দুস্‌রা কোন কাজই আমি গ্রহণ করতে পারবোনা।

ফের সহকারীটি গোস্বা হলেন। গোস্বাভরে বললেন–সেপাই! মানে তুমি? তোমার যা চেহারা তাতে তো সেপাইয়ের সহিসগিরি করারও উপযুক্ত তুমি নও।

ঃ জি?

ঃ সেপাই হতে হলে গতরটা এই এত্তোবড়ো হতে হয় আর বাজুতে জিয়াদা হিম্মত থাকার প্রয়োজন হয়। তোমার যা হালত, তাতে খুব বেশী হলে, তোমার মতো না–লায়েক আদমীরা খাবারঘরের চিলিমচিদার হতে পারে, সেপাই হবার খোয়াব দেখাও তাদের পক্ষে গুনাহ্।

অঙ্গভঙ্গি সহকারে আরিজের সহকারী দীলের রোষ জাহির করলেন। এরপরও বখতিয়ার আরজ পেশ করে বললো–আমি বিশ্বাস করি, একজন সেপাইয়ের যে হিম্মত থাকার দরকার সে হিম্মত আমার আছে। মেহেরবানী করে আমাকে সেপাই পদে বহাল করে দেখুন, হতাশ হবার আদৌ কোন কারণ আপনাদের থাকবেনা।

আরিজ সাহেবের ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো। কথাবার্তা খাটো করার ইরাদায় তিনি বখতিয়ারকে সরাসরি প্রশ্ন করলেন–শাহানশাহের ফৌজে নকরী পেতে হলে নিজস্ব অশ্ব থাকতে হয়। তা জানো?

জবাবে বখতিয়ার বললো–জি, জানি।

ঃ তা আছে তোমার?

ঃ জি–না।

ঃ সেতো বুঝতেই পারছি। হাতিয়ার আছে–হাতিয়ার?

ঃ হাতিয়ার!

ঃ ঢাল, তলোয়ার, বর্শা, বল্লম–ইত্যাদি। ফৌজে চাকরী পেতে হলে নিজস্ব হাতিয়ার থাকা চাই। হাতিয়ার যার নেই, সে সেপাই হবার অযোগ্য।

ঃ কেন?

ফেটে পড়লেন আরিজ সাহেব। ধমক দিয়ে বললেন–খামুস্! যা বলছি তার উত্তর দাও। আছে এ সব?

ঃ জি না, ওসব আমার নেই।

ঃ বহুৎ খুব! এবার বিদেয় হও।

নজর ফিরিয়ে নিলেন আরিজ সাহেব। বখতিয়ার এবার সহকারীর দিকে চাইতেই তিনি শেষ ঝাল ঝাড়লেন। বললেন–যার ঢাল–তলোয়ার নেই, সে উল্লু লড়াইয়ের কি বোঝে? যত্ত–সব!

তিনিও নজর ফিরিয়ে নিলেন এবং দণ্ডায়মান সেপাইকে লক্ষ্য করে বললেন–নিকাল্‌দো উস্‌কো–

সেপাই তার করণীয় স্থির করার আগেই বখতিয়ার খল্‌জী ক্ষিপ্তভাবে আরিজের কক্ষ ত্যাগ করলো। কোথাও আর না দাঁড়িয়ে সে প্রাঙ্গণ পেরিয়ে এসে রাজপথে নামলো। বে-ইযযতির গ্লানিতে তার তামাম শরীর রি-রি করছে তখন। সে আঘাত সইতে পারে, তকলিফ সইতে পারে, কিন্তু বে-ইযযতি বরদাস্ত করতে সে একদম অনভ্যস্ত। একমাত্র দিলারা বানুর কারণেই তাকে আজ এইভাবে বে-ইযযত হতে হলো। নিতান্তই বদনসীব না হলে দিলারা বানুর সাথে তার মোলাকাতই বা হবে কেন, আর তার দাওয়াতে সে গজনীতেই বা আসবে কেন!

রাজপথে নেমে কয়েক কদম এগুতেই আর এক ব্যাপার ঘটে গেল। একজন প্রৌঢ় লোক ছুটতে ছুটতে বখতিয়ারের সামনে এসে দাঁড়ালো। সে হাঁপাতে হাঁপাতে প্রশ্ন করলো– জনাবের দৌলতখানা কি গরমশিরে?

আবার সেই ন্যক্কার জনক সম্বোধন! বখতিয়ার বিরক্ত হলো। তার দীলের অবস্থা তখন বড় অশান্ত ও অত্যন্ত নাজুক। মাথা বড় গরম। উত্তেজনার বশে একটা অঘটন ঘটিয়ে ফেলা তার পক্ষে এমন তাজ্জব কিছু নয়। দায় এড়ানো মাফিক ঝুটমুট সে জবাব দিলো–হ্যাঁ।

আরোবেশী ব্যস্ত হলো আগন্তুক। আরো বেশী আগ্রহভরে বললো–জনাবের নামটা কি তাহলে মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার?

বখতিয়ার এখন আর কোন কথার মধ্যে নেই। কানও তার সক্রিয় নয় বড় একটা। সে পূর্ববৎ উদাসিন কণ্ঠে বললো–হ্যাঁ।

আনন্দে বিগলিত হয়ে প্রৌঢ়টি আরো খানিক সামনে এসে বললো–সেলাম হুজুর, সেলাম! আমি সাবেক আরিজ জান মোহাম্মদ হুজুরের খানসামা। হুজুরেরা দূর মুলুকে চলে গেলেন। বালবাচ্চা ফেলে এ বয়সে আমি আর তাদের সাথে যাইনি, এখানেই আছি।

ততক্ষণে হুঁশ ফিরলো বখতিয়ারের। সে সোচ্চার হয়ে প্রশ্ন করলো–কার কথা বললে? কার খানসামা তুমি?

আগন্তুক জবাব দিলো–জান মোহাম্মদ হুজুরের–মানে দিলারা আপাদের মকানে খানসামার কাজ করতাম।

বখতিয়ার অতিমাত্রায় চঞ্চল হয়ে উঠলো। বললো–তুমি–মানে–দিলারার সাথে পরিচয় আছে তোমার?

ঃ কেন থাকবে না হুজুর? আমি তো তাঁদের মকানেই ছিলাম। তিনিই তো আমাকে আপনার কথা বলে গেছেন।

ঃ আমার কথা!

ঃ হ্যাঁ হুজুর। আমার উপরে বিরাট এক দায়িত্ব দিয়ে গেছেন। আপনার চেহারা বর্ণনা করে তিনি বলে গেছেন–এই নামের লোক একজন আরিজের দপ্তরে আসবেন নিশ্চয়ই। তুমি সব সময়ই সে দিকে নজর রাখবে। যতদিন তিনি না আসেন ততদিন তুমি আমার খত নিয়ে আরিজের ফটকে পাহারায় থাকবে। তিনি এলে আমার খতটা তাঁকেদেবে।

বখতিয়ারের দীলের তামাম কালিমা ধুয়ে মুছে উঠে গেল। বুকে তার ঝড় উঠলো খুশীর। সে প্রশ্ন করলো–খত? খত নিয়ে পাহারায় আছো তুমি?

ঃ জি–হ্যাঁ। তিনি আমাকে ছয়মাস পর্যন্ত পাহারা দেয়ার মজুরী দিয়ে গেছেন।

ঃ আচ্ছা।

ঃ সেই থেকেই পাহারায় আছি আমি। আজই কেবল ফটক ছেড়ে ওদিকে একটু গিয়েছি, আর সেই ফাঁকেই আপনি এসে ওয়াপস্ চলে যাচ্ছেন। আল্লাহ বড় মেহেরবান! তাঁর মেহেরবানী না হলে আপনি আজ এইভাবে এসে ফের ওয়াপস চলে যেতেন, আর আমি আমার কর্তব্যে গাফিলতির জন্যে মস্তবড় গুনাহ্গার হয়ে যেতাম।

এরপর সে তার জেব থেকে একখানা লেফাফাবদ্ধ খত বের করে বখতিয়ারের দিকে বাড়িয়ে ধরলো এবং বাড়িয়ে ধরে বললো–এই নিন হুজুর, এই তাঁর সেই খতখানা।

পত্রখানা হাতে নিয়েই বখতিয়ার তা ক্ষিপ্রহস্তে খুলে পড়তে শুরু করলো। দিলারা বানু লিখেছেন–

জনাব,

সালাম অন্তে জানাই, তক্দিরের মারপ্যাঁচে আপনার কাছে আমি ওয়াদা বরখেলাপকারী মোনাফেকদের একজন রূপে পরিচিত হলাম। আপনাকে যে আশা আমি দিয়েছিলাম, আর তা পূরণ করার ফুরসুত আমার রইলো না। আমরা গজনী থেকে সপরিবারে হিন্দুস্থানে চলে যাচ্ছি। শাহানশাহ আমার আব্বাকে আরিজের পদ থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। তাঁকে তিনি শাসন বিভাগে যোগদান করার জন্যে হিন্দুস্থানে যাওয়ার হুকুম দিয়েছেন। এ হুকুম অবিলম্বে তামিল করার জোরদার তাকিদ আছে। তাই আমরা আজকেই রওনা হচ্ছি।

অধীর আগ্রহভরে এ কয়দিন আমি আপনার এন্তেজারে ছিলাম। আমার ধারণা ছিল, অতি অল্পদিনের মধ্যেই আপনি গজনীতে হাজির হবেন। আর তা যদি হতেন, তাহলে অনায়াসেই আমি আমার ওয়াদা রক্ষা করতে পারতাম। কিন্তু আপনি তা এলেন না। এরপর যখন আসবেন তখন আমি বহুৎ বহুৎ দূরে।

গরমশির থেকে গজনীতে ফেরার পর আপনার কথা একটা দণ্ডের জন্যেও আমি ভুলে থাকতে পারিনি। কি যে আমার হলো, হর ওয়াক্ত আপনার ঐ মায়াভারা দৃষ্টি চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে আমাকে। অথচ সেই আপনি অসহায়ভাবে পথে পথে ঘুরে বেড়াবেন, আর অনেক কিছু করার এক্তিয়ার থাকলেও আপনার জন্যে কিছুই আমি করতে পারবো না। এ আফসোস্ সম্বরণ করবো কি করে?

হিন্দুস্থানে গিয়ে কোথায় কিভাবে থাকবো তা আমি জানিনে। তবে একটা কথা ঠিক, এদুনিয়ার যে প্রান্তেই থাকিনে কেন, আপনি আমার সাথেই থাকলেন। আপনারই অছিলায় যে জিন্দেগী ফিরে পেয়েছি আমি, তা থেকে আপনি আর জুদা হবেন কি

করে? যেখানেই থাকিনে কেন, আপনি যদি মেহেরবানী করে হাজির হন সেখানে, আমি আমার ওয়াদা রক্ষার আপ্রাণ কোশেশ করবো। ইয়াদ রাখবেন–আপনি কিন্তু আদৌ কোন তুচ্ছ কিছু নন। যে সাহস আর তাকত্ আমি আপনার মধ্যে দেখেছি, তাতে আপনার দ্বারা এ দুনিয়ায় অসাধ্য সাধন হতে পারে। ইতি।

–দিলারাবানু।

এক নিঃশ্বাসে পত্রখানা পাঠ করে পথের উপর দাঁড়িয়েই বখতিয়ার তা আর একবার পাঠ করলো। অতঃপর লম্বা একটা শ্বাস টেনে কিছুক্ষণ সম্বিতহীন অবস্থায় উদাস নেত্রে চেয়ে রইলো।

পার্শ্বে দণ্ডায়মান পত্রবাহক একটু নড়ে চড়ে বললো–হুজুর বলছিলাম কি–

বখতিয়ার আপন খেয়ালে এক কদম সরে গেল। সে অন্যমনস্ক আছে দেখে পত্র বাহকও এক কদম এগিয়ে এসে গলা ঝেড়ে বললো–হুজুর–বলছিলাম কি, আপামণির চোখমুখ দেখেই –

বখতিয়ারের খেয়াল ফিরতেই সে ব্যস্ত কণ্ঠে বললো–এ্যাঁ কি হয়েছে আপামণির?

ঃ না, বলছিলাম– আপামণির চোখ মুখ দেখেই বুঝেছি–বড় পেরেশান দীল নিয়ে উনি এখান থেকে গিয়েছেন। অমন খুবসুরাতের মুখখানা কালো হয়ে গিয়েছিল। সম্ভব হলে উনার সাথে মোলাকাত করার কোশেশ করবেন হুজুর।

বখতিয়ারের মুখে এর কোন জবাবই যোগালো না। সে শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে পত্রবাহকের মুখের দিকে চেয়ে রইলো। আরো কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকার পর পত্রবাহক বললো–তাহলে এযাযত দেন হুজুর, আমি এবার আসি।

বখতিয়ার উদাস কণ্ঠে বললো–এসো–।

তিন

ইওজ খলজীর স্ত্রী হুসনে আরা বেগম বাড়ীর মধ্যে গৃহকর্মে ব্যস্তছিল। ছেলের মুখে খবর পেয়েই সে দেউটির কাছে এসে পর্দার আড়ালে দাঁড়ালো। বখতিয়ার খলজী এসেছে।

ইওজের কাছে হুস্নেআরা শুনেছে–বখতিয়ার এখন গজনীতে এবং সে এখন এক মস্তবড় মানুষ। প্রভূত ক্ষমতা ও অঢেল ধনদৌলতের মালীক। কিন্তু একি! পর্দার আড়াল

থেকে সেই গজনী–ফেরত বখতিয়ারের মুখের দিকে চেয়েই চমকে উঠলো হুস্নে আরা। চিরসবুজ মহিরুহের পরিবর্তে এ যেন এক পাতাঝরা মরাগাছ তার সামনে দণ্ডায়মান। অনাহার অনিদ্রা আর বিমারের আলামত তার সারাঅঙ্গে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

আড়াল থেকে উদ্বেগের সাথে হুসনে আরা বললো–আস–সালামু আলাইকুম ছোটমিয়া। একি হালত্ আপনার! কোন বীমার টিমার হোয়েছে নাকি?

জবাবে বখতিয়ার খলজী ক্ষীণকণ্ঠে বললো–ওয়ালাইকুমুস সালাম। না ভাবী, ওসব কিছু হয়নি। এমনি খানিক কাহিল হয়ে পড়েছি।

হুসনে আরা প্রশ্ন করলো–শুনলাম, গজনীতে নাকি গিয়েছিলেন?

ঃ জি–হ্যাঁ।

ঃ কোন কিছুই হলোনা?

ঃ মানে!

ঃ কে যেন আপনাকে নকরী দিতে চেয়েছিলেন?

ঃ হ্যাঁ–ভাবী।

ঃ দিলেন না?

ঃ কি করে বুঝলেন?

ঃ আপনার হালত দেখে। না–উম্মিদের আজাড় ঢেকে রাখতে পারেননি।

বখতিয়ার থেমে গেল। ক্ষণিক নীরব থেকে ধীর কণ্ঠে বললো–ঠিকই বলেছেন। কিছুই আমার হলো না।

হুস্নে আরা আবার প্রশ্ন করলো–মোলাকাত? ওটাও হয়নি?

ঃ কার সাথে?

হুস্নে আরার কণ্ঠ থেকে ক্ষীণ একটা হাসির রেশ ভেসে এলো। সে বললো– ছোটমিয়া, তামাম মুলুকের মানুষ যেটা জানলেন, আমি সেটা জানবোনা, এটা আপনি আন্দাজ করলেন কি করে?

ঃ ভাবী!

ঃ আমার ধারণা ছিল–আপনার কাছেই খবরটা আমি পাবো আর অনেকের আগেই পাবো। এমন একটা গরম খবর কি করে আপনি চেপে গেলেন, আমি তা সোচ্ করে পাচ্ছিনে।

বখতিয়ারের মুখেও এবার ম্লান হাসি ফুটে উঠলো। বললো–গরম খবর হলে নিশ্চয়ই আমি বলতাম। কিন্তু খবরটা আসলে একটা ঠাণ্ডা খবর ভাবী, অন্ততঃ এযাবত ঠাণ্ডা খবরই ছিল। এই এতদিনে ওটা একটু গরম হয়ে উঠেছে।

ঃ কি রকম?

ঃ সেটা পরে। এখন বলুন, দোস্ত কোথায়?

ঃ এই একটু বাইরে গেলেন। এখনই ওয়াপস্ আসবেন।

বখতিয়ার এবার ইতস্ততঃ করে বললো–ভাবী কিছুটা শরমিন্দা বোধ করলেও, না বলে পারছিনে। একটানা গজনী থেকে আসছি। আমার ঘরতো কয়দিন থেকে বন্ধ। আনযাম করতে সময় লাগবে। আপনার ঘরে কিছু আছে এখন? জব্বোর ভুখ লেগেছে। নিদেনপক্ষে এক গ্লাস পানি হলেও চলবে।

এতক্ষণে হুঁশে এলো হুসনে আরা। চমকে উঠে আফসোসের সাথে বললো–এ্যাঁ! তাই তো! ছিঃ–ছিঃ–ছিঃ। আপনাকে এভাবে দাঁড় করে রেখে একি তামাসা শুরু করেছি আমি। আসুন আসুন, শিগ্গির ঐ দহলীজে গিয়ে বসুন। আমি এক্ষুনি খাবার ব্যবস্থা করছি।

দেউটি থেকে ছিটকে গেল হুসনে আরা। তার ছোট্ট বাচ্চাটাকে ডেকে তৎক্ষণাৎ বখতিয়ারের কাছে পাঠালো এবং তার মাধ্যমেই বখতিয়ারকে দহলীজে বসিয়ে সে ক্ষিপ্রহস্তে খানা তৈরী করতে লাগলো।

ইতিমধ্যেই ইওজ খলজী বাইরে থেকে ওয়াপস্ এলো। বখতিয়ারের চেহারা দেখে সেও চমকে উঠলো। দুই দোস্ত সালাম বিনিময় করতেই ইওজ খলজীর ছেলে বললো–আব্বু, চাচার জব্বোর ভুখ লেগেছে। আগে জলদি তাকে খেতে দাও।

ছেলের বয়স অল্প। হঠাৎ তাকে এ কথা বলতে শুনে ইওজ খলজী ব্যস্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো–এ্যাঁ! তাই?

জবাবে ছেলেটি বললো–হ্যাঁ আব্বু! চাচা বললেন, তার জব্বোর ভুখ লেগেছে।

শুনে ইওজ খলজী দিশেহারা হয়ে গেল। বখতিয়ার মুখ ফুটে নিজে যখন বলেছে, তখন ব্যাপারটা আদৌ কোন মামুলী ব্যাপার নয়। কয়দিন ধরে যে সে অনাহারে আছে, কেজানে।

পরিস্থিতি লাঘব করার ইরাদায় বখতিয়ার কিছু বলতে গেল। কিন্তু ইওজ তখন আওয়ারা। তাকে মুখ খোলার ফুরসুতটাও না দিয়ে ইওজ খলজী ঝড়ের বেগে বাড়ীর মধ্যে ছুটে গেল।

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সে আবার খাবার নিয়ে ওয়াপস্ এলো এবং বখতিয়ারের পাশে বসে নিজে তাকে পরিবেশন করে খাওয়ানোর পর তখনই তাকে শুইয়ে দিলো। বিশ্রামের আগে ইওজ তাকে কথা বলতে দিলো না বা কোন কথার মধ্যে নিজেও সে গেলোনা।

বাদ মাগরিব দুই বন্ধু আলাপ শুরু করলো। হুস্নে আরাও এসে পর্দার পাশে দাঁড়ালো। বখতিয়ার আগেআদ্য-অন্ত তামাম ঘটনা বয়ান করলো। এরপর দিলারা বানুর-পত্রখানা ইওজ খলজীর হাতে দিলো।

বখতিয়ারের বয়ান শুনেই ইওজ খলজী বিহ্বল হয়ে গেল। এর উপর পত্র খানা বাড়িয়ে ধরতেই সে তা ছোঁ মেরে নিয়ে আলোর সামনে ঝুঁকে পড়লো এবং এক নিঃশ্বাসে পত্রখানা আগাগোড়া পাঠ করে বিপুল উল্লাসে সে লাফিয়ে উঠে বললো–মারদিয়া কিল্লা–মার দিয়া কিল্লা। বখতিয়ার ভাই কামাল কিয়া! বিলকুল কামাল কিয়া! ওরে বাস্‌রে!

হাত পা ছুঁড়ে ইওজ খলজী চীৎকার করতে লাগলো। তা দেখে পর্দার আড়াল থেকে হুসনে আরা হাসিমুখে বললো–বহিন আমাদের কি লিখেছেন তা কিছু বলবেন, না একা একাই হাত–পা ছুঁড়ে আত্মঘাতী হবেন! ব্যাপারটা অন্যকেও বুঝতে দিন।

ইওজ খলজী আবেগের সাথে বললো–আরে বুঝবে কি?

একদম ঘায়েল করে দিয়েছে।

ঃ ঘায়েল করে দিয়েছে।

ঃ বিলকুল ঘায়েল করে দিয়েছে। আহারে! তোফা–তোফা!

ঃ তাজ্জব! আপনি নিজেই যে ঘায়েল হয়ে গেলেন দেখছি। ব্যাপারটা কি জানতে দেবেন? না সেরেফ ঐ–

ইওজ খলজী বাস্তবিকই বেশ একটু আওয়ারা হয়ে উঠেছিল। এবার সে কিছুটা শান্ত হয়ে বললো–জানবে–জানবে, অবশ্যই জানবে–এই পড়ছি শোনো–

বলেই পত্রখানা আর একদফা সশব্দে পাঠ করে ফের সে ঐ একই মেজাজে চীৎকার করে বলতে লাগলো––বললাম না, বললাম না আমি, দোস্ত আমার সাহেবজাদীর দীলটা একদম ঘায়েল করে দিয়েছে? এমন একটা দীল ঘায়েল করতে পারা আর সমরখন্দ্–বুখারা দখল করে নেয়া একদম সমান।

এবার হুসনে আরাও মোহিত হয়ে গেল। ইওজের সুরে সুর মিলিয়ে সেও বললো–ঠিক–ঠিক! হাজার কথার এক কথা। ছোটমিয়া দেখছি একদিনেই বুবুজানকে দীওয়ানা বানিয়ে দিয়েছেন। এটা সত্যিই একটা মস্তবড় খোশখবর।

দুইজনের ভাব দেখে বখতিয়ার খলজী বললো–আরে ভাবী, এরমধ্যে এত হৈ চৈ করার কি আছে! একজন মহিলা একটু আফসোস্ করে দু'কথা লিখেছেন দেখেই আনন্দে মেতে উঠেছেন আপনারা! এর বদলে আজ একটা নকরী যদি তোফা রকমের পেতাম, তাহলে না জানি আপনারা কি করে বসতেন

ইওজ বললো–মানে!

বখতিয়ার বললো–মানে, যে জন্যে সুদূর ঐ গজনীতে গিয়ে জান দিতে বসেছিলাম, সেই নকরীটাই পেলাম না, আর এতো এক–

বখতিয়ারকে তার মুখের কথা শেষ করতে না দিয়ে ইওজ খলজী প্রতিবাদ করে বললো–নকরী! আরে নকরী তুমি পাওনি তো কি হয়েছে? তুমি যা পেয়েছো তা এ দুনিয়ার হাজার বাদশা পায়না।

সঙ্গে সঙ্গে হুস্নে আরা বললো–বিলকুল হক কথা। ধন-দৌলাত-প্রতিপত্তি অনেক নাদানেরাও পায়। কিন্তু একটা দীলের মতো দীল পাওয়া সবার নসীবের ব্যাপার নয়।

বখতিয়ার বললো–ভাবী!

হুসনে আরা বললো–তাছাড়া নকরী পাওয়ার আশাওতো বিলকুলই খারিজ হয়ে যায়নি। বুবুজান যা বলেছেন, তাতে একটু তকলিফ করে হিন্দুস্থানে হাজির হলেই তো নকরী আপনি ইনশাল্লাহ পেয়েই যাবেন একটা।

ইওজ খলজী বললো–সেরেফ নকরীটাই দেখলে? মুনাফাটা দেখলে না?

হুসনে আরা জিজ্ঞাসুনেত্রে চাইতেই ইওজ ফের বললো–বুঝলে না? এরপরও বুঝলে না?

ঃ না, মানে মুনাফাটা কি?

ঃ কেন, ঐ সাহেব জাদী? উনাকেও তো পেয়ে যাবে সেই সাথে।

হুসনে আরা উল্লাসিত হয়ে উঠলো। বললো–হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিকই তো। সোবহান আল্লাহ! হিন্দুস্থানে ছোটমিয়াকে যেতেই হবে জলদি জলদি। রাহা খরচের কিছুটা না হয় আমি আমার হাত কানের জেওর বেচে জুটিয়ে দেবো।

ইওজ খলজী ফোঁশ করে উঠলো। বললো–কিছুটা মানে? কিছুটা মানে কি? দরকার হলে আমি আমার গাধা বেচে তামাম খরচ জুটিয়ে দেবো, তবু হিন্দুস্থানে যেতেই হবে দোস্তকে। কি দোস্ত্, রাজীতো?

হেসে ফেললো বখতিয়ার। হাসতে হাসতে বললো–তোমার আর ভাবী সাহেবার আগ্রহ দেখে আমার মানসিক অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে পাখা থাকলে এই মুহূর্তেই আমি উড়াল দিয়ে হাজির হতাম হিন্দুস্থানে। আর এক লহমা গরমশিরে থাকতাম না।

থমকে গিয়ে ইওজ খলজী বললো–মানে? তামাসা করছো?

ঃ তামাসা!

ঃ স্রেফ তামাসা। কিন্তু আমি তো দোস্ত্, তামাসার কথা বলিনি।

গম্ভীর হলো বখতিয়ারও। গম্ভীর কণ্ঠে বললো–না দোস্ত্, তামাসা আমিও করছিনে।

ঃ মানে?

ঃ ঠাট্টাচ্ছলে বললেও, ওটা আমার দীলের কথাই। ভেবে দেখলাম, এই গরমশিরে খামাখা আর সময় নষ্ট না করে সত্যিই আমাকে যেতে হবে হিন্দুস্থানে।

ঃ সত্যিই?

আরো বেশী শক্ত হলো বখতিয়ারের কণ্ঠ। বললো হ্যাঁ সত্যিই। তবে সেটা ঐ সাহেবজাদীর কারণে নয়, আমার জিন্দেগীটা যাচাই করে দেখার জন্যে।

খুশী হলো ইওজ খলজী। বললো–মারহাবা! মারহাবা!

ঃ আমার এই একঘেঁয়ে জিন্দেগীর মোড়টা আমাকে ঘোরাতেই হবে। ঐ সাহেবজাদীর সাক্ষাৎ পাওয়া আর তাঁর মদদে নকরী পাওয়া এ টুকুই এ জিন্দেগীর একমাত্র উম্মিদ আমার নয়। নকরীটা সেরেফ উপলক্ষ্য। উম্মিদ আমার তার চেয়ে অনেক বড়।

ঃ দোস্ত্!

ঃ নয়া জিন্দেগীর নয়া দুয়ার খুলতেই হবে আমাকে। কওম আর দ্বীনের জন্যে একটা কিছু করতেই চাই আমি। আর আমার এই উম্মিদ হাসিলের চাবিকাঠি ঐ সাহেবজাদীই নয়। মূলধন আমার আল্লাহতায়ালা আর আমার এই দুই বাজু; দরকার হলে পাহাড় কেটে তৈয়ার করবো আমার নয়া জিন্দেগীর রাহা।

বখতিয়ারের মুখমন্ডল পাথরের মতো কঠিন আর বাহুযুগল ইস্পাতের মতো শক্ত হয়ে এলো। তা লক্ষ্য করে ইওজ খলজী বিহ্বল কণ্ঠে বললো– আলহামদু লিল্লাহ!

বলেই চললো বখতিয়ার–আর আমার সেই নয়া জিন্দেগীর রণক্ষেত্র আমার নজরে একমাত্র ঐ হিন্দুস্থান। গোরস্তান হলেও ঐ হিন্দু স্থানই আখেরী মঞ্জিল আমার।

আবেগের আধিক্যে বখতিয়ার তার আজন্মের পুঞ্জীভূত উম্মিদ এই পয়লা এবং প্রশস্তভাবে মেলে ধরলো তার একমাত্র বিশ্বস্ত দোস্তের সামনে। তার বজ্রকঠিন সংকল্পের ছটায় ইওজ খলজীর চোখে মুখে চমক লেগে গেল। বখতিয়ার থামতেই ইওজ খলজী লাফিয়ে উঠে বললো। সাব্বাস। এতদিনে সেরেফ একটা ভাসা ভাসা ধারণাই ছিল আমার। ঐ সাহেবজাদীর মতো আজ আমারও দৃঢ় বিশ্বাস–এই দোস্তের দ্বারা সাত্যি সত্যিই একটা অসাধ্য সাধন হতে পারে।

বখতিয়ার এবার অপেক্ষাকৃত শান্তকণ্ঠে বললো–দোয়া করো দোস্ত্। আমি মনোস্থির করে ফেলেছি–আল্লাহ চাহেতো দু'একদিনের মধ্যেই আমি রওনা হবো হিন্দুস্থানে।

ঃ আল্লাহতায়ালা নিয়াত তোমার পূরা করুন। তুমি তৈয়ার হয়ে যাও দোস্ত্। রাহা খরচের ব্যাপার নিয়ে পেরেশান হতে যেওনা। ওটা আমাদের উপরে ছেড়ে দাও। যেভাবে পারি, ওটা আমরাই তোমাকে জুগিয়ে দেবো।

ঃ দোস্ত, আপনাদের এই পাকদীলের দাম আল্লাহ তায়ালা ছাড়া মানুষের দেয়ার তাকত্ নেই। রাহা খরচের চিন্তা আমি আগেই করে রেখেছি। আমার ঘর-দুয়ার আর

সামান-আদি যা আছে তা ঐভাবেই বেচে দিলে শুধু রাহা খরচই নয়, হিন্দুস্থানে গিয়ে কয়েকদিন চলার মতো খরচটাও জুটে যাবে।

ইওজ খলজী চমকে উঠলো। বললো-সেকি! সব কিছু বেচে গেলে, ফিরে এলে করবে কি?

বখতিয়ারের অধরে ক্ষীণ একটা হাসির রেখা ফুটে উঠলো। সে হাসি আনন্দের নয়, সে হাসি সংকল্পের। সে প্রত্যয়ের সাথে বললো-দোস্ত, কোন লড়াইয়ে জিততেই হবে-এমন প্রশ্ন থাকলে, পেছন ফেরার তামাম রাস্তা রুদ্ধ করে দিয়ে, তবে গিয়ে সে লড়াইয়ে নামতে হয়। নইলে দুর্বল মুহূর্তে পা দুটি ফের পেছনের পথ খোঁজে।

হুসনে আরা এতক্ষণ নীরব হয়ে শুনছিলো। এবার সে ভারী গলায় বললো তার মানে! ছোট মিয়া তাহলে এ জিন্দেগীর মতো আমাদের সাথে জুদা হয়ে যেতে চান?

বখতিয়ারের গলাও কিঞ্চিৎ ভারী হলো। বললো-ভাবী, সবার সাথে সবাইকে জুদাতো একদিন হতেই হবে। আমি না হয় কয়েকটা দিন আগেই তা হলাম। তবে দোওয়া করবেন, কামিয়াবী যদি এ জিন্দেগীতে আসেই আমার কোন দিন, তাহলে ইনশাআল্লাহ আবার আমরা এক হবো-একই-সাথে থাকবো। আপনাদের আমি দূরে ফেলে রাখবোনা।

দু'একদিনের কথা মুখে বললেও, বখতিয়ার খলজী দু' একদিনের মধ্যে তৈয়ার হতে পারলো না। তৈয়ার হতে তার হপ্তাকাল কেটে গেল। এরপর সে সামিল হলো সুদূর আরব-পারস্য-গজনী থেকে গরমশিরের পাশ দিয়ে ধাবমান হিন্দুস্থানগামী ব্যবসায়ীদের কাফেলার সাথে।

শুরু হলো যাত্রা। দীর্ঘ পথের বহুবাধা ডিঙ্গিয়ে, কাফেলার পর কাফেলা বদল করে এবং নানা পথে নানা দিকে ঘুরে ঘুরে বখতিয়ার খলজী শেষপর্যন্ত হিন্দুস্থানের রাজধানী দিল্লীতে এসে হাজির হলো।

বখতিয়ার যখন দিল্লীতে এসে পৌঁছলো, তখন সামওয়াক্ত অনেক আগেই পেরিয়ে গেছে। চার দিকে পুরোপুরি আঁধার নেমে এসেছে। ফলে দিল্লীতে এসে পৌঁছলেও, এই নয়া শহরের নয়া সুরাত সেদিন সে আর দেখার মওকা পেলোনা। আগত কাফেলার সাথেই শহরের কেনারে এক সরাইখানায় উঠলো। সেখানেই সে রাত্রি যাপন করে পরেরদিন ধীরে সুস্থে শহরের মধ্যে প্রবেশ করলো।

মুসলমানদের নয়া মুলুকের শাহী মোকাম দিল্লী। হিন্দুস্থানে মুসলমানদের সুবিখ্যাত রাজধানী। সুউচ্চ ইমারতের চূড়ায় চূড়ায় দীন ইসলামের পতাকা পত্‌পত্‌ করে উড়ছে।

নাঙ্গা তলোয়ার হাতে শৃঙ্খলারক্ষী অশ্বারোহী ফৌজ প্রশস্ত রাজপথের দুই প্রান্তে সামনে পিছে ছুটছে।

রাজপথে ঢল নেমেছে মানুষের। কর্মব্যস্ত মানুষ। কর্মান্বেষী মানুষ। দেশী ও বিদেশী। আড়তদার, তেজারতদার, দোকানদার, ফেরীওয়ালা, ভিস্তিওয়ালা, লাকরীওয়ালা। দালাল, ফলেল, ক্রেতা, বিক্রেতা, মুটে ও মযদুর। সাথে আছে আরো অনেকের আনাগোনা। হাতীর পিঠে, ঘোড়ার পিঠে, পালকী যোগে, টাঙ্গাযোগে এবং পদব্রজে আমীর-উমরাহ সাহেব- সুবাহ, সেপাই-সেনা আর প্রশাসনিক কর্মকর্তা কর্মচারীদের আনাগোনা।

বখতিয়ারের পরিচিত আর পাঁচটা শহরের রাস্তা আর হিন্দুস্থানের শহরগুলির রাস্তার মধ্যে যে ফারাগ তার সর্ব প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করলো, তাহলো-সেগুলোতে জায়গা বেশী মানুষ কম, এগুলোতে মানুষ বেশী, জায়গা কম। দিল্লীতে এ ফারাগটা আরো অধিক প্রকট। অনেকস্থানে হুঁশিয়ার হয়ে না চললে হাতীঘোড়া যান বাহন আর জনতার পদতলে পিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা জিয়াদা। অবশ্য অভিজাত এলাকাগুলোর অবস্থা কিছু ভিন্ন।

এই জন বহুল রাজপথে বখতিয়ার গোটা দিন ঘুরপাক খেয়ে ফিরলো। দিনান্তে সে যখন শ্রান্ত ক্লান্ত তবিয়তে সরাইখানায় ওয়াপস এলো, তখন সে বুঝলো-জিন্দেগীর প্রতিষ্ঠায় আল্লাহও চাই হিল্লেও চাই। হিল্লে ছাড়া একা একা ফালতু ঘুরে বেড়ালে সুরাহা কিছু কোনদিনই হবে না। অতএব, দিলারা বানুর প্রসঙ্গে তার চিন্তাভাবনা পুনরায় জোরদার হয়ে উঠলো। এদিকটা এড়িয়ে চলার যত ইচ্ছাই থাক তার, প্রয়োজন বড় বালাই। দিল্লীর রাজপথে একটা দিন ঘুরেই সে বুঝলো, অবলম্বন তার চাই-ই এবং দিলারাই এখন তার একমাত্র সেই অবলম্বন।

পরের দিন সকালেই সরাই থেকে বেরিয়ে অনেক তালাশ তকলিফ করে সে হুকুমতের সদর দপ্তরে হাজির হলো। কিন্তু এখানেও গোলক ধাঁধা। চত্বরের পর চত্বর, ইমারতের পর ইমারত, দপ্তরের পর দপ্তর। যেমনই জন সমাগম, তেমনই ব্যস্ততা। আপন ধান্দায় মত্ত সবাই। কথা বলার ফুরসুৎটুকুও নেই কারো।

অনেকক্ষণ এন্তেজারের পর একজন দারোয়ানকে সামনে পেয়ে বখতিয়ার তাকে সালাম দিয়ে প্রশ্ন করলো-আচ্ছা ভাই সাহেব, জান মোহাম্মদ সাহেবের দপ্তরটা কোনদিকে-মানে উনি কোন দপ্তরে আছেন, বলতে পারেন?

দারোয়ানজী ব্যস্ত ছিলেন। বখতিয়ারের প্রশ্নে থমকে দাঁড়িয়ে বিব্রতভাবে বললেন-কে আছেন?

বখতিয়ার বললো-জান মোহাম্মদ সাহেব।

ঃ জান মোহাম্মদ সাহেব!

ঃ জি-মানে-

ঃ কোন জান মোহাম্মদ?

ঃ ঐ যে যিনি গজনী থেকে এসেছেন। জরোর এক সাহেব সুবা মানে এয়সা মাফিক সাহেব সুবা যে, এদের সংখ্যা হাতের আঙ্গুলে গুণা যায়।

দারোয়ানজী গোস্বা হলেন। গোস্বাভরে বললেন-আরে গজনী থেকে ঐ আঙ্গুলে গোনা সাহেব সুবাইতো হাজারটা এসেছেন।এদের মধ্যে কোন জন জান মোহাম্মদ?

ফাঁপড়ে পড়লো বখতিয়ার। কথাটা তো ঠিকই। জান মোহাম্মদ সেরেফ একটি নাম। কোন পরিচয় কারো নয়। এই লক্ষ জনের মাঝে কয়জন জান মোহাম্মদ যে বর্তমান, তার হদিস কে রাখে? খেয়াল হতেই বখতিয়ার খলজী তাড়াহুড়া করে বললো-আরিজ-আরিজ। আরিজ জান মোহাম্মদ। উনি গজনীর আরিজ ছিলেন।

ঃ তাজ্জব! তাহলে আর এখানে এসেছেন কেন? আরিজ সাহেবের দপ্তরতো ঐদিকে। ঐদিকে যান-

ঝটপট পা বাড়ালেন দারোয়ানজী। বখতিয়ার ফের দ্রুতপদে তার সামনে গিয়ে অনুনয় করে বললো-ভাই সাহেব, মেহেরবানী করে কথাটা আমার শুনুন। উনি আর এখন আরিজ নেই। শাসন বিভাগে এসেছেন। কোন বড় পদে আছেন।

দারোয়ানজী আরো অধিক বিরত হলেন। এবার আবার উল্টা দিকে ইঙ্গিত করে নাখোশ হয়ে বললেন-ঐ দিকে ঐ দিকে। বড় বড় সাহেব-সুবাহ আর আমীর-উমরাহদের দপ্তর এখানে পাবেন কোথায়? ঐ দিকে। সিধা নাক বরাবর চলে যান। তারপর ডাইনে, তারপর বাঁয়ে, ফের ডাইনে-মানে বিলকুল শাহী মকানের নযদিক। সমঝা?

বখতিয়ার তা সমঝে নিতে পারলো কিনা সে তোয়াক্কা নারেখে দারোয়ানজী হন হন করে হাঁটা দিলেন। ফরমান আলীর প্রসঙ্গ তোলার মওকাই তিনি বখতিয়ারকে দিলেননা।

অতঃপর বখতিয়ার আরো অনেক লোকের কাছেই জান মোহাম্মদ সাহেব আর ফৌজদার ফরমান আলীর হদিস জানতে চাইলো। কিন্তু সকলের তরফ থেকেই যে জবাব সে পেলো তাতে তার মনে হলো-গরমশির থেকে হিন্দুস্থানে আসার যে রাস্তা কয়টা আছে, সে সব রাস্তার মাটি শুঁকলেও তাঁদের ঠাঁই ঠিকানার হাদিস তার কাছে অনেক বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠতো।

তার পরের দিন এসেও সে একইভাবে তালাশ করে সারা শহর ঘুরলো। কিন্তু ফায়দা কিছুই হলোনা। তাদের ঠাঁই ঠিকানার হদিস যেমন অন্ধকারে ছিল, তেমনই

অন্ধকারেই রইলো। বরং সেদিন তাকে অনেকেই যে এলেম দান করলো, তাতে তাদের তালাশ করে বেড়ানোটাই সে শেষ অবধি ছেড়ে দিলো। বখতিয়ার জানে, জান মোহাম্মদ সাহেব হিন্দুস্থানে এসেছেন। দিল্লীতেই এসেছেন-এ তথ্য তার অজানা। অনেকেই তাকে যুক্তি দেখিয়ে বললেন-হিন্দুস্থান মানেই দিল্লী নয়। দিল্লীছাড়াও আরো অনেক শহর আছে এখানে। আজমীর, অযোধ্যা, বাদাউন-ইত্যাদি ইত্যাদি। বেয়াকুফের মতো অন্ধকারে না ঘুরে, কোথায় উনি এসেছেন সেটা আগে নিশ্চিত হওয়ার পর তবে তালাশ করো।

নিতান্তই হক কথা। বখতিয়ারের এতক্ষণে হুঁশ ফিরলো। দিলারার দুঃস্বপ্ন দীল থেকে হেঁটে ফেলে দিয়ে সে যখন নিজ অবস্থায় ফিরে এলো, তখন সে দেখে সামনে এক প্রশস্ত ময়দান এবং সে ময়দানে অনেক লোক এক কাতারে দাঁড়িয়ে। সে খোঁজ নিয়ে জানলো, সে এখন এখানকার আরিজ সাহেবের দপ্তরের সামনে দন্ডায়মান এবং দিল্লীর শাসনকর্তা কুতুবউদ্দীন আইবকের আদেশে আরিজ সাহেব কুতুবউদ্দীনের খাশ বাহিনীতে সেপাই নিয়োগ করছেন। এ কাতার সেই সেপাই পদে প্রার্থীদের কাতার।

সোবহান-আল্লাহ! বখতিয়ারের কণ্ঠ থেকে অস্ফুট এক আওয়াজ বেরিয়ে এলো। সে দৌড়ে গিয়ে কাতারের সাথে সামিল হলো। কিন্তু বেলা তখন অবেলা। সকলের পেছনে থাকায় সেদিন আর সে আরিজের নাগালে যেতে পারলো না। বাছাই কর্ম সে দিনের মতো স্থগিত রেখে আরিজ সাহেব উঠে গেলেন। ফলে, অনেকের মতোই সেদিন তাকে ঐ কাতার থেকেই ওয়াপস্ যেতে হলো। তবে সে জেনে গেলো-এই সেপাই নিয়োগের কর্মকান্ড কয়দিন থেকেই চলছে এবং আরো কয়দিন চলবে।

রাত্রিটুকু কোন মতে কাটিয়ে সুবেহ সাদিকের সাথে সাথেই বখতিয়ার খলজী সরাই থেকে বেরিয়ে পড়লো এবং দ্রুতপদে সেই ময়দানে এসে হাজির হলো। এত সকাল সকাল এসেও সে তাজ্জব হয়ে দেখলো তিন চারজন প্রার্থী তার আগেই এসে কাতার ধরে দাঁড়িয়ে গেছে। বখতিয়ারও সঙ্গে সঙ্গে কাতারভুক্ত হলো।

অতঃপর আসতেই লাগালো প্রার্থীরা। বেলা যত বাড়তে লাগলো কাতার ততই লম্বা হতে লাগলো। দেখতে দেখতে গোটা ময়দান কোলাহল মুখর হয়ে উঠলো।

আরিজ সাহেব সেদিন অনেক দেরীতে এসে বসলেন। সময়টা পুষিয়ে নেযার ইরাদায় তিনি তড়িঘড়ি কাজ সারতে লাগলেন। বখতিয়ারের সামনে থেকে তর তর করে সরতে লাগলো মানুষ এবং একটু পরেই হুকুম-বরদারের নির্দেশে বখতিয়ার এসে আরিজের সামেন দাঁড়ালো। খাতার উপর নজর রেখে আরিজ সাহেব বখতিয়ারকে সওয়ালের পর সওয়াল করতে লাগলেন। বিনীত কণ্ঠে বখতিয়ার তার জবাব দিতে লাগলো। আরিজ সাহেব বললেন-নাম?

জবাবে বখতিয়ার বললো-ইখতিয়ার উদ্দীন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী।

ঃ মকান?

ঃ গরমশির?

ঃ হাল মোকাম?

ঃ দিল্লী।

ঃ ঘোড়া আছে?

ঃ জিনা।

ঃ ঢাল-তলোয়ার?

ঃ না।

ঃ তবে?

ঃ জি?

ঃ ঘোড়া আর ঢাল-তালোয়ার কিছুই যখন নেই তখন কেন খামাখা এসেছো?

গোস্বাভরে নজর তুললেন আরিজ সাহেব। বখতিয়ারের চেহারা দেখে আরো তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। বললেন—এ্যাঁ! এ কি! তুমি? তুমি এ কাতারে কেন?

বখতিয়ার খলজী বিনীত কণ্ঠে বললো—জি, সেপাই হতে চাই আমি।

ঃ তুমি। কি তাজ্জব কথা। এই চেহারা নিয়ে সেপাই হতে এসেছো?

ঃ জনাব, প্রশ্ন টাতো চেহারা নিয়ে নয়, তাকত্ নিয়ে। লড়াইয়ের তাকত্।

ভ্রূ কুঞ্চিত করে আরিজ সাহেব বললেন—লড়াই এর তাকত্। বার হাত কাঁকুরের তের হাত বিচির মতো, দেড় গজ মানুষের আড়াই গজ হাত তোমার! তুমি লড়াই করবে কি? ভাগো—ভাগো—।

আরিজ সাহেব চোখ নামিয়ে নিলেন। হুকুম বরদার পরের জনকে আহবান করার উদ্যোগ করতেই বখতিয়ার খলজী ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো—জনাব, একটা কথার অর্থ মোটেই আমি বুঝলাম না, যাদের কাজ জান দিয়ে দুষমনদের মোকাবেলা করা, তাদের খুবসুরাতটা কোন কাজে লাগে—মানে চেহারা তাদের জৌলুসদার না হলে কি এমন এসে যায়?

কোন প্রার্থীর কোন প্রশ্নের জবাব আরিজ সাহেব দেন না। কিন্তু বখতিয়ারের বাচনিক শুনে ক্রুদ্ধ হলেও জবাব দিলেন আরিজ সাহেব। বললেন— খুবসুরাত! খাপসুরাত কে চায়? কিছু দাগ চিহ্ন থাকলেও খুবসুরাত তো মা'শা আল্লাহ উমদাই আছে তোমার। কিন্তু ও দিয়ে কি হবে? গতর চাই, গতর! ইয়াবড়ো গা—গতর। ভাগো—

ফের চোখ নামালেন আরিজ সাহেব। হুকুমবরদার পরেরজনকে আহবান করলো। উপায় অন্তর না দেখে বখতিয়ার খলজী ওখান থেকে না—খোশ দীলে সরে এলো এবং পেরেশান দীলে ধীরে ধীরে ময়দান থেকে বেরিয়ে গেল।

আবার সেই অন্ধকার! সরাইখানায় ওয়াপস্ এসে দুশ্চিন্তার অথৈ তলে তলিয়ে গেল বখতিয়ার। পাথেয় তার খতম হয়ে এসেছে। অবলম্বনের একরত্তি ভরসাও সে এ পর্যন্ত

অর্জন করতে পারেনি। অচেনা—অজানা এই ভিন্নতর পরিবেশের দেশ-ভূঁইয়ে এমন বান্ধব নেই তার, যার কাছে সে এক পাত্র পানির আব্দার করতে পারে। পশ্চিম মুখী হওয়ার কোন ফাঁক রেখে সে আসেনি। পেছন ফেরার পথটা সে বন্ধ করেই এসেছে!

এগুলে এখন এগুতে হবে সামনেই। দিল্লী ছেড়ে যেতে হলে যেতে হবে পূর্বদিকেই। মুসলমান অধিকৃত পূব মুলুকের এলাকায়। যেতে হবে বাদাউন—অযোধ্যা—নাগোওরী বা এমন কোন অজ্ঞাত আর অচিন আজব মুলুকে।

ভাবতে ভাবতে অনেক রাতে ঘুমিয়ে পড়লো বখতিয়ার। ঘুম থেকে উঠেও ফের ভবিষ্যতের কথাই সে সরাইখানায় বসে বসে ভাবছিলো। একমাত্র পেটের চিন্তা হলে কোন চিন্তাই তার ছিল না। কিন্তু তার স্বপ্ন আলাদা। আর সে স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার পথে হতাশ হওয়ার মওকা নেই। কদম তার কমজোর হলে চলবেনা।

এমন সময় সে দেখতে পেলো—এই সরাইয়েই অবস্থানকারী কিছু ব্যবসায়ীদের একটা দল দিল্লী থেকে বদাউনে যাত্রা করছে। ব্যবসায়ীদের এই দলের তামামগুলোই বাদাউনের বাসিন্দা। আরব—ইরাক—ইরান—তুরান আর গজনী—বুখারা সিস্তান থেকে আগত নানা কিসিমের মাল এরা দিল্লী থেকে কেনে এবং বাদাউনের বাজারে নিয়ে বিক্রি করে। কেনা কাটা শেষ হয়েছে। উট—গাধা—খচ্চরের পিঠে মাল তোলা খতম। এক্ষুণি বেরিয়ে পড়বে এই ব্যবসায়ীদের কাফেলা।

বখতিয়ার খলজী মনোস্থির করে ফেললো। এই ব্যবসায়ীদের একজন বখতিয়ারের পাশের খাটিয়ায় রাত্রি যাপন করেছিল। সেই সময় সেই লোকের সাথে সামান্য কিছু আলাপ হয় বখতিয়ারের। সেই সুবাদে বখতিয়ার খলজী সেই লোকেরই শরণাপন্ন হয়ে তাকে বিশেষভাবে চেপে ধরলো এবং তাদের কাফেলায় সামিল হয়ে বাদাউন যাওয়ার আরজ পেশ করলো। দীলটা বেশ নরম ছিল লোকটার। তাই পয়লা পয়লা খানিকটা আমতা আমতা করলেও শেষ পর্যন্ত সে বেচারা রাজী হয়ে গেলেন। তাঁরই সুপারিশের কারণে কাফেলার অন্যান্য লোকেরা বখতিয়ারকে গ্রহণ করতে ওজর আপত্তি করলো না।

ব্যবসায়ীদের কাফেলা মূলতঃই মালামালের কাফেলা। মালামালের নিরাপত্তার খাতিরেই কোন অচেনা লোককে এরা কাফেলাভুক্ত করে না। অনেকটা বরাতের জোরেই বখতিয়ার খলজী কাফেলাভুক্ত হয়ে গেল।

একটু পরেই নড়ে উঠলো কাফেলা। শুরু হলো যাত্রা। দিল্লী থেকে বাদাউন অনেক দূরের পাল্লা। পথে অনেক চড়াই—উৎরাই। জনশূন্য বনজঙ্গল, পাহাড়—টিলা আর দুর্গম প্রান্তরাদি পেরিয়ে বাদাউন পৌছতে হয়।

সবেরেই শুরু হলো সফর। অতঃপর একটানা এগিয়ে চললো কাফেলা। পর পর কয়েকটা পার্বত্যপথ, আঁকা বাঁকা বনপথ আর নির্জন মাঠ ময়দান পেরিয়ে সামওয়াক্তের একটু আগে কাফেলা এসে আর একটা দুর্গম পথে পড়লো। দুইদিকে উঁচু উঁচু মাটির পাহাড়। পাহাড় জুড়ে বন। কোথাও বা পাতলা, কোথাও বা গভীর। এরই মাঝে আঁকাবাঁকা সংকীর্ণ সমভূমি। এই সমভূমিটাই পথ। এ পথের দূরত্ব প্রায় এক ক্রোশ। এর পর জনশূন্য ক্রোশ খানেক প্রান্তর। তারপর লোকালয়।

শেষ প্রহরের ক্ষীণ রশ্মি তখনও বিদ্যমান। কিন্তু এই পাহাড় টিলা আর বন-বনানীর অন্তরালে সে আলোর লেশটুকুও নেই তখন। সংকীর্ণ পথ বেয়ে ধাবমান এই কাফেলাটি আপ্রাণ কোশেশ করছে অতি সত্বর এই শংকাজনক পথটি পেরিয়ে ওঠার উদ্দেশ্যে। মাগরিব ওয়াক্তের মধ্যেই তারা লোকালয়ে পৌঁছতে চায়। সেখানেই রাত্রিযাপন করার পর আবার তারা পথ ধরবে সবেরাতে।

সূর্যের আলো না এলেও পথের মাঝে আঁধার তখনও নামেনি। আবছা আলো আবছা আঁধার অবস্থা। পথ এবং পথের পাশের চারদিকটা পরিষ্কারই দেখা যাচ্ছে। এমন সময় আচানক হা-রা-রা-রা!

ডাইনে বাঁয়ে সামনে থেকে বিশ বাইশ জন রাহাজান ঘিরে ফেললো কাফেলা। আতংকে আঁতকে উঠে কাফেলার লোকজনেরা হৈ চৈ শুরু করলো। জান বাঁচানোর ইরাদায় অনেকেই তৎক্ষণাৎ মালমাত্তা ফেলে রেখে দৌড় দেয়ার উদ্যেগ করলো। কেউ কেউ আবার রাহাজানদের সমীপে তারস্বরে আরজ পেশ করতে লাগলো-'দোহাই বাবা মাল নাও, জানে আমাদের মেরোনা।' রাহাজানদের ঘা খেয়ে দু'একজন 'ওরে বাপ্‌রে-মলেমরে-বলে এতিমের মতো চীৎকার জুড়ে দিলো।

রাহাজানদের হাতে হাতে শরকী বল্লম। কারো হাতে তলোয়ার। কাফেলার হাতিয়ার বলতে কয়েকখানা লাঠি মাত্র। আসলে, শুধু জনসংখ্যা প্রদর্শনই এ ধরণের কাফেলা গুলোর একমাত্র বল। লড়াই করার প্রস্তুতি এদের অধিকাংশেরই থাকেনা। বিভিন্ন স্থান-গোত্রের, বিভিন্ন ধ্যান-ধারণার মানুষেরা এক কাফেলায় চলে। লড়াই করার সমোঝোতা বা শক্তিজোট এ কারণে এদের মধ্যে পয়দা হয় না। সকলেই ব্যবসায়ী। হিসেব-নিকেশে দক্ষ। কিন্তু লড়াই করার কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ব্যবসায়ীদের মধ্যে থেকে বড় একটা আসে না। সুবিধেবাদীর মতোই এরা প্রত্যেকেই নিজকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। দু'চারজন ক্ষুদে ডাকু'র মোকাবেলটাই করতে পারে, সংগঠিত রাহাজানদের সামনে এরা অসহায়।

রাহাজানদের নিশানা মালামাল, যাত্রীদের জান নয়। অবশ্য বাধা এলে দুটোর দিকেই হাত বাড়িয়ে দেয় এরা। পথচারীদের মধ্যে আতংক সৃষ্টি করাটাই পয়লা নিশানা তাদের। আতংক পয়দা করে কাফেলার লোকজনদের বিতাড়িত করতে পারলেই মাল এবং মালবাহী জীব-জানোয়ার তামামই তাদের হস্তগত হয়। এর জন্যে পয়লা পয়লা দু'চারজনের জান নিতেও পিছ্ পা এরা হয় না।

কাফেলার পক্ষ থেকে কোন প্রতিরোধ সঙ্গে সঙ্গে না আসায় রাহাজানরা সরাসরি মালের দিকে ধাবিত হলো। এমনই সময় গর্জে উঠলো বখতিয়ার- হুঁশিয়ার!

অতঃপর সে কাফেলাভুক্ত লোকজনদের বুলন্দকণ্ঠে হাঁক দিয়ে বললো- আপনারা কি মানুষ না ভেড়ার বাচ্চা? কয়জন মাত্র হামলা কারীর ভয়ে আপনারা এত লোক এক সাথে জান নিয়ে দৌড়াচ্ছেন? যে যা পান তাই হাতে রুখে দাঁড়িয়ে দেখুন- এরাই জান নিয়ে ওয়াপ্‌স যেতে পারবে না।

বলতে বলতেই বখতিয়ার শক্ত একটা লাঠি হাতে লাফিয়ে পড়লো রাহাজানদের সম্মুখে এবং বিদ্যুৎবেগে বন বন করে লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে রাহাজানদের অগ্রভাগে এমন চাপ পয়দা করলো যে, আচানক এই আক্রমণে হতবুদ্ধি রাহাজানরা থমকে গেল এবং কয়েকজন আতংকে পেছন দিকে ছিটকে পড়লো।

দূরে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখামাত্র কাফেলা ভুক্ত কিছু কিছু হিম্মতদার লোকের বুকে হিম্মত ফিরে এলো। সঙ্গে সঙ্গে তারাও অবশিষ্ট লাঠিগুলি তুলে নিয়ে ছুটে এলো এবং বখতিয়ারের পাশে এসে হামলা শুরু করলো। এই সম্মিলিত হামলার মুখে রাহাজানরা নাজেহাল হয়ে পড়লো।

প্রায় দেড়শোর মতো লোক ছিল এই কাফেলায়। এদের মধ্যে বিশ ত্রিশজন লোকমাত্র শত্রুর সাথে লড়ছিল। হতবুদ্ধি অবস্থায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর বাদবাকী লোকদের মধ্যে হুঁশ এবং সাহস এক সাথে দুটোই ফিরে এলো। রান্না-বান্নার প্রয়োজনে কিছু যাত্রী লম্বা লম্বা চেলাকাঠ একটা গাধার পিঠে বোঝাই করে নিয়ে ছিল। হাতে হাতে সেগুলোই তুলে নিয়ে এবার মার মার আওয়াজ তুলে সকলেই ছুটে এসে ঘিরে ধরলো রাহাজানদের। বিশ বাইশ জন রাহাজান আর তাদের বুকে পিঠে দেড় শতাধিক মারমুখো মানুষ। এবার আঁতকে উঠলো রাহাজানরা। তাদের মনোবল এর আগেই অর্ধেক হয়ে গিয়েছিল। দেখতে দেখতে গড়িয়ে পড়লো রাহাজানদের কয়েকজন। তাদের হাতিয়ারও ইতিমধ্যেই হাতছাড়া হয়ে গেল। নিশ্চিত মউত থেকে নাজাত লাভের উম্মিদে বাদবাকী রাহাজানরা শ্বাস-দম বন্ধ করে বনের দিকে দৌড় দিলো বিধ্বস্ত অবস্থায়।

নিদারুণ এক মুসিবত থেকে নাজাত পেলো কাফেলা। এ পক্ষের কয়েকজন অল্প কিছু আহত বা অল্প পরিমাণ ক্ষত-বিক্ষত হলেও 'সাব্বাস সাব্বাস' রব উঠলো সবার মুখে। শুরু হলো বখতিয়ারকে কেন্দ্র করে উল্লাস। কেউ কেউ তাকে একদম কাঁধের উপর তুলে নিলো। এই একটা লোকের-জন্যই এত লোকের এত মাল এবং সেই সাথে বেশ কিছু জীবনও রক্ষে পেয়ে গেল।

অতঃপর বখতিয়ার হলো এই কাফেলার মধ্যমণি। কাফেলার তামাম লোক বলাবলি করতে লাগলো, বরাত তাদের শানদার ছিল বলেই এই লোকটাকে দলভুক্ত করতে কেউ বিরোধিতা করেনি। এ লোক আজ না থাকলে রাহাজানদের রুখে দাঁড়ানোর সাহস তাদের আসতো না এবং প্রভূত অর্থের মালামাল সব হারিয়ে মিসকীন হয়ে সবাইকে ঘরে ফিরতে হতো। কারো কারো নসীবে হয়তো এই ঘরে ফেরার মওকাটা ও জুটতো না।

বলা বাহুল্য, বখতিয়ারের আহার পরিচ্ছদ-রাহাখরচ-তামাম কিছু অতঃপর এই কাফেলার উপর বর্তালো।

নতুন করে কাফেলা আবার যাত্রা শুরু করলো। সেই সাথে শুরু হলো বখতিয়ারের পরিচিতি নিয়ে প্রশ্ন। প্রশ্নোত্তরে বখতিয়ার সংক্ষেপে তার ইরাদার কথা ব্যক্ত করলো। সে জানালো, কোন না কোন সেনাদলে যোগদান করার ইরাদা নিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়েছে।

এই ব্যবসায়ীদের অনেকেই ছিলেন বাদাউন শহরের বেশ গণ্যমান্য ব্যক্তি। তাঁরা সমস্বরে জানালেন তাঁদের পক্ষে এটা আদৌ কঠিন কাজ হবে না। বাদাউনের শাসনকর্তা মালীক হিজবর-উদ্দিন সাহেবের সাথে ব্যক্তিগত পরিচয় আছে তাদের মধ্যে অনেকের। তাঁরা তাঁকে বললে, এই সামান্য কথা রাখতে মালীক হিজবর উদ্দীন সাহেব তিল পরিমাণ ইতস্ততঃ করবেন না।

জাররা পরিমাণ হলেও একটা মোড় ঘুরলো বখতিয়ারের জিন্দেগীর। কাফেলাটি অতঃপর নিরাপদে বাদাউনে এসে পৌছলো। ব্যবসায়ীদের মেহমানরূপে বখতিয়ার খলজী বাদাউনে স্বাচ্ছন্দ্যময় আশ্রয় লাভ করলো। ব্যবসায়ীদের তদবিরটাও একেবারেই ব্যর্থ হয়ে গেল না। বখতিয়ারের চেহারা দেখে বাদাউনের শাসনকর্তা মালীক হিজবর উদ্দিন পরিতৃপ্ত না হলেও সকলের সুপারিশে এবং বখতিয়ারের সাহসিকতার কথা শুনে তিনি নগদ বেতনে বখতিয়ারকে তাঁর সেনাদলে নিয়োগ করলেন। বখতিয়ার এই পয়লা তার পায়ের উপর দাঁড়ালো।

চার

ইনসানের অন্তরের গতি বড় দুর্বোধ্য। কখন যে কোনটাকে সে পরমবস্তু মনে করে সেটা সে নিজেও ভাল বোঝে না। যা সে পায়না, তার মতো পরমবস্তু এ দুনিয়ায় আর হয়না। যে মাছটা ফস্‌কে যায়, তার মতো বড় মাছ কল্পনা করা যায় ন। যা সে পাওয়ার জন্য উদগ্রীব, তা পেতে বিলম্ব হলে এতই সে পেরেশান হয়ে পড়ে যেন ওটা পেলেই তার জিন্দেগীর তামাম চাওয়ার পরিসমাপ্তি ঘটবে। দীল তার পরম তৃপ্তি লাভ করবে!

কিন্তু কি তাজ্জব! সে যখন তা পায়, তা নিয়ে সে সাময়িক ভাবে পরিতৃপ্ত হলেও এর পরেই দীল আর তার আখেরী তৃপ্তি এর মধ্যে খুঁজে পায়না। অন্যটার আকাঙ্খায় ফের কাতর হয়ে পড়ে। এইটাই স্বাভাবিক। ইনসানের জিন্দেগীটাই যেখানে নিয়তই পরিবর্তনশীল সেখানে তার আকাঙ্খার স্থিতিশীলতা কল্পনা করা বাতুলতা। শৈশব থেকে কৈশোর, কৈশর থেকে যৌবন, যৌবন থেকে বার্ধক্যে অবিরাম একটানা ছুটতেই আছে ইনসান। এ হেন অবস্থায় কোন মুহূর্তের একটা পাওয়াই জিন্দেগীর তামাম পাওয়া হতে পারেনা কিছুতেই। সর্বোপরি, মানব জীবনের তৃপ্তিবোধের চক্রটাও অত্যন্ত জটিল।

বখতিয়ার খলজীর কথা অবশ্য আলাদা। সিঁড়ির পর সিঁড়ি ভেংগে উচ্চ মার্গে উঠবে সে, এটা তার আজন্মের উম্মিদ। কামিয়াবীর ভার তার আল্লাহতায়ালার হাতে। কাজেই বর্তমানকে পরিহার করে ভবিষ্যতকে আঁকড়ে ধরার, খন্ডিত আলোর সীমিত গন্ডী ত্যাগ করে সীমাহীন অন্ধকারে ঝাঁপ দেয়ার দুর্বার আকাঙ্খা দীলে তার থাকবেই।

বাদাউনের নকরীতে বখতিয়ারের কিছুকাল ভাল ভাবেই কাটলো। এই নকরীটাকে কাজে লাগিয়ে সে প্রাথমিক ভাবে অনেকখানি ফায়দা হাসিল করলো। একজন সেপাইয়ের অপরিহার্য উপকরণ অশ্ব আর হাতিয়ার কিছুই তার ছিল না। এই বেতনের অর্থ দিয়ে বখতিয়ার ক্রমে ক্রমে নিজস্ব অশ্ব ও যাবতীয় হাতিয়ারাদি খরিদ করে ফেললো। শুধু তাই নয়, নিজের প্রয়োজন বাদেও এই অর্থে সে একাধিক অশ্ব ও কিছু অতিরিক্ত অস্ত্রশস্ত্র খরিদ করতে সক্ষম হলো। শহরের বাইরে সাময়িক এক আবাসস্থল খুলে এগুলো সে সেখানে মজুত করতে লাগলো।

অপর পক্ষে একজন সেপাইয়ের জন্যে আনুষ্ঠানিক যে শিক্ষার প্রয়োজন, তা সে এই নকরীতে এসেই হাসিল করে ফেললো। বস্তুতঃ যুদ্ধ বিদ্যায় বখতিয়ার স্বশিক্ষিত

সৈনিক। অনুশীলনটা পারদর্শিতার জন্মদাতা হলে, বখতিয়ার তার এক অনন্য নজীর। রণ–কৌশল সংক্রান্ত সামান্যতম ইশারা–ইঙ্গিত পেলেই সেটাকে সে অনুশীলনের মাধ্যমে এক অব্যর্থ হিকমতে রূপান্তরিত করতো। বাদাউনের সেনাবাহিনীর সাহচর্যে এসে সে এ মওকা ব্যপক ভাবে গ্রহন করতে এবং অবসর কালে কসরতের মাধ্যমে তা রপ্ত করতে লাগলো। অশ্বারোহণের অভ্যাস তার আগে থেকেই ছিল। বাদাউনের ফৌজে এসে ঘোরসোওয়ারীর পারদর্শিতা বখতিয়ারের বাহাদুরীর অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক রূপে পরিপক্ক হলো। বাদাউনে এসে তার পয়লা দিকের দিনগুলো সার্থক ভাবেই কেটে গেল।

তবু বাদাউনের এই নগদ বেতনের চাকরী বখতিয়ারের উম্মিদের–তার চিন্তাভাবনা ও পরিকল্পনার প্রত্যক্ষভাবে পরিপূরক ছিল না। তৎকালে নগদ মাহিনায় সেনা বিভাগে নকরী করা অনেকটা ঠিক কল কারখানায় ফালতু হিসেবে খাটার সামিল ছিল। যে কয়দিন প্রয়োজন, সে কয়দিন ফালতুদের কাজ---নগদ পয়সায় ফাঁই ফরমায়েশ খেটে দেয়া। এদের কোন পরিবর্তন থাকে না। কোন ধাপ–সিঁড়িও প্রায়শঃই এদের সামনে থাকে না সেই কলকারখানার কোন একটা উপর পদে উঠার।

পুরোপুরি না হলেও বখতিয়ারের ব্যাপার ছিল অনেকটা এই কিসিমের। কিছু নিয়মিত ও স্থায়ী সৈন্য ছাড়া বাহিনীর সৈন্য মানে একেবারেই অন্য কথা। আর তা হলো, সম্পদ দিয়ে সৈন্য পোষা। সেনাপতিরা জায়গীরদারী ভোগ করতেন। বিনিময়ে তারা সৈন্য সরবরাহ করতেন। সেনাপতিরাও অধিক ক্ষেত্রে নগদ বেতনের পরিবর্তে জায়গীরের কিয়দংশ সেপাইদের মধ্যে বিলিবন্টন করে দিতেন। সেপাইরা এই সম্পত্তিকে কেন্দ্র করে স্বাধীন ভাবে ঘরসংসার করতো আর মাঝে মাঝে সেনাপতির তলবে প্রশিক্ষণে হাজির হতো। কখনও বা রণক্ষেত্রে। পরিশ্রম লাঘব করার ইরাদায় সেনাপতিরাও সময় সময় এই সেপাইদের অনেককেই ক্ষুদে নেতা তৈরী করে তাদের উপর বাদবাকী সেপাইদের এক একটা ক্ষুদ্র দলের দায়দায়িত্ব ছেড়ে দিতো। বখতিয়ারের দীলে ছিল এমনই একটা ক্ষুদে দায়িত্ব লাভ করার আকাঙ্খা।

বেশ কিছু দিন বাদাউনে অতিবাহিত করার পরও তার এই খাহেশ পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা নিতান্তই ক্ষীণ দেখে সে যখন বাদাউন থেকে পালাই পালাই করছিল, ঠিক এই সময় তাকে একবার আজমীরে আসতে হলো।

সুলতান মোহাম্মদ ঘোরীর প্রতিনিধি ও দিল্লীর অধিকর্তা কুতুব উদ্দীন আইবকের রাজস্ব বিভাগের দপ্তরটা এই সময় সাময়িকভাবে আজমীর শহরে অবস্থিত ছিল। বাদাউনের শাসনকর্তা মালীক হিজবর উদ্দীন রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যাপারে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখা চেয়ে দেওয়ানের দপ্তরে দূত পাঠানোর জরুরত বোধ করলেন। বাদাউনের রাজস্ব

বিভাগের সচিবের উপর এ দায়িত্ব অর্পিত হলো। কিছু মূল্যবান কাগজপত্র ও নজরানা সহকারে সচিব সাহেব এই দৌত্যগিরির কাজে রওনা হওয়ার উদ্দেশ্যে তৈয়ার হয়ে গেলেন। পথে তাঁর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ইরাদায় যে বাহিনী গঠন করা হলো, একজন সেপাই হিসাবে বখতিয়ার খলজীর নাম সেই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

নির্দিষ্ট দিনে রওনা হলেন সচিব সাহেব। তাঁকে পাহারা দিয়ে নিয়ে রক্ষীবাহিনীও বেরিয়ে পড়লো। অধিনায়কের অধীনে পাহারাদার বাহিনীর একজন নগণ্য সেপাই হয়ে বখতিয়ারও বেরিয়ে পড়লো দলের সাথে।

বাদাউন থেকে আজমীর। সুদীর্ঘ ও বিপদসংকুল পথ। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বাদাউনের এই দলটি এই দূর্গম পথ পাড়ি দিতে লাগলো। অশ্বারোহী সকলেই। পথে কোন বালামুসিবত না আসায় দলবল সহকারে বাদাউনের এই দূত যথা সময়ে ও সহিসালামতে আজমীরে এসে হাজির হলো।

আজমীর। এক ঐতিহ্যবাহী শহর। তরাইনের দুস্‌রা রণের দুর্ধর্ষ সালার ও মশহুর দরবেশ খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি (রঃ) হুজুরের আজমীর। বাগানবাগিছা, তোরণ–মিনার ও ফটক–ইমারতে সজ্জিত শহর আজমীর। শুধু রাজস্ব বিভাগের এক দপ্তরই নয়, প্রশাসনের অনেক দপ্তরই অজমীরে তখনও বিদ্যমান। হস্তিশালা, আস্তাবল, জিন্দানখানা দুর্গ ও সেপাইদের ঘাটি আস্তানার সাথে স্বারী–প্রহরী পাইক–পেয়াদা নিয়ে রাজধানীর পাশাপাশি আজমীরও তখন এক হিন্দুস্থানের অন্যতম প্রশাসনিক কেন্দ্র। যদিও প্রশাসনকে দ্রুত গতিতে তখন দিল্লীমুখী করা হচ্ছে, তবু আজমীর তখনও তার অতীত ঐতিহ্য হারায়নি।

রাজস্ব বিভাগের উজির থাকেন দিল্লীতে। মাঝে মধ্যে আজমীরে তিনি পরিদর্শনে আসেন। রাজস্ব বিভাগের সর্বময় কর্তা এখানে দেওয়ান।

বিরাট এক এলাকা জুড়ে দেওয়ান সাহেবের দপ্তর। দপ্তরের পেছনেই দেওয়ান সাহেবের দপ্তর–সংলগ্ন আবাসস্থল।

দপ্তর এবং আবাস স্থল বা মকানের সুউচ্চ ও বৃহদাকার ইমারতগুলির পেছনে সুরক্ষিত বাগান। ফুল ফলের বাগ বাগিচা। ফুল বাগানের পরেই ফল বাগান ও হরেক কিসিমের ছায়াদানকারী বৃক্ষরাজী। এই বাগান–মকান ও দপ্তরের চতুর্দিকে তৃণঢাকা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের পর চতুর্দিকে সুউচ্চ প্রাচীর।

দপ্তরের সামনে এসে প্রাঙ্গণটি অনেক বেশী বিস্তার লাভ করেছে। এই প্রশস্ত প্রাঙ্গণের সন্মুখভাগে ফটক। ফটকের এক পাশে এবং প্রাচীরের ভেতরে প্রাচীরের গা ঘেঁষে ছোট একটা আস্তাবল। পরিদর্শক ও মেহমানদের–অশ্ব রাখার সুবিধার্থে এই আস্তাবল তৈয়ার করা হয়েছে।

বাদাউনের দূত সদলবলে এসে ফটকের কাছে হাজির হতেই দ্বাররক্ষী এসে সালাম দিয়ে দাঁড়ালো। বাদাউনের দূত অর্থাৎ রাজস্ব সচিব বললেন--আমরা বাদউনের মাননীয় শাসনকর্তার পয়গাম নিয়ে এখানে দেওয়ান বাহাদুরের মোলাকাতে এসেছি।

দ্বাররক্ষী সোচ্চার হয়ে উঠলো। তাজিমের সাথে বললো যান হুজুর, যান। উনি দপ্তরেই আছেন।

বাদাউনের দূত অশ্ব থেকে নামলেন। সঙ্গে সঙ্গে দ্বাররক্ষী অশ্বের লাগাম ধরে অশ্বটিকে আস্তবলে নিয়ে চললো। সেপাইদেরও সে অশ্ব নিয়ে আস্তাবলে আসার অনুরোধ জানালো। নজরানা ও কাগজপত্র নিয়ে বাদাউনের রাজস্ব সাচিব দেওয়ান সাহেবের দপ্তরের দিকে ধাবিত হলেন। অশ্বগুলোকে আস্তাবলের সহিসের হাওলায় রেখে অধিনায়ক সহ সেপাইরা অন্য একজন প্রহরীর পথ নির্দেশনায় এসে বিশ্রাম কক্ষে প্রবেশ করলো।

দেওয়ান সাহেব বাদাউনের সচিবকে সসম্মানে গ্রহণ করলেন। সচিব সাহেব কাগজপত্রের সাথে কিছু নজরানা প্রদান করলে দেওয়ান সাহেব জিজ্ঞাসু নেত্রে বললেন–এগুলো কি?

জবাবে সচিব সাহেব স্মিতহাস্যে বললেন–বাদাউনের শাসনকর্তার পক্ষ থেকে জনাবের জন্যে জাররা পরিমাণ নজরানা। দেওয়ান সাহেব নাখোশ হলেন। বললেন দেখুন, অন্যান্য দেওয়ান সাহেবরা কি করতেন জানিনে। কিন্তু এসব আমার না পছন্দ।

সচিব সাহেব কুণ্ঠার সাথে বললেন–যে কাজটার জন্য আমি এসেছি, সেটা খুব জটিল। জনাবের পরিশ্রমের কিছু সন্মানী না দিলে–

দেওয়ান সাহেব হাত তুলে বললেন–এটা আমার কর্তব্য। এ কাজের জন্যেই আমি মাস অন্তর বেতন পাই। নজরানা উপঢৌকন–এগুলো তামামই জনাবে আলার প্রাপ্য, দিল্লীর মালিক হজুরে আলা কুতুবউদ্দীন আইবকের হক। আমাদের জন্যে এগুলো না–জায়েজ।

বাদাউনের দূত এতে অপ্রতিভ হলেন। তা দেখে দেওয়ান সাহেব হেসে বললেন–না, না, আপনার এতে শরমিন্দা হওয়ার কারণ নেই। কিছু অসৎ ইনসানের লালচের জন্যেই এসব ঘৃণ্য রেওয়াজ চালু হয়ে গিয়েছে। এটা গোটা প্রশাসনের বদনসীব।

সচিব ফের কুণ্ঠিত কণ্ঠে বললেন–জনাব।

দেওয়ান সাহেব বললেন– এগুলো আমি রাজকোষে জমা করে নিচ্ছি। আশা করি, এতে আপনাদের না–খোশ হওয়ার কারণ কিছু থাকবে না।

অতঃপর দেওয়ান সাহেব খুব মনোযোগ সহকারে দাখিলকৃত কাগজ পত্রাদি দেখে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন হ্যাঁ– বিষয়টি খুবই জটিল। এর উপযুক্ত ব্যাখ্যা দান সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। আপনাকে দু'একদিন অপেক্ষা করতে হবে।

সচিব বললেন –জি, তাতে কোন অসুবিধা হবেনা।

দেওয়ান বললেন–বহুৎ খুব।

অতঃপর জনৈক কর্মচারীকে ডেকে আগন্তুকদের মেহমানদারীর ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়ে দেওয়ান সাহেব বাদাউনের দূতকে তখনকার মতো বিদেয় করলেন।

সেদিনেরই বিকেল বেলার ঘটনা। বখতিয়ারের অশ্বটি তার নিজের অশ্ব ছিল। আরবদেশের উঠতি বয়সের খুব হৃষ্টপুষ্ট ও তেজী ঘোড়া। বখতিয়ার নিজের হাতে এর যত্ন নেয়। দেখে শুনে না খাওয়ালে আজে বাজে কোন কিছুতেই এ ঘোড়া মুখ দেয় না। সহিসের হাওলায় দিয়ে আসার পর থেকেই বখতিয়ার খলজী অস্বস্তি বোধ করছিলো। সহিসেরা বেতনভুক কর্মচারী। এদের কাজ দায়সারা কাজ। নির্দিষ্ট খড় বিচুলী আর পচা বাসী দানা পানি অশ্বের সামনে ফেলে দেয়া ছাড়া অধিক কিছু করার কোন গরজ এদের নেই।

বিশ্রাম কক্ষে সকলেই আরাম বিরামে ব্যস্ত। বখতিয়ার খলজী বেরিয়ে এলো কক্ষ থেকে। প্রাঙ্গণের ধারে প্রাচীরের গা ঘেঁষে অনেক লকলকে কচি ঘাস লক্ষ্য করেছে বখতিয়ার। তার খাহেশ হলো–নিজে গিয়ে তার ঘোড়াকে সে ঘাসগুলো ধরে ধরে খাওয়াবে।

কিন্তু একি! আস্তাবলে এসে সে তাজ্জব হয়ে দেখলো তামাম ঘোড়াই আছে, কেবল তার ঘোড়াটাই নেই। চমকে উঠলো বখতিয়ার। তবে কি উত্তম জাতের ঘোড়া দেখে অপহরণ করলো কেউ? সহিসটিও আশ পাশে নেই। বখতিয়ার কিছুক্ষণ পর খেয়াল করে দেখলো– যে রশিতে ঘোড়াটা বাঁধা ছিল, সে রশি পচা এবং তা ছেঁড়া। খুঁটির সাথে সে রশির কিছু অংশ লেগে আছে।

বখতিয়ার বুঝলো ঘোড়া তার ছুটে গেছে। কিন্তু প্রশ্ন– ছুটে সে যাবে কোথায়? বেরুবার পথ মাত্র একটিই এবং তা সদর ফটক। দুসরা রাহা নেই। সদর ফটকের পাল্লা দুটো প্রায়শঃই ভিড়িয়ে দেয়া থাকে। একাধিক প্রহরী সে ফটকে পাহারায় মোতায়েন থাকে। সে দিক দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার প্রশ্নই কিছু উঠে না। তবে?

আরো খানিক লক্ষ্য করে বখতিয়ার দেখতে পেলো– আস্তাবলের পেছন দিকে অশ্বপদ চিহ্ন। এ চিহ্ন বরাবর প্রাঙ্গণের মধ্যে ঢুকে গেছে। তৃণ রাজিতে প্রাণ সঞ্চারের ইরাদায় প্রাঙ্গণটাতে মাঝে মাঝে পানি সিঞ্চন করতে হয়। গতকাল শাম ওয়াক্তে এই

সিঞ্চনকর্ম সম্পন্ন করা হয়েছে বলে বখতিয়ারের ধারণা হলো। কারণ প্রাঙ্গণের মাটি তখনও নরম ছিল এবং অশ্বপদ চিহ্ন সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিল।

এই পদ চিহ্ন অনুসরণ করতে করতে বখতিয়ার খলজী একদম দেওয়ান সাহেবের মকানের পেছনে অবস্থিত ফুলবাগানের নিকট গিয়ে হাজির হলো। সে লক্ষ্য করে দেখলো–এখানে এসে পদচিহ্ন হারিয়ে গেছে। আরো দেখলো সামনেই কয়েকটি ফুলের গাছ ভাঙ্গা। বখতিয়ারকে বুঝতে আর তকলিফ পেতে হলো না যে, অশ্বটি তার এই ফুল বাগানে ঢুকেছে।

বখতিয়ারও ঢুকে পড়লো বাগিচায়। কিন্তু বাগিচার অভ্যন্তরে ফুলের গাছের ঝাড়গুলো ফাঁকে ফাঁকে অবস্থিত। জমিনও এখানে শুকনো। ফলে, ফুলের কোন ভাঙ্গা গাছ নজরে আর এলোনা বা ঘোড়ার কোন পায়ের দাগও শুকনো জমিনে ছিলনা। বখতিয়ার এবার ফাঁপড়ে পড়ে গেল। এখন কোন দিকে যায় সে।

একটু ইতস্ততঃ করে সে বাগিচার অনেক খানি ভেতরে ঢুকে গেল এবং এলোপাতাড়ি ঘুরতে লাগলো। ঘুরতে ঘুরতে এক সময় সে ফুলবাগিচার একেবারেই গভীরে চলে এলো। তখন সে ঘোড়ার চিন্তায় পেরেশান। কোথায় সে এসেছে– এসব নিয়ে চিন্তাভাবনার ফুরসত্ তার ছিল না। এই অবস্থায় ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় এসে সে চমকে উঠে দাঁড়িয়ে গেল। তার কয়েক কদম সামনেই শ্বেত পাথরে বাঁধানো এক গোলাকার আঙিনা। অঙ্গিনার চারিদিকে আরাম করে বসার মতো শ্বেত পাথরের আসন। সেই আসন গুলির একটাতে এক নবীনা উপবিষ্টা। পাশে তার এক অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সের আউরাত দণ্ডায়মান। হয়তো সে পরিচারিকা।

বখতিয়ার এসে নবীনার একদম সামনাসামনি থমকে দাঁড়িয়ে গেল। বোরকার ঢাকনা খোলা থাকায় তার মুখটা সে সরাসরি দেখতে পেলো। অতুলনীয়া না হলেও রূপ তার তারিফ পাওয়ার হকদার।

সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটো নামিয়ে নিলো বখতিয়ার। পরিচারিকার সাথে কি জানি কি আলাপ নিয়ে মসগুল ছিলেন তরুণী। এবার তিনি সামনের দিকে চোখ তুলতেই চমকে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে বোরকার ঢাকনা নামিয়ে দিয়ে আতংকের সাথে আওয়াজ দিলেন– কে?

কি জবাব দেবে স্থির করতে না পেরে বখতিয়ার খলজী ইতস্ততঃ করতে লাগলো। পরিচারিকাটি ঘুরে দাঁড়িয়ে বখতিয়ারকে দেখেই– চোর, ডাকু, লুটেরা– বলে ভীত কণ্ঠে চীৎকার করে উঠলো।

অতঃপর উভয়েই ত্রস্তপদে প্রস্থানোদ্যগ করতেই বখতিয়ার খলজী কোনমতে বললো–ভয় পাবেন না। আমি আপনাদের মেহমান। বাদাউন থেকে এসেছি।

কিন্তু বখতিয়ারের এই আশ্বাসে মহিলাদ্বয় আশ্বস্ত হতে পারলেন না। তাঁরা প্রায় দৌড়ের উপর পালিয়ে গেলেন।

হতবুদ্ধি বখতিয়ার ওখানেই কিয়ৎকাল দাঁড়িয়ে থাকার পর ধীরে ধীরে ওখান থেকে সরে এলো এবং ফের তার ঘোড়ার তালাশে মনোনিবেশ করলো। অনেকক্ষণ যাবত আবার এদিক ওদিক তালাশ করে ফুল বাগিচা পেরিয়ে ফল বাগানের বৃক্ষাদির দিকে আসতেই সে দেখতে পেলো– অশ্বটি তার আরাম করে এক বৃক্ষের ধারে সদ্যগজানো কিছু গুল্মলতা কামড়াচ্ছে।

অশ্বটিকে ধরে এনে তখনই অশ্বশালায় না বেঁধে সে অশ্বটিকে ধরে ধরে প্রাচীরের কাছের ঘাসগুলো খাওয়াতে লাগলো।

দেওয়ান সাহেবের মকানে ইতিমধ্যেই হুলস্থুল কান্ড শুরু হয়েছে। বাদাউনের খাটো বেঁটে বসন্তের দাগওয়ালা কে একজন আদমী দেওয়ান সাহেবের ফুল বাগানে ঢুকে তাঁর হেরেমের আউরাতের উপর হামলা করেছে। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে সেপাই পাঠনো হলো। কিন্তু ঘটনাস্থলে তখন কেউ ছিল না। আক্রান্ত মহিলাদ্বয়ের বাচনিক অনুসারে বাদাউনের মেহমানদের মধ্যে সন্ধান চালানো হলো। বাদাউনের দূত ঘটনার কথা শুনে থ মেরে গেলেন। তাঁর রক্ষীবাহিনীর ভেতরেই এমন একজন আছে। বাহিনীর অধিপতিকে তলব করলে তিনি নিশ্চিতভাবে জানালেন–সে আদমী বখতিয়ার। ঘটনার সময় বখতিয়ার বিশ্রাম কক্ষে ছিল না এবং সেই থেকেই সে নেই।

ঘাস খাওয়ানোর পর অশ্বটি আস্তাবলে বেঁধে রেখে বখতিয়ার খলজী বেরিয়ে আসতেই আস্তাবলের সহিসটা ওয়াপস্ এলো। বখতিয়ারকে দেখে সে সোচ্চার কণ্ঠে বললো– আরে আপনি! আপনি এখানে! ওদিকে সবাই আপনার তালাশে হয়রান!

কিছুটা তাজ্জব হয়ে বখতিয়ার খলজী প্রশ্ন করলো– আমার তালাশে! কেন?

ঃ কেন তা আমি কি জানি? আপনি নাকি ফুলবাগানে ঢুকে আমাদের হুজুরের অন্দর মহলের কোন জেনানার উপর হামলা করেছিলেন?

ঃ হামলা!

ঃ তাইতো সবাই বলছেন। বলছেন– সে লোকটি নাকি আপনিই।

ঃ আমি!

ঃ হ্যাঁ তার চেহারা যা বয়ান করা হচ্ছে, তাতো বিলকুল আপনার মতো।

বখতিয়ারের কপালে কুঞ্চন দেখা দিলো। সে আবার প্রশ্ন করলো– কোথায় আমার তালাশ করছে?

ঃ তামাম দিকেই। তবে এখন সবাই দেওয়ান বাহাদুরের দহলিজের দিকে গেলেন।

বখতিয়ার খলজী বুঝলো তাকে নিয়ে একটা মস্তবড় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। শিগগির শিগগির গিয়ে ব্যাপারটা খোলাসা করে না দিলে এ নিয়ে একটা কেলেংকারী ঘটে যাবে। তাই সে জোর কদমে তৎক্ষণাৎ দেওয়ান সাহেবের দহলিজের দিকে রওয়ান হলো। সদর ফটক ঘুরে গেলে রাস্তা অনেক বড় হয়। দেওয়ান সাহেবের মকানের মফঃস্বল দিক দিয়ে একটা বরাবর রাস্তা দেখে সে ফটকের দিকে না গিয়ে এই সোজা রাস্তা ধরলো।

সে জমিনের দিকে নজর রেখেই হাঁটছিলো। দেওয়ান সাহেবের মকানের একদম নযদিকে এসে আনমনে উপরের দিকে নজর তুলতেই সে দেখতে পেলো, এবার সত্যি সত্যিই অতুলনীয় খুবসুরাতের আর এক তরুণী তার একদম চোখের সামনেই দণ্ডায়মান। এ তরুণী বখতিয়ারের সন্নিকট এক দ্বিতল কক্ষের ইমারতের বাইরের দিকের খোলা বারান্দায় আনমনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তার মাথায় কোন আবরণ তখন ছিল না। সরাসরি বখতিয়ারের দিকে মুখ করে তিনি উদাস নেত্রে সামনে চেয়ে কি যেন ভাবছিলেন। নজর তাঁর জমিনের দিকে ছিল না।

বখতিয়ার এই সর্বপ্রথম কোন আউরাতের খুবসুরাতে মোহিত হলো। সে খেয়াল করতে পারলো না, এর আগে কখনও এমন মনোমোহিনী রূপের কোনো আউরাতকে সে দেখেছে। উদ্ভিন্ন যৌবনা এই অপরূপা তরুণী ক্ষণিকের জন্যে বখতিয়ারকে আত্মবিস্মৃত করে দিলো। সে ভুলে গেল স্থান-কাল-পাত্র। ভুলে গেল ভূত, ভবিষ্যৎ বর্তমান। পলকহীন নেত্রে সে দেখতে লাগলো তরুণীকে।

লহমা কয়েক পরেই তরুণীটিও চোখ নামালেন নীচের দিকে। বখতিয়ারকে একদম অতি নিকটে এবং মুখোমুখী চেয়ে থাকতে দেখেই তিনি অস্বাভাবিকভাবে চমকে উঠে বললেন-কে!

চঁমকে উঠলো বখতিয়ার। সে এতক্ষণ খোয়াবের মাঝে বেহুঁশ হয়ে ছিল। ভদ্র মহিলার অতংকজনক উচ্চকণ্ঠের আওয়াজে টুটে গেল খোয়াব তার। সে আবার ফিরে এলো বাস্তব এই দুনিয়ায়। হুঁশ ফিরে আসতেই বখতিয়ার এবার সত্যি সত্যিই থর থর করে কেঁপে উঠলো। একি করলো সে! যে কসুরের জন্যে তাকে তলব দেয়া হয়েছে, সেই কসুরই সে দুস্রাবার স্বইচ্ছায় করে ফেললো। এর আর মাফ নেই। আগেরটাতে সে অবশ্য নির্দোষ ছিল। কিন্তু এবার?

চমকে উঠে বখতিয়ার ধাপ তুলতেই তরুণীটি বারান্দার আরো কেনারে ছুটে এলেন। ছুটে এসে ঐ একই রকম অস্বাভাবিক উচ্চস্বরে তিনি বললেন-একি! এখানে কোথা থেকে- কোনদিক দিয়ে-

বিপুল বেগে কাঁপতে লাগলেন ভদ্রমহিলা। মুখের কথা শেষ করতে পারলেন না। বখতিয়ার আতংকে আর এক বার তরুণীর দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে পায়ের গতি বাড়িয়ে দিলো।

তরুণীটিও চীৎকারের মাত্রা আরো বেশী বাড়িয়ে দিলেন। আওয়াজ দিয়ে বলতে লাগলেন- এই কে কোথায় আছো, আটকাও, ওকে আটকাও-

এ আওয়াজ বখতিয়ারের কানে যেতেই বখতিয়ার পলকের মধ্যেই সেখান থেকে অন্তর্হিত হলো।

অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় বখতিয়ার এসে দেওয়ান সাহেবের দহলিজে প্রবেশ করতেই সকলে হৈ হৈ করে বলে উঠলো- এই এসেছে-এই সেই আদমী!

বাদাউনের দূত তখন দহলিজে ছিলেন না। তিনি ছাড়া বাদাউনের আর সকলেই হাজির ছিলেন। আসামীকে সনাক্ত করার ইরাদায় সবাইকে তাদের ডেকে আনা হয়েছে। বখতিয়ারের হালত দেখে দেওয়ান সাহেব সহকারে উপস্থিত তামাম লোক নিঃসন্দেহ হলেন যে, ঘটনা বিলকুল সত্য। ফুল বাগানে গিয়ে সে সত্যিই ঐ খন্নাসপনা করেছে এবং ধরা পড়ে এখন সে কাঁপতে শুরু করেছে।

বাদাউনের বাহিনীর অধিনায়ক বখতিয়ারকে দেখামাত্র ধমকে উঠলেন। বললেন-কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

নিজেকে সংযত করে নিয়ে বখতিয়ার জবাব দিলো-আমার ঘোড়ার কাছে।

ঃ ঘোড়ার কাছে কেন?

ঃ ঘোড়াটা আস্তাবল থেকে ছুটে গিয়েছিল। ওটাকে ধরে আনতে গিয়েছিলাম।

ঃ তুমি কি করে জানলে, ঘোড়া তোমার ছুটে গিয়েছে আস্তাবল থেকে?

ঃ আগে আমি জানতাম না।

ঃ তবে?

ঃ মানে-আমি-

বখতিয়ারকে ইতস্ততঃ করতে দেখে দেওয়ান বাহদুর সরাসরি প্রশ্ন করলেন-তুমি আমার ফুলবাগানে ঢুকেছিলে?

বখতিয়ার নীচের দিকে নজর রেখে জবাব দিলো-জি।

ঃ কেন সেখানে গিয়েছিলে?

ঃ আমার ঘোড়ার তালাশে।

গর্জে উঠলেন অধিনায়ক। সেপাই হিসাবে বখতিয়ারের অপরিসীম দক্ষতায় এই ব্যক্তির দীলে যারপরনেই হিংসার উদ্রেক হয় এবং বখতিয়ারকে বরাবরই হিংসার

চোখে দেখে। এই কারণেই বখতিয়ার খলজীর উপর তাঁর একটা জাত ক্রোধ ছিল। মওকা পেয়ে তিনি আজ মনের খেদ মিটিয়ে নিতে লাগলেন। ধমক দিয়ে বললেন– মিথ্যাকথা। বিলকুল বানানো গল্প। এ ব্যাটা যে আসলেই একজন খন্নাস আদমী– বজ্জাত লোক তা বাদাউনের তামাম লোকই জানে। সেরেফ কায়দা মতো না পাওয়ার কারণেই এ আজও টিকে আছে। এর চরম ব্যবস্থা এবার অবশ্যই নেয়া হবে।

বখতিয়ার খলজীর শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ প্রবাহ খেলে গেল। অধিনায়কের মুখের দিকে নজর তুলেই আবার নিজেকে সংযত করে নজর তার নামিয়ে নিলো। দেওয়ান সাহেব আবার তাকে প্রশ্ন করলেন– বাগিচার মধ্যে পাথর বাঁধা বসার জায়গা আছে। সেখানে তুমি গিয়েছিলে?

ঃ জি।

ঃ কোন জেনানা ছিল সেখানে?

ঃ জি, ছিলো।

ঃ কয়জন?

ঃ দুই জন।

ঃ তাদের তুমি দেখেও সেখানে গিয়ে হাজির হলে?

এমন সময় দুইজন রক্ষী দহলীজে ছুটে এলো। বখতিয়ারকে দেখেই তারা বলে উঠলো–এই আদমী–এই আদমী।

এরপর তারা দেওয়ান সাহেবের অনুমতি চেয়ে বললো হুজুর, একে কয়েদ করার ইযাযত দিন। এটা একটা বদমায়েশ। দেওয়ান সাহেব বিস্মিত কণ্ঠে বললেন– মানে!

প্রহরীদ্বয়ের একজন বললো– আমাদের সামনে দিয়েই দৌড়ে এলো। অল্পের জন্যে ধরতে পারিনি। এখন দেখছি– এখানে এসে ঢুকেছে।

প্রহরীদের বাচনিক শুনে সকলেই আর একবার তাজ্জব হলো। দেওয়ান সাহেব বললেন–তোমাদের সামনে দিয়ে মানে?

ঃ মানে আপা মণি বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন। এ ব্যাটা আপামণির উপর ওখানে হামলা করতে গিয়েছিল।

দম বন্ধ হলো সকলের। গোস্বায় কাঁপতে কাঁপতে দেওয়ান সাহেব বললেন–সে কি!

প্রহরীটি বললো–জি হুজুর। আপামণি চীৎকার করে একে আটকানোর হুকুম দিতেই আমরা এর পিছু নিয়েছি।

চরম বিস্ময়ে দেওয়ান বাহাদুর বললেন–বলো কি! সে লোকও এই লোক?

ইতিমধ্যেই দহলীজের অন্দরমুখী দরজার পর্দার আড়ালে কয়েকজন মহিলা এসে ভিড় করে দাঁড়ালেন। তাঁদের একজন বললেন– এই সেই লোক! এই লোকই ফুলবাগানে ঢুকেছিলো।

অন্য একজন হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে পর্দার কাছে এসে উঁকি দিয়েই বললেন– আব্বা হুজুর, এই সেই লোক, এই সেই লোক।

সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠলেন অধিনায়ক। বললেন– তবে রে!

অতঃপর তাঁর বাহিনীর অন্যান্য সেপাইদের প্রতি নির্দেশ দিয়ে বললেন– এই দেখছো কি তোমরা? কয়েদ কারো বদমায়েশকে। গাছের সাথে ঝুলিয়ে আজই আমি এ ব্যাটার গায়ের চামড়া তুলে ফেলবো।

পর্দার আড়াল থেকে সঙ্গে সঙ্গে মহিলা কণ্ঠের হুংকার এলো–খামোশ! আর একবার ওঁর প্রতি এমন অসম্মানজনক কথা বললে এই দহলীজ থেকে আপনি বেরুবার ফুরসুৎ পাবেন না

বলেই তিনি আওয়াজ দিলেন– কাশেম আলী–

আগত প্রহরীদ্বয়ের একজন পড়িমরি জবাব দিলো–

হুজুরাইন–

ঃ আমাদের সেপাইদের এখনই দহলীজের বারান্দায় মোতায়েন করো–

গোস্বায় মহিলাটি কাঁপতে লাগলেন। দহলীজের সকলেই গোলক ধাঁধায় পড়ে গেলেন। দেওয়ান সাহেব বললেন– সে কি মা দিলারা! তুমি এ কথা বলছো কেন?

আপ্লুত কণ্ঠে দিলারা বানু বললেন– বখতিয়ার আব্বা হুজুর, এই সেই মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার

ঃ মানে!

ঃ গরমশিরের সেই দরাজদীল বখতিয়ার।

ঃ যিনি তোমার জান হেফাজত করেছিলেন?

ঃ হ্যাঁ আব্বা হুজুর, হ্যাঁ। জব্বোর ইমানদার লোক। ভাবী সাহেবার অভিযোগ যে এর বিরুদ্ধে, তা আমি জানতাম না। ভাবী সাহেবা ভুল করেছেন।

ঃ মা মণি!

ঃখন্নাস তো দূরের কথা, এমন সৎ আখলাকের ইনসান এ দুনিয়ায় অধিক নেই। বারান্দায় দাঁড়িয়ে একে দেখেই আমি পয়চান করতে পেরেছি আর সেই থেকেই একে আটকানোর জন্যে আমি দৌড়াদৌড়ি করছি।

ঃ বলো কি!

ঃ ইনি যে সত্যিই একজন বড় মনের মানুষ, ভাইজানও তা জানেন।

ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ, ফরমান আলী তা বলেছে। তার মুখে শুনেছি এ খুব বড় কলিজার ইনসান।

ঃ আমি জানি না উনি ফুল বাগানে গিয়েছিলেন কিনা। যদি উনি যেয়েই থাকেন তাহলে উনাকে জিজ্ঞাসা করলেই উনি তা স্বীকার করবেন। মিথ্যা বলার মানসিকতা এসব লোকের থাকে না। আর আমি এও বিশ্বাস করি, ঐ ফুল বাগানে যাওয়ার উদ্দেশ্য তাঁর অবশ্যই অন্য কিছু, এত খারাপ হতে পারে না।

ঃ দিলারা!

ঃ খামাখা একটা ভ্রান্তির উপরে হৈ চৈ করছেন আপনারা।

দিলারার পাশে দাঁড়ানো এক মহিলা বললেন–তাহলে তাই হবে। উনিতো খারাপ কিছু বলেননি বা বেয়াদপীও কিছু করেন নি। আমরা খামাখাই ভয় পেয়েছি।

দেওয়ান সাহেবের মুখমন্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। তিনি খোশ দীলে স্বগতোক্তি করলেন–সোবাহান আল্লাহ–

এরপর দেওয়ান সাহেব তড়িঘড়ি উঠে গিয়ে বখতিয়ারের সাথে মোসাফেহা করে তাকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলেন এবং সস্নেহে বললেন–আমাদের মাফ করে দাও বাবা, আমরা না চিনে না বুঝে তোমার প্রতি বড় বেইনসাফি করে ফেলেছি।

বলতে বলতে তিনি বখতিয়ারকে টেনে এনে তাঁর পাশের আসনে বসালেন। অধিনায়কটির মুখ তখন ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তাঁর প্রতি নাখোশ নজরে চেয়ে দেওয়ান সাহেব গম্ভীর কণ্ঠে বললেন– আপনারা এখন যেতে পারেন।

এটুকু বলেই চোখ দুটি সরিয়ে নিলেন দেওয়ান সাহেব। ফিরেও আর তাদের দিকে চাইলেননা।

কাঁপতে কাঁপতে অধিনায়কটি নতশিরে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর দীলে তখন একটা মাত্রই চিন্তা–দেওয়ান বাহাদুর তাঁর উপর নাখোশ হয়েছেন–এ খবরের জাররা মাত্র বাদাউনে পৌঁছলে বাদাউনের শাসনকর্তা মালীক হিজবর উদ্দীন তাঁর মাথা নেয়ার হুকুম দেবেন।

দেওয়ান জান মোহাম্মদ সাহেব তার এই মা–মরা মেয়ে দিলারাকে জান দিয়ে পেয়ার করতেন। এই মেয়েকে খুশী করতে এ হেন প্রচেষ্টা নেই যা করতে তিনি নারাজ। দিলারার মুখ মলিন হলে দেওয়ান সাহেবের আহার নিদ্রা, আরাম –বিরাম বিস্বাদ হয়ে যায়। সেই মেয়ের জান বাঁচানো লোক এই বখতিয়ার। আর শুধুই কি জান বাঁচানো! নিজের জান বাজী রেখে জান বাঁচানো। সুতরাং কিভাবে এই বখতিয়ারকে খাতির করবেন দেওয়ান সাহেব, তা ভেবে তিনি অধীর হয়ে পড়লেন।

পাশে বসিয়ে প্রাথমিক কিছু কথাবার্তার পরই তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন এবং বখতিয়ারকে বললেন– এখন আর কথা নয়। বহুৎ ধকল গেছে তোমার উপর। এখন আহার–নিদ্রা–আরাম–বিরাম।

এরপর তিনি দাস দাসীদেরকে ডেকে বললেন–বখতিয়ার আমাদের মেহমান। গজনীতেই এই মেহমানাদারী করার মওকা এ আমাদের দেবে, এই ধারণাই ছিল। সে মওকা যখন আজমীরে এসে পেলাম, তাই বা মন্দকি! বখতিয়ার এখানে বেশ কয়েকদিন আমাদের মকানে থাকবে। একটা ভাল কামরা দেখে বখতিয়ারের থাকার ব্যবস্থা করে দাও।

একটু থেমেই ফের তিনি দাস দাসীদের বললেন–কিন্তু হুঁশিয়ার, বখতিয়ার আমাদের অত্যন্ত পেয়ারের মেহমান। তার যেন কোন প্রকার অসম্মান বা অতদবির না হয়।

অতঃপর তিনি বখতিয়ারকে বললেন–যাও বাবা, এদের সাথে যাও। ফরমান আলী দিল্লীতে। ও মকানে থাকলে ওই তোমাকে নিয়ে যেতো।

বখতিয়ারকে সঙ্গে নিয়ে দাস দাসী বিদেয় হতেই দেওয়ান সাহেব দিলারাকে ডেকে বললেন–তোমার আম্মা থাকলে তোমাকে বলতে হতো না। দাসদাসীদের উপরই বিলকুল ছেড়ে না দিয়ে নিজে তুমি বখতিয়ারের তয়–তদবিরের দিকে হামেশাই নজর রাখবে। যত বড় উপকার সে করেছে, তাতে দুদিনের মেহমানদারী করে সেই ঋণের বোঝা কিছুটা হালকা করার মধ্যে যেন গলতি কিছু না থাকে। বউমাকেও আমার এই ইচ্ছের কথা জানিয়ে দাও।

বেলা তখন ডুবে গেছে। একটু পরেই মাগরিবের আযান শুরু হবে। বিশ্রাম কক্ষে রক্ষিত পোষাক আদি আনিয়ে নিয়ে বখতিয়ার খলজী অজু করে বসলো। দাস দাসীদের পছন্দ নাকচ করে দেওয়ান সাহেবের মকানের যে কক্ষে দিলারা তার থাকার জায়গা করে দিলো, সেটা একটা বাস্তবিকই আরামদায়ক কক্ষ। দক্ষিণ পূর্বে খোলা প্রাঙ্গণ। অন্দরের সাথে সংলগ্ন অথচ একেবারেই পৃথক এই কামরাটি বেশ নিরিবিলি। আলো বাতাসের অকৃপণ পরশে এ কামরা বড় ঐশ্বর্য শালী। কামরাটির দুইদিকে দুই দরজা, বর্হিমুখী, অন্দরমুখী। অন্দরমুখী দরজার পরেই পৃথক পৃথক দুই কক্ষের দুই দেয়ালের মাঝ দিয়ে সরুপথ অন্দর মহলের সাথে কামরাটিকে সংযুক্ত করেছে। এই পথেই অন্দর মহলের মেয়ে পুরুষ এই কামরায় যাওয়া আসা করেন।

নামাজ পড়ে উঠে বসতেই নাস্তার আনযাম নিয়ে দাসদাসীরা হাজির হলো। পানাহারের পর দাস দাসীরা বিদেয় হতেই অন্দর মুখী দুয়ারের পর্দার আড়াল থেকে একটা মিষ্টি কণ্ঠের আওয়াজ এলো– আসতে পারি!

চমকে উঠলো বখতিয়ার। এ কণ্ঠ দিলারার। অপ্রতিভ মুহূর্তে দিলারা বানুর অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বর অনুধাবন করতে না পারলেও এ কণ্ঠস্বর পয়চান করতে বখতিয়ারের আদৌ সময় লাগলো না। অনুপম খুবসুরাতের সেই অদ্বিতীয়া তরুণীটিই দিলারা, এটা জানার পর থেকেই বিহবল বখতিয়ার নিজের অস্তিত্বটাই অনেকটা হারিয়ে বসে ছিল। অর্ধ ঘুম অর্ধ জাগরণ অবস্থা 'হুঁ' 'হাঁ' 'না' দিয়ে প্রয়োজনীয় জবাব গুলি কোনমতে সম্পন্ন করে গেলেও সেই থেকেই সে প্রকৃতিস্থ ছিল না। এখানে এসে সে সাক্ষাত পাবে দিলারার, আর এমন এক আজব ঘটনার মধ্যে দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে এসে এই অবস্থায় পড়বে সে-এটা তার কল্পনাতেও এখন তক আসছেনা। তামাম কিছু এখনও তার কাছে এক খোয়াব।

এই মুহূর্তে দিলারার এই ডাক ফের নিশির ডাকের মতোই চমকিয়ে দিলো বখতিয়ারকে। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেওয়ার হুঁশটাও তার রইলো না। সে ধড় মড় করে উঠে সোজা হয়ে বসতেই বোরকা-ঢাকা দিলারা বানু কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করলো।

বখতিয়ার থেকে দূরে একটা কুরসী টেনে বসেই তিনি প্রশ্ন করলেন-কে আমি তা পয়চান করতে পারেন?

আবার সেই বিহ্বলতা। দিলারা এসে নির্জন কক্ষে সামনা--সামনি বসবে তার-এত বেশী আশা কি ক'রে করে সে! শুধু শক্ত দীলের বেপরোয়া মানুষ বলেই উচ্ছ্বাসের আধিক্যে সে হাস্যস্পদ করে ফেলেনি নিজেকে। দিলারা বানুর প্রশ্নের জবাবে বখতিয়ার খলজী স্মিতহাস্যে বললো-জি, পারি।

ঃ কে আমি?

ঃ আমার একান্ত হিতাকাঙ্ক্ষীনী দিলারা বানু বেগম।

দিলারার মুখেও হাসি ফুটে উঠলো। তিনি বললেন-তখন যে বড় চিনতে চাইলেন না আমাকে?

ঃ কখন?

ঃ যখন আপনার চোখের উপর খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলাম? আপনি তো আমায় সামনাসামনি দেখলেন।

বখতিয়ার ঐ একই রকম স্মিতহাস্যে বললো-তা দেখলেও আমি কেমন করে চিনবো বলুন? আপনার চেহারা তো আগে কখনো দেখিনি!

দিলারার খেয়াল হলো। ব্যাপারটাতো ঠিকই তাই। চেহারা দেখে বখতিয়ার তাকে চেনার কথা নয়। একটু থেমে আবার বললেন-আমার চেহারা তো আগে সত্যিই দেখেননি, কিন্তু এখন তো দেখলেন?

ঃ এখন মানে?

ঃ মানে ঐ খোলা বারান্দায়?

ঃ জি-হ্যাঁ।

ঃ কেমন দেখলেন?

ঃ কি?

ঃ আমার চেহারা! একেবারে যাচ্ছেতাই-তাই নয়?

দিলারা তখন বোরকার মধ্যে মুখটিপে হাসছেন। হাসতে হাসতে মুখটা তিনি অল্প একটু ঘুরিয়ে নিলেন। বখতিয়ার তবু এর মধ্যে জবাব দিতে পারলো না। সেও একটু থামলো। তারপর সে ধীরে ধীরে বললো-দেখুন, আপনারা আমাকে মেহেরবানী করে মেহমান করে নিয়েছেন। আমার সাথে কি মোজাক করা ঠিক আপনার?

দিলারা বানু হচ্‌কচিয়ে গেলেন। একেবারেই ভিন্নতর জবাব। একটু বিস্মিত কণ্ঠে বললেন-মানে!

ঃ আপনার চেহারা ভাল না মন্দ, এটা আমার মুখে শুনতে চাওয়া হয়তো আপনার ঠিক নয়।

ঃ তাই?

ঃ আপনাকে আমি অত্যন্ত সদাশয়া আর আমার প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল বলেই জানতাম। কিন্তু আপনার রূপটাও যে এত অধিক উমদা আর এতবেশী আকর্ষণীয়-এটা আগে জানলে-আমি বরাবরই দূরে রাখতাম নিজেকে।

এবার খানিকটা শব্দ করেই হেসে ফেললেন দিলারা বানু। বললেন-কাছে রাখলেন কখন যে দূরে রাখতে চাইছেন?

ঃ না-মানে আপনার প্রসঙ্গটা যথা সম্ভব ঝেড়ে ফেলতাম দীল থেকে।

ঃ হেতু?

ঃ ময়ূরের আশেপাশে দাঁড় কাকের ঘোরাফেরা অনেকটা বেলেল্লাপনা। ওটা আমার একদম না-পছন্দ।

ঃ সর্বনাশ! এত বেশী চিন্তা করেন আপনি?

বখতিয়ার খলজী ক্লিষ্ট হাসি হাসলো। বললো-অস্তিত্বের লড়াইয়ের তীক্ষ্ণতম ফলার সামনে হরদম যাদের সিনা পেতে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, তাদের চিন্তাশক্তি কমজোর হলে চলবে কেন?

ক্ষণিকের জন্যে নীরব হলেন দিলারা বানু। এ কথার কোন সদুত্তর তিনি তালাশ করে পেলেন না। একটু থেমে বললেন-আপনি শুধু অদ্বিতীয়ই নন, বড় অদ্ভুতও!

ঃ মানে?

ঃ দীল আর দেহ-দুটোই এত বেশী তেজী-এমনটি কদাচিত দেখা যায়।

ঃ আপনি আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন!

ঃ কি দিচ্ছি জানিনে। তবে আপনি বড় ভাবিয়ে তুলেছেন আমাকে।

ঃ জি?

ঃ আপনি গজনীতে গিয়েছিলেন?

ঃ জি। আপনাদের চলে আসার কয়দিন পরেই গিয়েছিলাম।

ঃ কিছু হয়নি?

বখতিয়ার হেসে বললো–হবে না কেন? আরিজের দপ্তরে গিয়ে জিন্দেগীর তিক্ত অভিজ্ঞতা আমার আরো খানিক বেড়েছে।

ক্ষীণ একটা নিঃশ্বাস ফেলে দিলারা বানু বললেন–এমনটি যে হবে, এ ভয় আমার ছিল। তা যাক, আমার খত আপনি পেয়েছিলেন?

ঃ হ্যাঁ পেয়েছিলাম। আর ঐ মুহূর্তে ওটাই ছিল আমার মস্তবড় সান্ত্বনা।

ঃ পেয়েছিলেন? আল হামদুলিল্লাহ! আমি তো ভেবে রেখেছি ওটা আপনার হাতে পড়বেনা।

ঃ না, পড়েছিল। মাঝে মাঝে কিছু অদ্ভুত খোশনসীব আমারও হয়।

ঃ ঐ খত পাওয়ার পরই বুঝি হিন্দুস্থানে এসেছেন?

ঃ হ্যাঁ, কয়দিন পরই।

ঃ ওটা না পেলে এখানে হয়তো আসতেনই না আপনি। তাই না?

ঃ না ঠিক তা নয়। হয়তো আমি আসতামই। তবে আপনার খত ওটা তরান্বিত করেছে।

ঃ আসতেনই আপনি?

ঃ হ্যাঁ, আসতামই। জিন্দেগীর লড়াইয়ে জিততেই হবে আমাকে। অস্তিত্বের লড়াইয়ে শুধু টিকে থাকাটাই নয়, বিশেষ এক নিশানা হয়ে টিকতে আমাকে হবেই। আর হিন্দুস্থানের চেয়ে তার বেহতর ময়দান নজরে আমার আজও নেই।

সেরেফ তার খত পেয়েই বখতিয়ার এখানে এলে দিলারা বানু অধিক খুশী হতেন। ওদিকে আবার বখতিয়ারের সংকল্পের কথা শুনেও বুকটা তার ফুলে উঠলো। লোকটা একদম নিঃস্ব। কিন্তু কারো কোন দান সে কিছুতেই কবুল করবেনা। সোনাদানাও নয়। এই নির্লোভ লোকটার চরিত্রের বৈচিত্র দিলারা বানুর বিস্ময়ের বিপুল ভাণ্ডার পয়লা দিন থেকেই একটানা ভর্তি করতে লাগলো। জাররা ক্ষোভ আর জিয়াদা গর্বের এক মিশ্রিত অনুভূতি নিয়ে দিরারা বানু বললেন–সাব্বাস। তা এসেই বুঝি সরাসরি বাদাউনে চলে গেলেন?

ঃ না। দিল্লীতেই পয়লা আসি। ওখানে আমি আপনাদের অনেক তালাশ করেছি। কিন্তু–

দিলারা বানুর কণ্ঠস্বর ভারী হলো। বললেন–হ্যাঁ, স্বাভাবিকভাবে ওখানেই আমাদের থাকার কথা। কিন্তু কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। আমাদের কি করার আছে বলুন!

ঃ হ্যাঁ–তাই। তবে–

ঃ কি?

ঃ হঠাৎ সেনা বিভাগ থেকে আপনার আব্বাকে এই শাসন বিভাগে পার করে আনার পেছনে যুক্তিটা কি ছিল? মানে আপনার আব্বাকে–

ঃ শুধু আব্বাকেই নয়, ভাইজানকেও।

ঃ জি?

ঃ আমার ভাইজানকেও সেনা বিভাগ থেকে শাসন বিভাগে পার করে আনা হয়েছে।

ঃ কারণটা কি?

ঃ সবই আমাদের নসীব! আমরা কিছু বেইমানের বদমতলবের শিকার হলাম। তারা শাহানশাহকে বুঝালো–গজনীর সাবেক সুলতানের বংশধরের প্রতি আব্বা আর ভাইজান খুব অনুরক্ত! ব্যস্! আর যায় কোথায়? আমার আব্বা আর ভাইজানের মদদে তারা তাদের হৃত মসনদ পুনরুদ্ধারের কোশেশ করতে পারে ভয়ে সুলতান শুধু সেনাবিভাগ থেকে আব্বাদের সরিয়ে নিয়েই নিশ্চিন্ত হলেন না, এই হিন্দুস্থানে স্থানান্তরিত করলেন।

ঃ গজনীর বর্তমান আরিজের তাহলে–

ঃ হ্যাঁ, খুবই স্বাভাবিক।

ঃ তাঁরও হাত ছিল এখানে?

ঃ থাকবে না? পদের লালচ কার না থাকে? বিশেষ করে, সে পদ যদি এমন দুষ্প্রাপ্য পদ হয়।

ঃ হুঁ!

ক্ষুদ্র একটা নিঃশ্বাস ফেলে বখতিয়ার ফের প্রশ্ন করলো–আপনার ভাইজান এখন দিল্লীতে?

ঃ দিল্লীতে। এতদিন এই আজমীরে রাজস্ব বিভাগেই ছিলেন। কয়দিন আগে দিল্লীর মাননীয় শাসনকর্তা ভাইজানকে শাহী দরবারের সহকারী করে দিল্লীতে টেনে নিয়েছেন।

ঃ ওখানে উনি একাই থাকেন?

ঃ হ্যাঁ, আপাততঃ একাই। তবে অল্পদিনের মধ্যেই ভাবী সাহেবাও যাবেন ওখানে।

ঃ ভাবী সাহেবা মানে ঐ–

দিলারা বানু হেসে ফেললেন। বললেন–হ্যাঁ–হ্যাঁ, ঐ উনি যিনি আপনাকে আসামী বানানোর বরকতে আপনার সন্ধান পেলাম আমরা।

বখতিয়ারও হেসে উঠলো। হাসতে হাসতে বললো–তা অবশ্য ঠিক। নইলে কোনদিক দিয়ে এসে ফের কোনদিক চলে যেতাম, কারো সাথে কারো মোলাকাতই হতোনা।

ঃ আল্লাহতায়ালা মেহেরবান। উনি আমার ডাক শুনেছেন।

ঃ ডাক শুনেছেন মানে?

বখতিয়ারের দীলে কিঞ্চিৎ পুলক। বোরকার আড়ালে দিলারার মুখে ঈষৎ হাসি। দিলারা বানু জবাব দিতে বললেন–যিনি আমার জান বাঁচালেন তাঁর সাথে জিন্দেগীতে আর মোলাকাতই হবেনা, এটা কি কম তকলিফের কথা? যাকে ডাকলে তামাম তকলিফ লাঘব হয় তাকেই আমি দীল দিয়ে ডেকেছি।

বখতিয়ার এবার কপট গাম্ভীর্যে বললো–এটা আমাকে না শুনানই ভাল, বুঝলেন?

ঃ কেন?

ঃ এতে কাঙ্গালের লোভ বেড়ে যায়।

দিলারার কণ্ঠ শক্ত হলো। বললো–তা গেলেও দোষ দেবো না।

ঃ দোষ দেবেন না!

ঃ কেন দেবো? আজীবন তামাম লোভ সম্বরণ করে কাঙ্গালকে চলতে হয়। তাদের দীলে কালে–ভদ্রে এক আধটা লোভ পয়দা হলে, তা দোষের বলবো কেন? প্রয়োজনে সে লোভ সম্বরণ করার হিম্মতও কাঙ্গাল–গরীবের থাকে। কিন্তু যাদের লোভ হরওয়াক্ত একটানা পূরণ হতেই আছে, একটা লোভ সম্বরণ করার প্রশ্নেও মাথা যাদের বিগড়ে যায়, তাদের লোভ দেখলেই আমার ঘৃণা হয়। ওদের ঐ প্রবৃত্তি আমার অসহ্য।

এমন সময় পর্দার আড়ালে এক বাঁদী এসে দাঁড়ালো। সে বললো–আপামণি, সাহেবজাদা আরমান খাঁ তসরীফ এনেছেন।

সঙ্গে সঙ্গে দিলারা ফের বললেন–অসহ্য!

বাঁদী বললো–জি?

ঃ গতকালই গেলেন উনি, আবার কেন?

ঃ তাতো আমি জানিনে আপা।

ঃ কোথায় উনি?

ঃ হুজুরের সাথে আলাপ করছেন। হুজুর বললেন, সাহেব জাদার থাকার ব্যবস্থা করে দাও।

ঃ ঐ যে উত্তর দিকের কক্ষগুলো ফাঁকা আছে, ওটার একটা দাও গে।

ঃ সাহেবজাদা আকারে–ইঙ্গিতে এই কক্ষে আসার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন।

দিলারার চোখ জ্বলে উঠলো। বললেন– মেহমানের কোন ইচ্ছে নেই। মেজবান যেখানে রাখবে সেখানেই তাকে থাকতে হবে। যাও–আমি আসছি।

বাঁদীটা বিদেয় হতেই বখতিয়ার প্রশ্ন করলো–কে এই আরমান খাঁ সাহেব?

দিলারাবানু নাখোশ কণ্ঠে বললেন–মাননীয় রাজস্ব উজিরের আওলাদ। খাশ মন্ত্রীপুত্র।

ঃ মানে– আপনাদের উপরওয়ালা?

দিলারা বানু ক্লিষ্ট হাসি হাসলেন। বললেন–বর্তমান প্রশাসনে কে যে কখন কার উপরওয়ালা, তা ঐ একমাত্র উপরওয়ালাই বলতে পারেন। একটা মুলুকের রাজস্ব বিভাগের দেওয়ান–ই–আলা কোন উজিরের চেয়ে খাটো নন। তবু যখন উজির ওঁরা, তখন উপরওয়ালা বৈ কি?

দিলারা বানু উঠে দাঁড়ালেন। তা দেখে বখতিয়ার খলজী বললো দেখুন, এই কক্ষই যখন চান উনি, তখন আমাকে যে কোন কক্ষে পার করে দিন, আমার কোন অসুবিধে হবেনা।

বিদ্যুৎবেগে ঘুরে দাঁড়ালেন দিলারা বানু। বললেন–আমার অসুবিধা হবে!

ঃ আপনার!

ঃ বেয়াদপকে আস্কারা দেয়া আমার সহ্যের বাইরে।

ঃ তবু–

ঃ আমার মেহমানের অবমাননা এ মকানে আমি থাকতে হবে না।

ঃ মানে!

দিলারা বানুর কণ্ঠস্বর ইস্পাতের মতো শক্ত হলো। বললেন–মানে, দুনিয়াটা নড়তে পারে, তবু আমার মেহমান আমার দেয়া কক্ষ থেকে এক চুল নড়বে না।

দুম দাম পদক্ষেপে বেরিয়ে গেলেন দিলারা বানু।

আরমান খাঁর থাকার ব্যবস্থা ভিন্ন কক্ষেই হলো। মনে মনে নাখোশ হলেও, দিলারার মনোরঞ্জনে আরমানখাঁ অদৃশ্যবর্তিনী দিলারাকে শুনিয়ে শুনিয়ে দাসী বাঁদীদের উদ্দেশ্যে বললেন– আরে, তোমরা এত ব্যস্ত হচ্ছো কেন? তোমাদের হুজুরাইন আমার

জন্যে যে কামরা পছন্দ করেন, সেই কামরাই আমারও পছন্দ। কারণ, তাঁর পছন্দ আর আমার পছন্দ পৃথক কিছু তো নয়।

বান্দা বাঁদী এ বক্তব্যে কে কি বুঝলো, সেটা তারাই ভাল জানে। দিলারা বানু এটা শুনে বিদ্রূপের হাসি হাসলেন।

তামাম রাত মেহনত করার পর, পরের দিন সকালে দেওয়ান সাহেব বাদাউনের দূতকে প্রার্থিত ব্যাখ্যাসহ কাগজপত্রাদি ফিরিয়ে দিয়ে বললেন-আপনারা সকলেই এবার চলে যান। বখতিয়ার একসময় আমার এক মস্ত উপকার করেছে। ও কয়েকদিন আমার এখানে থাকবে। ও আমার মেহমান।

বখতিয়ারের মতো একটা মামুলী সেপাইয়ের এই খোশকিসমতি দেখে বাদাউনের দূতের দীলে কিছুটা ঈর্ষা পয়দা হলো। তবু দীলের বেদনা দীলে চেপে হাসি মুখে জি আচ্ছা-জি আচ্ছা বলে বাদাউনের দূত সদল বলে বাদাউনে ওয়াপস্ গেলেন।

উজিরজাদা আরমান খাঁ দিলারা বানুর পাণি প্রার্থী। আনুষ্ঠানিকভাবে এ প্রস্তাব উপস্থাপিত না হলেও, উজিরজাদার আচরণে এটা অনেকটা জানাজানি হয়ে গেছে। একে উপরওয়ালার আওলাদ, তার উপর হবু জামাই। এর উপর আর কথা আছে? আরমান খাঁর আধিপত্য আর সম্মান যে এ মকানে সর্বাধিক-এ সম্বন্ধে আরমান খাঁ নিঃসন্দেহ।

সেই আরমনা খাঁ খাহেশ প্রকাশ করেও যে কামরাটি পেলেন না, সে কামরা দখলকারী ব্যক্তিটি হয়তো আরো জবোরদস্ত কে-না-কে ভেবে খাঁ সাহেবের সারারাত ঘুমটা খুব ভাল হয়নি। দাসী-বাঁদী চাকর-নফর কেউ তাঁকে বখতিয়ারের ব্যাপারে কোন সুস্পষ্ট ধারণা দিতে পারেনি। পরের দিন সবেরাতেই বখতিয়ারের পদ-পদবীর খবর নিয়ে হেসেই ফেললেন খাঁ সাহেব। খাঁ সাহেবের বুকটা বড় হাল্কা হলো। এমন একটা তুচ্ছ লোককে নিয়ে এতটা পেরেশান হয়ে পড়ায়, নিজেকে তিনি নিজেই ধিক্কার দিতে লাগলেন।

এরপর আরমান খাঁর দীলে বখতিয়ারের প্রতি একটা উপেক্ষাজাত করুণার উদ্রেক হলো। কাঙ্গাল মিস্কীন আদমী দৌলতমান্দের নেক-নজরে পড়ে একটু আদরযত্ন ভোগ করছে করুক, এতে আপত্তি করার কি আছে। তবে আদরযত্নের মাত্রাটা বড় দৃষ্টিকটু-এই যা!

এ নিয়ে একবার কথাও তুললেন আরমান খাঁ। কথাটা কেউ গায়ে না মাখায়, খাঁ সাহেবও মাথা ঘামাতে গেলেন না। মামুলী এক সেপাই। ফেউয়ের ছা বাঘের বনে লুক্কীবাজী খেলছে, খানিক খেলুক। যথা সময়ে ছিটকে পড়তে হবেই তাকে।

এমনই এক অনুভূতির জাবর কেটে উজির তনয় দিন দুইয়েক এ মকানে থাকলেন। কিন্তু আতিথেয়তার মধ্যে তেমন কোন উষ্ণতা না থাকায় আর দিলারা বানুর তিল পরিমাণ সাড়াশব্দ না পাওয়ায় খাঁ সাহেবের দিনগুলো বড় একঘেঁয়ে হয়ে উঠলো। এই একঘেয়েমীর জের অধিক কাল টানার তাকত্ না থাকায়, লাচার খাঁ সাহেব এবারের মতো আপ্‌সে-আপ নিজ মকানে ওয়াপস্ গেলেন।

দৌলতমান্দের মেহমানদারী মৌজ করে উপভোগ করার মানুষ বখতিয়ার খলজী নয়। দিলারা বানুর আন্তরিকতা যত উষ্ণই হোক, বখতিয়ারের সামনে আছে দুর্বার এক সংগ্রাম। অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার প্রচন্ড লড়াই। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সম্মুখে ফেলে রেখে বখতিয়ার খলজীর মতো এক জানবাজ ও প্রতিশ্রুতিশীল নওজোয়ানের দীলে বর্তমানের আরাম আয়েশ কোন তৃপ্তিরস সিঞ্চন করতে পারে না।

দিন কয়েক পরই বখতিয়ারও বিদায়কল্পে সোচ্চার হয়ে উঠলো। দেওয়ান জান মোহাম্মদ সাহেব তাকে রাজস্ব বিভাগে বেশ একটা ভালপদে বহাল করার প্রস্তাব দিলেন। প্রশাসনের অন্য যে কোন শাখায় তার পছন্দ মতো নকরীর জন্যে সুপারিশ করার আশ্বাস দিলেন। কিন্তু বখতিয়ার খলজী বেপরোয়া। কোন ধরা বাঁধা গতানুগতিক জীবন প্রবাহে সে আটকে থাকতে নারাজ। সেনা বিভাগে বেতন ভোগী জীবনও আর তার কাম্য নয়। সে বিনীতভাবে জানালো, জিন্দেগীতে তার একটা আলাদা ইরাদা আছে। সে ইরাদা একদীলে হাসিল করা ছাড়া দুস্‌রা কোন দিকেই আর নজর দেয়ার ফুরসৎ নেই তার। এমনকি বাদাউনের এই বন্ধনও সে ছেদ করবে অচিরেই। কোথাও শেকল পড়ে আটকে থাকা তার পক্ষে কষ্টকর।

সব কথাই সে বললো, কিন্তু তার সেই ইরাদাটা কি, সে তার নানান কথার ফাঁকে সুকৌশলে এড়িয়ে গেল। দেওয়ান সাহেব সওয়াল করেও সে ইরাদার স্বরূপ কিছু নিরূপন করতে পারলেন না। তিনি শুধু বুঝলেন-বচপনকাল থেকেই এ একটা দায়মুক্ত ভবঘুরে মানুষ। দুনিয়ার এই মুক্তাঙ্গনে আজাদ হয়েই থাকতে চায়। বাঁধা পড়তে চায়না।

সেই সাথে আরো তিনি বুঝলেন-নওজোয়ানটি বাস্তবিকই বড় কলিজার মানুষ। দীল তার পরিষ্কার। স্বাভাবিক লোভ-লালচের অনেক সে উর্ধ্বে!

কিন্তু দিলারাকে তার এই ইরাদার ব্যাপারে সে এত সহজে এড়িয়ে যেতে পারলো না। দিলারার পত্রেরই উদ্ধৃতি দিয়ে তাকে ব্যাখ্যা দিতে হলো যে, অসাধ্য সাধন না হলেও একটা বড় কিছু করার উম্মিদ তার বচপনকালের উম্মিদ এবং কওমের দস্তানে একটা নয়া কিছু সংযোজনের খাহেশ তার আজন্মের খাহেশ।

বখতিয়ার একটা বড় কিছু করুক বা একটা বড় কিছু হোক, এ খাহেশ দিলারারও। নিশ্চিত জিন্দেগীর হেফাজতী ফেলে অনিশ্চিতের অন্ধকারে বখতিয়ারকে

যেতে দেখে দীল তাঁর যতটাই শংকা গ্রস্ত হোক, দিলারারও আকাঙ্খা–পারলে বখতিয়ার একটা এমন কিছু করুক যা দেখে আর পাঁচজন চমৎকৃত হয়।

ফলে, দিলারা তাকে এ ব্যাপারে শুধু উৎসাহই দিলেন না, বখতিয়ারকে এক রকম দুই হাতে সামনের দিকে ঠেলতে লাগালেন নিজের দীলের দুর্বলতা সবলে দমন করে। অন্তরের আবেদন এত নিখুঁত ও সতর্কভাবে ঢেকে রাখলেন দিলারা বানু যে, তার তিলপরিমাণ আভাসও বাইরে বেরিয়ে এসে বখতিয়ারকে দুর্বল করে দেবে, সে মওকা তিনি রাখলেন না।

কিন্তু শেষ রক্ষে হলো না। বখতিয়ারের যাবার দিনে দিলারার দুই নয়নের অবাধ্য আঁসু কোন শাসন বাঁধন মানলো না। তাঁর নামাঙ্কিত অঙ্গুরীটি এ যাবত ওয়াপস্ নেননি দিলারা বানু। পরে নেবো–পরে নেবো করেই ঠেকিয়ে রেখেছেন এযাবত। বিদায় দিনে বখতিয়ার যখন সেটা ফিরিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে পীড়াপীড়ি শুরু করলো তখন তিনি কেঁদেই ফেললেন ঝর ঝর করে। বললেন নিজে তো আপনি আমার চোখের সামনে হরওয়াক্ত হাজির থাকায় নারাজ হলেন, ওটা থাকনা আপনার সাথে। অন্ততঃ একটা সান্ত্বনা থাকবে যে, আমার অঙ্গুরীটার হরওয়াক্ত সাথেই আছেন আপনি।

দেওয়ান জান মোহাম্মদ সাহেবের জোরদার আর সরব ও দিলারা বানুর তীব্রতম নীরব আবেদনের সামনে বখতিয়ারকে বিদায়ক্ষণে ওয়াদা করতে হলোই যে, নিজের ঘরবাড়ী আর আপনজন এ দুনিয়ায় কেউ নেই যখন, তখন দেওয়ান সাহেবের মকানই তার মকান এবং তাঁরাই তার আপনজন বিবেচনায় সময় করে সে তাঁদের কাছে মাঝে মধ্যেই আসবে। এর অন্যথা কখনও হবে না।

এই সাথে আরো এক ধাপ এগুতে হলো বখতিয়ারকে। রাহা খরচের নামে দিলারা বানু প্রদত্ত কিছু নগদ অর্থ দিলারাবানুর নিদারুণ আকিঞ্চন চরিতার্থে তাকে হাত পেতে কবুল করতেও হলো।

পাঁচ

ছুটে চলেছে বখতিয়ার। পোষমানা তাজীর পিঠে মজবুত হয়ে বসে দুরন্তবেগে বখতিয়ার খলজী ওয়াপস্ যাচ্ছে বাদাউনে। পিঠে ঢাল, হাতে বল্লম, কোমরে বাঁধা খাপবদ্ধ তলোয়ার। কিন্তু দৃষ্টি তার উদাস, দীল তার আচ্ছন্ন।

সশস্ত্র বাহিনীর একটা সংঘবদ্ধ দলের সাথে আসার কালে বখতিয়ার খলজী হেসে খেলে এসেছে। ওয়াপস্ যাচ্ছে একা। পথ ঐ একটাই। একই রকম দুর্গম। একই রকম বিপদসংকুল।

কিন্তু তা নিয়ে ভাবান্তর নেই বখতিয়ারের। সর্বত্রই সে অকুতোভয়। যে তুফানে দীল তার টালমাটাল, তা হলো পেছনে দিলারা বানু আর সামনে ঐ অনিশ্চিত ভবিষ্যত। দেওয়ান সাহেবের দপ্তরে নিশ্চিত জিন্দেগী নিয়ে হরওয়াক্ত দিলারা বানুর সান্নিধ্যে থাকার লোভ, যে কোন পুরুষের পক্ষেই ত্যাগ করা শক্ত।

সম্মুখে তার নিঃসীম অন্ধকার। বাদাউনের এ জিঞ্জির খুলতেই হবে তাকে, এ সম্বন্ধে জাররা মাত্র সংশয় তার নেই। কিন্তু তারপর?

সেপাই হওয়ার সাজ সরঞ্জাম তামামই তার আছে এখন। কিন্তু সেটা যদি ফের ঐ একই শেকলপরা গোলামী হয়? আত্মপ্রকাশের মওকা যদি রুদ্ধ থাকে সেখানে?

দীর্ঘ পথে দীর্ঘসময় চিন্তা করার অবকাশ ছিল বখতিয়ারের। সে চিন্তা করে স্থির করলো–রাজা বাদশাহ নয় আর। এবার এমন একজন সৈন্যাধ্যক্ষের আনুকূল্য তার চাই যিনি জমি দিয়ে সেপাই পোষেণ আর যার পেছনে হরওয়াক্ত হাজির থাকতে হয় না। অন্য কথায় স্বাধীনভাবে দিনগুজরানের আর পরিকল্পনা উদ্ভাবনের অবকাশ আছে যেখানে। বসার জায়গা চাই আগে। শোয়ার জায়গা এসে যাবে আপছে–আপ।

চিন্তামগ্ন অবস্থায় পথ চলছে বখতিয়ার। নিঃসঙ্গ যাত্রায় চিন্তা একটা আনুষঙ্গিক বালাই–নির্দিষ্ট চিন্তা কিছু না থাকলেও।

ঘোড়াকে ইশারা করেই বখতিয়ার ফের ডুবে যাচ্ছে চিন্তার মধ্যে। কখন কোন পরিবেশ সে অতিক্রম করে যাচ্ছে, সব সময় তার পুরোপুরি হদিসই সে রাখছে না। কখনও বা বন, কখনও প্রান্তর, ফের কখনও বা পাহাড় টিলার চড়াই–উৎরাই। একটার পর একটা সে পেরিয়ে যাচ্ছে একটানা। অকস্মাৎ হালুম্–

চমকে উঠলো বখতিয়ার। সজাগ হয়ে দেখে, সে একটা বনপথ অতিক্রম করে যাচ্ছে। গর্জনটা তার খানিক পাশেই। সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে সেদিকে চাইতেই সে অবাক হয়ে গেল! বাঘে মানুষে লড়াই!

হিংস্র এক বাঘের সাথে কুঠার হাতে লড়াই করছে একা একটা মানুষ। বাঘ এসে লাফিয়ে লাফিয়ে লোকটার উপর পড়তে চাইছে। বিদ্যুৎ বেগে ঘুরে ঘুরে কুঠার দিয়ে বাঘের মুখে আঘাত করার চেষ্টা করছে লোকটা।

বখতিয়ার তার ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরতেই বাঘটা এসে লোকটার একদম বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে এককদম পিছিয়ে গিয়ে কুঠার দিয়ে বাঘের মাথায় সজোরে আঘাত করলো লোকটা। বাঘের মাথার মাঝখানে অনেকখানি বসে গেল কুড়াল। বাঘের মাথা রক্তাক্ত হয়ে গেল। বিকট গর্জন করে লাফিয়ে উঠলো বাঘটা এবং তৎক্ষণাৎ বনের মধ্যে দৌড় দিলো।

লোকটার হিম্মত দেখে তাজ্জব হলো বখতিয়ার। তার চেয়েও আরো বেশী তাজ্জব হলো লোকটার আচরণ দেখে। বাঘটা পালিয়ে গেল, কিন্তু লোকটা একটুও নড়লো না। বাঘের ভয়ে পালানো তো দূরের কথা, এতবড় একটা ঘটনার পরও সে-ওখানেই দাঁড়িয়ে থেকে কপালের ঘাম আঙ্গুল দিয়ে মুছে ফেলে একটা কুকুর তাড়িয়ে দেয়া মাফিক মামুলী এক ঘটনার মতো সে একটা মরা গাছ কুপিয়ে কুপিয়ে কাটতে লাগলো।

বখতিয়ার খলজী তাজ্জব। দুরন্ত সাহসী বলে বখতিয়ারের বিরাট একটা আত্মবিশ্বাস আছে। কিন্তু এ লোকটা বিলকুল তাকে বোবা বানিয়ে দিলে! হিম্মতের একি বিচিত্র নজীর।

অশ্বের লাগাম টেনে ধরে কিয়ৎকাল নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর বখতিয়ারের খেয়াল হলো, লোকটা যে প্রচণ্ড সাহসী—এ নিয়ে সন্দেহ নেই। কিন্ত লোকটার বুদ্ধিমত্তা আর কাণ্ড জ্ঞানের ব্যাপার নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে যথেষ্ট। বাঘ বাঘই মানুষ মানুষই। বাঘ যতটা মানুষের কাছে আতংকের বস্তু, মানুষ ততটা বাঘের কাছে নয়। বেকায়দায় পড়ে পালিয়ে গেছে বলেই সে ভয়ে গিয়ে ঘরে ঢুকে খিল লাগিয়ে দেয়নি। যেভাবে এ লোকটা এক ধিয়ানে কাঠ কোপাচ্ছে এখন, এই মুহূর্তে আহত বাঘটা যদি ফিরে এসে পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার উপর, তাহলে তার নিশ্চিত মউত সে রোধ করতে পারবে না। বীরত্ব গৌরবের, সাহস প্রশংসার। কিন্তু নির্বুদ্ধিতার জন্যে কোনই মান-ইযযত নেই। ওটা ধিক্কারের।

কৌতূহল সে নিবারণ করতে পারলো না। লাগামে টান দিয়ে সে ঘোড়ার গতি ঘুরিয়ে নিলো। এরপর সরাসরি লোকটার কাছে হাজির হলো। পেছনে শব্দ শুনে কুঠার হাতে লাফিয়ে উঠলো লোকটা। বাঘের বদলে মানুষ দেখে সে আশ্বস্ত হলো। প্রশ্ন করলো—আপনি। আপনি কে?

জবাবে বখতিয়ার খলজী বললো—আমি কে, সে পরিচয় পরে দেবো। আপাততঃ আমি একজন রাহগীর।

ঃ রাহগীর?

ঃ জি-হ্যাঁ।

ঃ এখানে? এখানে কি মনে করে?

ঃ আপনাকে আমি দু'একটি প্রশ্ন করতে চাই।

হাতের কাজ বন্ধ করে সে লোকটা বললো—বলুন, কি আপনার প্রশ্ন?

ঃ জ্যান্ত একটা বাঘের সাথে এখনই লড়াই করলেন। বাঘটা পালিয়ে গেল, তবু আপনি এখানে রয়ে গেলেন কোন সাহসে?

ঃ ও, এই কথা? তা কাজ তো আমার শেষ হয়নি। যাই কি করে?

ঃ ও বাঘটা তো ফের আসেত পারে, পারে না?

ঃ পারে বৈকি? বরং ঘা খেলে ওরা আরো ক্ষেপে যায়। সেই জন্যেই তো তাড়াহুড়া করছি আমি।

ঃ তাড়াহুড়া করছেন?

ঃ জি, গাছের এই অংশটা কেটে নিয়েই সরে পড়বো।

গাছটার প্রতি ইঙ্গিত করলো লোকটা। বখতিয়ার ফের প্রশ্ন করলো—অন্য বাঘও তো থাকতে পারে আশেপাশে?

ঃ থাকতে পারে মানে? অনেক বাঘ আছে এখানে।

ঃ তারা মানুষ খায় না?

ঃ খুব খায়। বাগে পেলেই ধরে ফেলে। এই কয়দিন আগেই তো আমার মতো এক কাঠ-কাটা লোককে ধরে নিয়ে গেলো।

ঃ ধরে নিয়ে গেলো?

ঃজি।

ঃ সে লোক আর ফেরেনি?

ঃনা।

ঃ বলেন কি!

ঃ কেন এতে তাজ্জব হবার কি আছে? এই কয় বছরে এখানকার বেশ কিছু লোক বাঘের হাতে জান দিয়েছে।

বখতিয়ার খলজীর চোখ দুটো কপালে উঠলো। বললো তবু আপনারা আসেন এখানে? আর এখনই এই এতবড় একটা দুর্ঘটনার পরও আপনি এখানে কাঠ কাটছেন? জানের আপনার কোন ভয়ই নেই?

লোকটার মুখে ম্লান হাসি ফুটে উঠলো। সে বললো—ভয় আবার কম বেশী কার দীলে না থাকে? ভয়ে তো আমাদের বস্তির অনেকেই এই বনে আসাই ছেড়ে দিয়েছে। অথচ এখানকার মতো ভাল কাঠ আর অন্য বনে নেই।

ঃ আপনি এখনও ছাড়েন নি কেন? নাকি ভয় আপনার–

ঃ আছে। ওদের মতো অতখানি না হলেও ভয় আমার দীলেও আছে। কিন্তু কি করবো বলুন? গরীব কাঙ্গাল মানুষ। ভয় করে ঘরে থাকলে পেট চলবে কেমন করে?

ঃ তার মানে, এই কাঠ–

ঃ হ্যাঁ, কাঠ মিস্ত্রিকে নিয়ে গিয়ে দিতে পারলে তবেই আমি পয়সা পাবো।

ঃ তারপর? সে পয়সা ফুরিয়ে গেলে?

ঃ আবার আমাকে কাঠের তালাশে আসতে হবে এখানে

ঃ এবং আবার আপনাকে বাঘের খপ্পড়েও পড়তে হতে পারে?

ঃ পারেই তো। এখানে যারা হামেশা আসে, তাদের দু'একবার এমন খপ্পড়ে পড়তেই হয়। তাই বলে সবাইতো আর ভয়ের কাছে জিন্দেগীটা বিকিয়ে দিতে পারে না।

ঃ আপনি তো তা পারেনই না, না কি বলেন?

ঃ না তা পারিনে। মরতে তো হবেই একদিন। সুতরাং ঐ ভয়–ভীতিকে আস্কারা দিয়ে ঘরে বসে না খেয়ে মরা আমার পক্ষে অসম্ভব।

বখতিয়ার খলজীর মস্তিষ্ক চাঙ্গা হয়ে উঠলো। তার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা বাস্তবায়নে এমন লোকই চাই তার। এই কিসিমের দুঃসাহসী কয়েকজন সাথী পেলেই সে সত্যি সত্যিই একটা কিছু করতে পারবে। একটু চিন্তা করেই তৎক্ষণাৎ সে বললো–আচ্ছা ভাই, এই কাঠ কেটে যা পাবেন, সে পয়সাটা আমি যদি দেই আপনাকে, তাহলে কি এই বনের বাইরে গিয়ে কিছুক্ষণ আপনার সাথে গল্প করতে পারি?

লোকটা বিশ্বাস করতে পারলো না। বললো–তার মানে! গল্প করে পয়সা! গল্প করে পয়সা দেবেন?

ঃ হ্যাঁ, দেবো। বিশ্বাস না হয় এই নিন।

জেবে রাখা দিলারা বানুর মুদ্রাগুলোর কিয়দংশ মুঠি করে বের করে মেলে ধরলো বখতিয়ার। বললো–হবে না এতে?

এতগুলো মুদ্রা দেখে সে লোকটার চোখদুটো ফুটে উঠলো। বললো–হবে না মানে! ঐ মুদ্রার একটাই তো এই গোটা গাছের দাম নয়। এই রকম দুটো গাছের যে কাঠ হবে, সেই তামাম কাঠ এই একটা মুদ্রায় পাওয়া যায়।

ঃ তা হলে নিন একটা।

লোকটা তবু ইতস্ততঃ করতে লাগলো। বখতিয়ার ফের বললো–তবু আপনি বিশ্বাস করতে পারছেন না? তাহলে আমিই তুলে দিচ্ছি–নিন্–

লোকটা এবার নড়ে চড়ে উঠে বললো–আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে। দেবেন বলে জবান দিয়েছেন যখন, তখন আর কথা কি? চলুন এবার বাইরে যাই।

বন থেকে বেরিয়ে লোকালয়ের কাছে এক নিরাপদ ময়দানে এসে মুখোমুখী বসলো দু'জন। বেলা তখন অনেক খানি গড়ে গেছে। বখতিয়ার খলজী হিসেব করে দেখলো–ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। সূর্যাস্তের আগেই সে নিকটবর্তী সরাইখানাতে পৌঁছতে পারবে। সে ধীরে সুস্থে প্রশ্ন করলো–ভাই সাহেবের নামটা?

লোকটা জবাব দিলো–ইযুদ্দিন মোহাম্মদ শিরান খলজী।

ব্যস্তভাবে চোখ তুললো বখতিয়ার। বললো–কি বললেন–! শিরান খলজী?

ঃ হ্যাঁ সবাই আমাকে শিরান খলজীই বলে। আমার একভাই আছে। তার নাম আহম্মদ শিরান খলজী। তাকে বলে আহম্মদ খলজী।

ঃ আপনি খলজী সম্প্রদায়ের লোক?

ঃ জি–হ্যাঁ।

ঃ মকান?

ঃ আপাততঃ ঐ যে দেখছেন–ঐ বস্তিতে। এর আগে ছিল কুজগিরি বন্দরে।

ঃ কুজ গিরি!

ঃ জি। আজমীর থেকে দক্ষিণ পূর্বে অনেক দূরের এক নদী বন্দরে।

ঃ ওটাই আপনাদের আদি বাসস্থান?

ঃ জি–না। বাড়ী আমাদের তুর্কীস্তানে। ঐ কুজগিরিতে তেজারতি করতে এসে এই যে আজ এই পথে এসে বসেছি।

ঃ বলেন কি! আমাদেরও তো আদিবাস ঐ তুর্কীস্তানে। আমিও ঐ খলজী সম্প্রদায়ের লোক। কয়েক পুরুষ আগে আমরা আফগানিস্তানের গরমশিরে এসেছি।

ঃ তাই নাকি? এক গোত্রের লোক আমরা?

লোকটাও অবাক হলো। ফের সে প্রশ্ন করলো–তাহলে কি এখন ঐ গরমশিরেই–

ঃ না। এখন আছি বাদাউনে। আমি বাদাউনের এক সেপাই।

শিরান খলজীর চোখ ফের মেলে গেলো। সাগ্রহে সে প্রশ্ন করলো–আপনি একজন সেপাই?

ঃ জি–হ্যাঁ।

শিরান খলজী নীরব হলো। একটু পরে একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলে বললো–আমাদের বংশটাও সেপাই–এরই বংশ ছিল।

তা লক্ষ্য করে বখতিয়ার খলজী বললো–সেপাইয়ের বংশ ছিল মানে?

ঃ সে অনেক কথা।

ঃ মেহেরবানী করে সব কথাই বলুন আমাকে। সেই বংশের আপনার কি হলো আর এখন এই কাঠ কাটছেন কেন?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে শিরান খলজী বলতে শুরু করলোঃ

আমাদের পরিবার তুর্কীস্তানের পুরাতন পরিবার। বংশানুক্রমে আমার বাপ দাদুরা সেপাই। অধিকাংশেরাই ফৌজে চাকরী করতেন। আর বাদবাকীরা দেশ বিদেশে ব্যবসা করে বেড়াতেন। মোহাম্মদ ঘোরীর হিন্দুস্থান জয়ের আগে থেকেই আমার বংশের অনেকে হিন্দুস্থানের এই কুজগিরিতে ব্যবসা করতে আসতেন। সেই সুবাদে এই বন্দরে মালামাল নিয়ে আমরা দুই ভাইও আসি এবং ওখানেই বসতি স্থাপন করি।

ঃ কেন, তুর্কীস্তান ফেলে আপনারা এখানে এলেন কেন?

ঃ তুর্কীস্তানে কেউ আর এখন নেই আমাদের। আমার বাপ চাচারা সকলেই ইরাকের সরকারী ফৌজে নকরী করতেন। কয়েক বছর আগে এক লড়াইয়ে সবাই তাঁরা শাহাদত বরণ করলেন। আমার দাদু আর আম্মা সেই শোকে পর পর দুইজনই ইন্তেকাল করলেন। আমাদের দুই ভাইয়ের বেজায় আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তাঁরা আমাদের কিছুতেই ফৌজে যেতে দেননি। তাঁদের চাপে পড়ে বাধ্য হয়ে আমরা তেজারতিতে আত্মনিয়োগ করি। দাদু আর আম্মাজানের ইন্তেকালের পর সংসারে আমরা কেউ মন বসাতে পারলাম না। তুর্কীস্তান আমাদের কাছে খাঁ খাঁ করতে লাগলো। শেষে প্রতিবেশী এক ব্যবসায়ীর উৎসাহে তুর্কীস্তানের তামাম কিছু বেচে দিয়ে মালামাল নিয়ে আমরা দুইভাই সপরিবারে এই হিন্দুস্থানে ব্যবসা করতে আসি আর ঐ কুজগিরিতে বসতি স্থাপন করি।

এই পর্যন্ত বলেই শিরান খলজী থামলো। সে উদাসনেত্রে আসমানের দিকে চেয়ে রইলো। বখতিয়ার ফের প্রশ্ন করলো– তার পর?

ফের শিরান খলজী বলতে শুরু করলো–

ইতিমধ্যেই হিন্দুস্থানে সুলতানে আলা মোহাম্মদ ঘোরীর আধিপত্য কায়েম হয়েছে। তার প্রতিনিধি কুতুবউদ্দীন আইবকের উপর শাসন ভার ন্যস্ত করা হয়েছে। হিন্দুস্থানের এক বিরাট এলাকা তখন মুসলমানদের মুলুক। আমাদের ঐ কুজগিরি এই মুসলমান মুলুকের অন্তর্ভুক্তই ছিল। কিন্তু একেবারেই সীমান্ত এলাকা। তার পাশেই হিন্দুরাজ্য। মুসলমানদের হাতে হিন্দুস্থান চলে যাওয়ায়, হিন্দুরা সেরেফ না-খোশই নয়, ফৌজের সামনে দাঁড়ানোর হিম্মত না থাকায়, মওকা পেলেই নীরিহ লোক মেরে তারা এখন বদলা নিচ্ছে।

ঃ তার পর?

ঃ কিছুদিন আগে পার্শ্ববর্তী এক হিন্দুরাজার ফৌজ গভীর রাতে অতর্কিতে চড়াও হলো ঐ কুজগিরির মুসলমান বাসিন্দাদের উপর। তারা মুসলমানদের আদমী আওরাত বালবাচ্চা সবাইকে নির্বিচারে হত্যা করতে লাগলো। তাদের বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দিয়ে মালপত্র লুট করতে লাগলো। আমাদের মকান ছিল ঐ বন্দরের এক কেনারে। হৈ চৈ শুনেই অন্ধকারে গাঢাকা দিয়ে আমরা গিয়ে পাশেই এক ঝোঁপের মধ্যে লুকালাম। একটু পরেই হাতিয়ার ধারী দুষমনেরা এসে আমাদের মালপত্র লুট করে ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। জানে আমরা বেঁচে গেলাম এই টুকুই যা লাভ। সারারাত ঝোঁপের মধ্যে কাটালাম। ফজরওয়াক্তে দেখি–ও এলাকায় আর মুসলমানের নাম নিশানা নেই। অধিকাংশেরাই মরেছে আর বাদবাকীরা রাতারাতি পালিয়েছে। আশেপাশের হিন্দুরাজা আর জঙ্গী হিন্দুরা এমন ঘটনা আরো অনেক জায়গায় ঘটিয়ে যাচ্ছে–এ খবর হামেশাই কানে এসে পড়ছিলো। ওখান থেকে সরি সরি করতে করতে এই ঘটনা ঘটে গেল। এখন একেবারে কপর্দকহীন হয়ে ঐ বস্তিতে এসে উঠেছি।

শুনে বখতিয়ার খলজী বললো–তা এলেন তো এই কাঠ কাটছেন কেনঃ

ঃ না কাটলে এতগুলো পেট চলবে কি করে।

ঃ কেন, এইতো বললেন, আপনার বংশের সকলেই সেপাই ছিলেন। আপনাদেরও সেপাই হওয়ার খাহেশ ছিল। তেজারতি পয়মাল হলো সদরে গিয়ে সেপাই হবেন। চেহারা তো পুরো দস্তুর ফৌজী লোকের চেহারা। কাঠ কাটবেন কেন?

এবার শিরান খলজী হাসলো। হেসে সে বললো–ভাই সাহেব ফৌজী লোক হলেও দেখছি ফৌজে ঢোকার নিয়মকানুন সম্বন্ধে একেবারেই বেখেয়াল।

ঃ এ্যাঁ

ঃ সেপাই হবার পূর্বশর্ত–নিজস্ব অশ্ব আর প্রয়োজনীয় হাতিয়ার। এগুলো না থাকলে ফৌজে ঢোকার মওকা নেই। রুটির সংস্থানই নেই আমাদের। ও সব কিনবো কি দিয়ে?

ফৌজে ঢোকার পূবশর্ত সম্বন্ধে বখতিয়ার যে কতখানি বেখেয়াল তা বখতিয়ার খলজী নিজে আর আল্লাহতায়ালা ছাড়া তৃতীয় কেউ জানেনা। ক্ষণিকের জন্যে বখতিয়ার খলজী লা-জবাব হয়ে গেল। এরপর সে প্রশ্ন করলো–ফৌজে ঢোকার খাহেশ আর এখন আছে আপনাদের?

ঃ আছে মানে? জানপ্রাণ কোশেশ করছি!

ঃ কোশেশ করছেন?

ঃ হ্যাঁ। জানপ্রাণ কোশেশ করছি রুটির পয়সা বাদে ও সবের জন্যে দুটো বাড়তি পয়সা রোজগারের। কিন্তু ঘোড়া–হাতিয়ার এসব তো আর দু'একটা পয়সার ব্যাপার নয়। কাজেই কবে যে সে উম্মিদ হাসেল হবে আমাদের তা ঐ একমাত্র আল্লাহতায়ালাই জানেন।

শিরান খলজীর কণ্ঠস্বর নেমে এলো। বখতিয়ার খলজী বললো আমি যদি ঘোড়া আর সেই সাথে তামাম হাতিয়ার দেই আপনাদের, তাহলে জঙ্গী জীবনে নামতে আপনারা রাজী আছেন?

শিরান খলজী সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যয় আনতে পারলো না। সে বখতিয়ারের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলো। বখতিয়ার এবার তার ইরাদার কথা ব্যাখ্যা করে শুনালো। সে বললোঃ

জঙ্গী জীবন মানে কোন ফৌজের অধীনে নকরী নয়। যারা আপনার জান মালে হাত দিয়েছে, আমাদের কওমী পতাকার বেইযযত সাধনে হরগিজ যারা তৈয়ার, তাদের বিরুদ্ধে স্বাধীন ভাবে লড়াই করার জঙ্গী জীবন। নয়া ফৌজ গড়ে তুলে ফৌজের মালীক হয়ে জেহাদ করার জঙ্গী জীবন। যে জীবনের কামিয়াবীর সাথে এক সূত্রে গাথা আছে নিজের, কওমের এবং তৌহিদের বিপুল স্বার্থ। যে জিন্দেগীর সামনে আছে নিজের কওমের ও তৌহিদের খেদমতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার সুপ্রশস্ত মওকা।

শুনে শিরান খলজী গম্ভীর কণ্ঠে বললো–সবই তো বুঝলাম ভাই সাহেব! আপনার নিয়াত ইরাদা তামামগুলোই মহৎ আর আকর্ষণীয়। কিন্তু সেটাকে বাস্তবায়িত করার পথ আমাদের কৈ?

ঃ পথের চিন্তা আমাদের নয়। ওটা পরোয়ারদেগার দেখবেন। আমাদের কাজ নিয়াতের পেছনে তদবির আর জানপ্রাণে কোশেশ করা। আমার ছোট্ট একটা আস্তানা আছে, কিছু হাতিয়ার আর গোটা কয়েক অশ্ব আছে। নিজেই একটি ফৌজ তৈরীর ইরাদায় আমি আগে থেকেই দিনে দিনে যোগাড় করেছি এসব।

অতঃপর দিলারার দেয়া অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করে বললো–আর এই তো দেখছেন, আরো কিছু অশ্ব আর হাতিয়ার কেনার সংস্থান আল্লাহ তায়ালা ছাপ্পড় ফেড়ে দিয়েছেন। নিজেরও কিছু সঞ্চয় আছে আমার। এবার ওয়াপস্ গিয়ে কিছু বেতনভুক সেপাই যোগাড় করে ছোটখাটো বাহিনী তৈয়ার করবো একটা। ছোট হোক, বড় হোক, নিজের একটা বাহিনী থাকলে, তার কদর আলাদা। যে কোন শাসনকর্তার নজরে পড়ার সম্ভাবনা থাকে তখন। আপনারা যদি রাজী থাকেন, তাহলে চলে আসুন আমার সাথে। বেতনভুক সেপাই নয়, আমার সহকারী হয়ে কাজ করবেন।

priyoboi.com

শিরান খলজীর মুখ মণ্ডল রোশনাই হয়ে উঠলো। বললো রাজী মানে! মওকা থাকলে আজই আপনার সঙ্গ নিতাম। কিন্তু আমাদের পরিবারবর্গ–মানে দুইভাইয়ের বৌ–বাচ্চা এদের দিনগুজরানের মতো একটা সংস্থান করে না দিয়ে যাই কি করে বলুন!

বখতিয়ার খলজী বললো–একি বলছেন। আপনারা আমার সঙ্গী হলে আপনাদের পরিবারবর্গ জুদা থাকবে কেন? তখন সবাই আমরা এক পরিবার। আমি একদম একা। বরং আপনাদের বালবাচ্চা আর আমার ভাবী সাহেবানরা সঙ্গে থাকলে সুন্দর একটা পারিবারিক জীবনও পাবো আমি।

শিরান খলজী এতটা আশা করতে পারেনি। সে সঙ্গে সঙ্গে রাজী হলো। স্থির হলো–অতঃপর খরচ নিয়ে তাদের কারো মাথা ঘামাতে হবে না। খরচ আদি ও দায়দায়িত্ব তামাম কিছু বখতিয়ারের।

সে রাত্রিটা শিরান খলজীর আস্তানায় গিয়ে কাঠিয়ে পরের দিন শিরান খলজী, আহম্মদ খলজী, ও তাদের বিবিবাচ্চাদের নিয়ে বখতিয়ার খলজী রওনা হলো। বাদাউনে এসে শহরের বাইরে তার অস্থায়ী আস্তানাতে শিরান খলজীদের রেখে বখতিয়ার খলজী বাদাউনের শাসনকর্তা মালীক হিজবর উদ্দীনের দরবারে গিয়ে হাজির হলো। চাকরী করার উম্মিদে নয়। চাকরীর জিঞ্জির ছিন্ন করার উম্মিদ তখন দীলে তার দপদপে!

দেওয়ান সাহেবের মকানে বখতিয়ার খলজীর বিপুল সমাদরের কথা বাদাউনের শাসনকর্তা অনেক আগেই শুনেছিলেন। মালীকের চেয়ে নফরের কদর উপর তলায় অধিক, মালীকের জন্যে এটা কোন খোশ পয়গাম নয়। তার জন্যে এটা একটা অপ্রীতিকর বারতা। নফরকে খুশী রেখে মালীককে চলতে হবে–অন্যথায় উপর তলা গরম হয়ে উঠার সমূহ সম্ভাবনা– এ অবস্থা মালীকের জন্যে অত্যন্ত নাজুক।

ফলে, বখতিয়ার খলজী ওয়াপস্ এসে দু'চারটে মামুলী কথার পর যখন ইস্তফা পত্র দাখিল করার আরজি পেশ করলো, তখন বহিঃপ্রকাশ না ঘটলেও, মালীক হিজবর মনে মনে অত্যন্ত প্রীত হলেন। লৌকিকতার খাতিরে কিছুটা আমতা আমতা করে তিনি সেরেফ ইস্তফাটাই কবুল করে নিলেন না, বিদায়ী ইনাম স্বরূপ একটা ভাল অংকের নগদ অর্থ দান করে বখতিয়ারের সম্প্রীতি এবং তার সংস্রব থেকে নিষ্কৃতি এক সাথে খরিদ করলেন।

আস্তানায় ওয়াপস এসে বখতিয়ার খলজী অতঃপর দল গুছানোর কাজে আত্মনিয়োগ করলো। কয়েকদিন নানা স্থানে একটানা ঘুরে ঘুরে কয়েকজন জানবাজ ও ইমানদার নওজোয়ান সে বেছে বেছে তালাশ করে আনলো। এই নওজোয়ানদের প্রত্যেকেই প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ। কিন্তু এরা এতিম ও অসহায়। আত্মপ্রকাশের মওকা আর অবলম্বনের অভাবে এরা পথে প্রান্তরে পড়েছিল। বখতিয়ার এদের পরখ করে কুড়িয়ে আনলো। কাজ আর আশ্রয় পেয়ে এরা যারপর নেই খুশী হলো এবং বখতিয়ারের প্রতি কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হয়ে গেল।

এদের নিয়ে বখতিয়ার তার নয়া জিন্দেগীর দ্বারোৎঘাটনে ব্রতী হলো। আস্তানায় নিয়ে এসেই সেপাই হিসাবে এদের সকাল-সন্ধ্যা সর্বক্ষণ তালিম দিতে লাগলো। শিরান খলজী ও আহম্মদ খলজী এই দুই ভাইকে বখতিয়ার ঘোড় সোওয়ারী, তীরন্দাজী, নেজাবাজী থেকে ঢাল তলোয়ার পর্যন্ত লড়াইয়ের সর্ববিধ কায়দা কৌশল একাগ্রতার সাথে শিক্ষা দিতে লাগলো। এরাও বিশেষ করে শিরান খলজী এ শিক্ষা অতি দ্রুত ও নিষ্ঠার সাথে গ্রহন করতে লাগলো। এ ছাড়া অনুগত ও নির্ভরশীল সহকারী হিসেবেও শিরান খলজী বখতিয়ারকে প্রতিটি কাজে সাহস দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, সর্বোতভাবে সহায়তা করতে লাগলো।

তদবিরকারীর তকদির আল্লাহ্ তায়ালাই প্রসন্ন করেন। তার নিজ সঞ্চয়ের সাথে দিলারা আর মালীক হিজবরের অর্থ এসে যুক্ত হওয়ায় প্রাথমিক ব্যয় সংকুলান নিয়ে বখতিয়ারকে আদৌ কোন বেগ পেতে হলোনা।

অস্থায়ী আস্তানায় কিছু কাল কেটে গেল। এরপর বখতিয়ার একদিন শিরান খলজীকে বললো- ভাই সাহেব, এখানকার ছাউনি এবার তুলতে হয় আমাদের।

কারণটা আন্দাজ করতে না পেরে শিরান খলজী বখতিয়ারের মুখের দিকে চেয়ে রইলো। বখতিয়ার ফের বললো- বুঝলেন না? এটা মালীক হিজবরের মাটি। আমার আপনার নয়। একজনের মাটিতে অন্য জনের ফৌজী আনযাম মাটির মালীক সইবেন কেন?

শিরান খলজী কিছুটা উৎকণ্ঠার সাথে বলো- এ্যাঁ!

বখতিয়ার বললো- আমাদের এই ফৌজী তৎপরতার কথা অনেক খানি জানাজানি হয়ে গেছে। মালীক হিজবরের কানে পৌছলেই সঙ্গে সঙ্গে ফৌজ আসবে অমাদের উচ্ছেদে।

বুঝতে পেরে শিরান খলজী বললো- ঠিক- ঠিক। বিলকুল হক কথা। এটা উনি অবশ্যই সইবেন না। কিন্তু-

ঃ কিন্তু কি?

ঃ আমরা এখন তাহলে-

বখতিয়ার খলজী হেসে বললো- ভাই সাহেব, এ দুনিয়ার তামাম মাটি উপরওয়ালা ঐ একজনের। দুনিয়ার মানুষ এ মাটিতে দখলী সত্বে স্বত্ববান। যে মাটিতে ঐ একজন ছাড়া দুনিয়ার কোন ব্যক্তিরই দখল গিয়ে বর্তায়নি, বা বর্তালেও নিতান্তই মামুলী -নিতান্তই গৌন, এমন একটা মাটিতে গিয়ে ছাউনি গাড়তে হবে আমাদের।

শিরান খলজী সমর্থন দিয়ে বললো- খুবই যুক্তিযুক্ত কথা। সত্যিই আমাদের এমন জায়গাই চাই।

ঃ চলুন আরো পূব দিকে এগুই আমরা। পশ্চিম দিকেতো দেখে এলাম। নসীব যদি আল্লাহর মর্জী খোলে আমাদের তাহলে সে সম্ভাবনা পূবদিকেই অধিক। আর পথ চলতে শুরু করলে এ মুলুকে এমন জায়গার অভাব তেমন হবে না। না আপনার কি মনে হয়?

ঃ ঠিক- ঠিক। চলুন, আজ কালের মধ্যেই তাহলে-

ঃ হ্যাঁ, আজ কালের মধ্যেই। এখানে আমরা এত লোক এই ভাবে বসে থাকলে, শিগগিরই অর্থ সংকটে পড়বো আমরা। এ কয়টা অর্থ ফুরিয়ে যেতে কতক্ষণ? উপার্জনের জন্যেও তো ভিন্ন আস্তানা চাই আমদের!

ঃ অবশ্যই। আমাদের এই দলকে কাজে লাগিয়ে কে কবে জমি- জিরাত দেবে, তার ঠিক ঠিকানা কি? তার আগে উপার্জনের ব্যবস্থা একটা অবশ্যই চাই আমাদের। আস্তানাও চাই একটা।

ঃ আর কেউ জমি- জিরাত দিলেও তো তার অধীনে মাথা গুঁজে দীর্ঘদিন থাকাটা আখেরী নিয়াত নয় অমাদের। আমাদের আখরী নিয়াত- স্বাধীন ভাবে মাথা তুলে নিজের পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়ানো। আর সে ক্ষেত্রে অনিশ্চিতের সাথে আমাদের পাঞ্জা লড়তে হবেই।

শিরান খলজী মজবুত কণ্ঠে বললো- আলবত্।

পরের দিনই উঠে গেল ছাউনি! পথ চলতে শুরু করলো বখতিয়ারের কাফেলা। দশবার জন পুরুষ, দু'তিনজন মহিলা আর চার পাঁচটা বালবাচ্চার প্রাণবন্ত কাফেলা। যদিও এরা ভাসমান, যাযাবরবৎ ঠিকানাহীন জিন্দেগী যদিও সকলের, তবু দুর্বার এক উৎসাহ এদের আদমী- আওরাত, বাল-বাচ্চা সবার দীলে বিদ্যমান। সামনে এদের অন্ধকার। ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। তা নিয়ে পেরেশান এরা এক ব্যক্তিও নয়। এদের অতীতে কিছু ছিল না।বর্তমানের শূন্যতা তাই নতুন কিছু নৈরাশ্য এদের মাঝে আনেনি। বরং

সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের সোনালী ইশারা নবজীবনের দুর্বার এক জোয়ার জাগিয়ে দিয়েছে এদের চর-পড়া চিরশুষ্ক হৃদয়ের নদীতে।

এগিয়ে চললো কাফেলা। যেখানে রাত সেখানে কাত। পথের মাঝে রাত্রিযাপন করতে করতে বখতিয়ারের উৎসাহী এই কাফেলাটি অযোধ্যার সীমান্তে এসে হাজির হলো।

জায়গাটিও পছন্দ হলো সকলের। পাশেই এক ক্ষীণকায়া স্রোতস্বিনী। গোগ্রা নদীর বিশীর্ন এক শাখা। ভূখণ্ড অসমতল। উচু নীচু- পরিত্যক্ত। কাঁটাগাছ আর গুল্ম লতায় ঢাকা বিস্তীর্ণ এক এলাকা। মাঝে মাঝে হোথা বিচ্ছিন্ন বৃক্ষরাজী। ডালাপালা আর পাতার বহর প্রায় বৃক্ষেই হালকা। লোক বসতি নীবিড় নয়। নদীর ধার বেয়ে বেয়ে কাঙ্গাল- গরীব ছিন্নমূল আর বিত্তহীনদের বাস। সদর থেকে বহৎ দূরে অযোধ্যা মুলুকেরই একটা প্রান্ত এলাকা এটা। প্রশাসনের নজর এখানে কালে ভদ্রে পড়ে।

বন্ধ হলো পথ চলা। খোঁজ খবর জেনে নিয়ে ওখানে ঐ নদীরই ধারে এসে বখতিয়ারের কাফেলাটি ছাউনি গেড়ে বসলো। আপাততঃ তাঁবু পড়লো। অতঃপর অচিরেই বৃক্ষরাজী, ডাল পালা আর খড়বনের সমন্বয়ে পর পরা কয়েকটা চালা উঠলো মজবুত।

পুনরায় শুরু হলো মহড়া। আয়-উপায়ের চিন্তা-ভাবনার সাথে সাথে বখতিয়ার তার সঙ্গীদের জোরদারভাবে রণবিদ্যায় তালিম দিতে লাগলো। দিন কয়েক পরে খবর নিয়ে জানা গেল, এই নদীর তিনচার ক্রোশ পূর্বদিকে এক মস্তবড় নদীবন্দর আছে। হরেক-রকম ব্যবসা বানিজ্য, কায়-কারবার আর প্রচুর কেনাবেচা চলে সেখানে। এই ক্ষীণকায় স্রোতস্বিনীর বুক বেয়ে অনেক বড় বড় নৌকার বহর মাল নিয়ে বড় নদীতে যায়। ভাড়াটিয়া পাহারাদারের দল পথে তাদের পাহারা দিয়ে নিয়ে গিয়ে প্রচুর পয়সা কামাই করে।

এ খবরে বখতিয়ার খলজী চাঙ্গা হয়ে উঠলো। সঠিক খবর সংগ্রহ করার ইরাদায় সে সঙ্গে সঙ্গে শিরান খলজীর সাথে আর দুইজনকে অশ্ব দিয়ে পাঠিয়ে দিলো বন্দরে। ওয়াপস্ এসে যে পয়গাম পেশ করলো তারা, তাতে উপার্জনের সহজতম পথ একটা তাদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে গেল।

ঘটনা সত্য। ভাড়াটিয়া পাহারাদারের বেজায় চাহিদা বন্দরে। হর হপ্তার বিশেষ বিশেষ দিনে এ চাহিদা চরম আকার ধারণ করে। এই বন্দর থেকে মাল কিনে ব্যবসায়ীরা ছোট ছোট নৌকা যোগে ছোট নদী বেয়ে মালগুলি বড় নদীতে নিয়ে যায়। পথ অনেক লম্বা। জনশূন্য ও দুর্গম। লুটেরা আর রাহাজানরা হামলা করে মওকা পেলেই। তাই বন্দর থেকে খুঁজে খুঁজে পাহারাদার যোগাড় করে বেড়াতে হয় ব্যবসায়ীদের। এসব লোক আদৌ কোন জঙ্গী লোক নয়। হাট বাজারের মামুলী-মুটে-

মযদুর- ভবঘুরে। অধিক পয়সার লোভে এরা পাহারাদার সাজে। কিন্তু হামলা হলে প্রতিরোধ করার তেমন কোন তাকত্ এদের থাকে না।

ফলে, পাহারাদার থাকতেও বেশ কয়েকবার লুট হয়েছে মালামাল। পাহারাদার না থাকলে হামেশাই হামলা করে রাহাজানরা, আর থাকলে তারা খামোশ থাকে অনেকটা। এই কারণেই, নৌকার সাথে রাখতেই হয় পাহারাদার- তা তারা যত অকর্মণ্যই হোক। শিরান খলজী জানালো- সশস্ত্র জঙ্গী লোক পাহারার কাজে পেলে দুই গুণ পয়সাও খরচ করতে ব্যবসায়ীরা হরওয়াক্ত তৈয়ার।

অত্যন্ত খোশ খবর। আস্তানার হেফাজতে দু'তিন জনকে রেখে তারা অনায়াসে এই পাহারার কাজ করতে পারে, একটা মোটামুটি হিসেব করে বখতিয়ার খলজী দেখলো- হপ্তায় দুইদিন এই পাহারাদারের কাজ করলে, সেই পয়সায় সবার তাদের দুই হপ্তার তামাম খরচের সুব্যবস্থা হয়ে যায়। কাজের দিন বৃদ্ধি করলে সেপাই সংখ্যা বৃদ্ধি করার মওকাও তার হয় একটা।

কাজেই আর কথা কিঃ সাব্যস্ত হলো-দুদিন পরই হপ্তার সেই বিশেষ দিনের একটা দিন। ঐদিনই তারা পাহারদারের কাজ করতে বন্দরে গিয়ে হাজির হবে।

একটা দিন কেটে গেল। কিন্তু পরের দিন কাটলেও তাদের জন্য কাটলো না।

যে স্রোতস্বিনীর তীরে বসতি স্থাপন করেছে তারা, সেই স্রোতস্বিনীর ক্রোশ খানেক পশ্চিমে স্রোতস্বিনীর দুই পাড়ে পর পর কয়েকটা ছোট ছোট হিন্দুরাজ্য। অন্য কথায়, এই স্রোতস্বিনীই ক্রোশ খানেক পশ্চিমে গিয়ে হিন্দু মুলুকে ঢুকেছে। অযোধ্যার এই সীমান্ত এলাকার বাসিন্দারা অধিকাংশই মুসলমান। অযোধ্যা দিল্লী সুলতানের অধীনস্ত মুসলমানদের মুলুক। অযোধ্যা দখল করেই দিল্লীর ফৌজ ওয়াপস্ গেছে। অন্যদিকে ব্যস্ত থাকায় এদিকে আর নজর দিতে পারেনি। অযোধ্যার শাসনকর্তা মালীক হুসাম উদ্দীন বহিঃ আক্রমণ প্রতিরোধ ও অভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থা সুদৃঢ় করতেই ব্যস্ত আছেন। পার্শ্ববর্তী এই সমস্ত হিন্দুরাজ্যের বিরুদ্ধে শক্ত কোন পদক্ষেপ নেয়ার অবকাশ তিনি পাননি। বিশেষ করে অযোধ্যার পূর্বপ্রান্তের তামাম মুলুকই হিন্দু মুলুক এবং তাদের উৎপাত এত বেশী ব্যাপক যে, অযোধ্যার পূর্ব সীমানা হেফাজত করা হুসামউদ্দীনের পক্ষে একটা সার্বক্ষণিক ঝামেলা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে, তাকে ঐ দিকেই হরওয়াক্ত নজর রাখতে হচ্ছে।

এই সুযোগে অযোধ্যার পশ্চিম দিকের এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু মুলুকের অধিবাসীরা অযোধ্যার এই দিকের সীমান্তবর্তী মুসলমানদের উপর ইদানীং হামেশাই হামলার পর হামলা শুরু করেছে। এদিকে মুসলমানদের আদৌ কোন হেফাজতির ব্যবস্থাদি না থাকায়, ফৌজ ছাড়াও হিন্দু মুলুকের মামুলী বাসিন্দারা পর্যন্ত দল বেঁধে

কখনও বা নদী পেরিয়ে এসে এই সীমান্তের মুসলমানদের তামাম কিছু লুট করছে, ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দিচ্ছে এবং সামনে পেলে মুসলমানদের হত্যা করতেও পিছ পা কেউ হচ্ছে না। সম্পদ লাভের চেয়ে আক্রোশ চরিতার্থই মূল লক্ষ্য এদের এবং এ এলাকা থেকে মুসলমানদের হুকুমাত উৎখাত করার ইরাদাই দীলে এদের জোরদার।

হিন্দু মুলুকের এই সমস্ত বেসামরিক হামলাকারীদের সাথে দু'চারজন সেপাই এসে যোগদিলে হামলাকারীদের হামলা সেদিন ভয়ংকর আকার ধারণ করে। মালীক হুসামউদ্দীনের দরবারে এ পয়গাম অহরহঃ পেশ করা হচ্ছে। কিন্তু প্রশাসনের নজর এ দিকে পড়ছেনা।

এ যাবত এই হিন্দু মুলুকের হামলা বখতিয়ার খলজীর আস্তানা থেকে কয়েক ক্রোশ উত্তর দিকেই সীমাবদ্ধ ছিল। এবার সেই হামলা এসে বখতিয়ার খলজীর একদম পার্শ্ববর্তী বসতির উপর পড়লো। কয়েকজন সেপাই এবার সাথে থাকায় হিন্দু মুলুকের উচ্ছৃঙ্খল জনগণ মার মার কাট কাট রবে এসে বখতিয়ারের পার্শ্ববর্তী মুসলমানদের বসতিটা তছনছ করতে লাগলো।

পরের দিনই ভাড়াটিয়া পাহারাদারের কাজে যাওয়ার ইরাদায় বখতিয়ার তার দলবল নিয়ে আস্তানাতে বসে আনুষঙ্গিক কথাবার্তা বলছিলো। এমন সময় কানে এলো প্রচণ্ড হৈ চৈ ও বিপুল আহাজারী। ঘটনাটা আন্দাজ করার চেষ্টা করতেই এক বৃদ্ধলোক ছুটে এলো বখতিয়ার খলজীর আস্তানায়। সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়ে হাউমাউ করে বললো– হুজুর বাঁচান, আমার বাল বাচ্চাদের বাঁচান!

বখতিয়ার খলজী সদলবলে সচকিত হয়ে উঠলো। বললো– বাঁচান মানে! কি হয়েছে?

জবাবে বৃদ্ধ লোকটি বললো– হামলা করেছে, হামলা!

ঃ হামলা!

ঃ জি হুজুর। পার্শ্ববর্তী হিন্দু মুলুকের লোকেরা আমাদের উপর হামলা করেছে। আমাদের ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দিয়ে তামাম কিছু লুট করে নিয়ে যাচ্ছে। সামনে যাকে পাচ্ছে তাকেই তারা কোতল করছে। আমার বাল বাচ্চারা বাড়ীর মধ্যে আটকা পড়েছে। তারা পালিয়ে আসার মওকা পায়নি। আমার বালবাচ্চাদের বাঁচান হুজুর!

বখতিয়ার ফের প্রশ্ন করলো– হিন্দুমুলুকের লোকেরা হামলা করেছে মানে হিন্দু মুলুকের ফৌজ?

ঃ না হুজুর! ফৌজী লোকও আটদশজন আছে ঠিকই, তবে তামামই তারা ঐ হিন্দু মুলুকের গ্রামবাসী হিন্দু। প্রায় শয়ের কাছে লোক। সবার হাতে লাঠি।

লাফিয়ে উঠলো শিরান খলজী। তার পূর্ব বেদনা টন টন করে উঠলো। সে সগর্জনে বললো– তবেরে! এ ব্যাটারা পেয়েছে কি?

বখতিয়ার খলজী হুংকার দিয়ে বললো– এনৃতেহাম। ভাই সব এনৃতেহাম। এই আমাদের পয়লা পরীক্ষা। এ পরীক্ষার কামিয়াবীই আখেরী কামিয়াবী। নারায়ে– তকবীর–

সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ উঠলো– আল্লাহ– আকবার!

অশ্বের পিঠে লাফিয়ে উঠলো বখতিয়ার খলজী, শিরান খলজী, আহাম্মদ খলজী ও তাদের আরও একজন সহচর। অন্যেরা সব ঢাল তলোয়ার ও বল্লম হাতে ছুটলো। একেবারেই আকস্মাৎ ও অতর্কিতে বখতিয়ার তার দলবল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো হামলাকারীদের উপর। প্রতিরোধ বলে কোন কিছুই এ অঞ্চলে নেই জেনে হিন্দু মুলুকের সেপাইরা এক একজন এক এক দিকে জনতার সাথে খোশদীলে লুটতরাজে রত ছিল। ফলে বখতিয়ারের প্রচণ্ড এই হামালায় তারা দিশেহারা হয়ে ইতস্ততঃ ছুটোছুটি করতে লাগলো। একত্রিত হওয়ার আর মওকাই তারা পেলোনা। রণ বিদ্যায় অশিক্ষিত হামলাকারী জনতা বখতিয়ার আর তার সঙ্গীদের সুতীক্ষ্ণ তলোয়ারের মুখে একের পর এক লুটিয়ে পড়তে লাগলো। লাশের পর লাশ পড়ে দেখতে দেখতে এলাকাটা বিস্তীর্ণ এক বধ্য ভূমির আকার ধারণ করলো।

অকস্মাৎ উন্মত্ত বাঘের মুখে পড়ার মতো আতংকগ্রস্ত হয়ে হামলাকারী হিন্দুরা প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পালিয়ে যাওয়ার কোশেশ করলো। কিন্তু অশ্বারোহী বখতিয়ার আর তার অশ্বারোহী সঙ্গীরা তলোয়ার হাতে অশ্ব হাঁকিয়ে তাদেরকে কোতল করতে লাগলো এবং অশ্ব দিয়ে ঘিরে ধরে অবশিষ্ট সবাইকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে নদীর দিকে নিয়ে চললো। দিশেহারা দুষমনেরা পলায়নের পথ না পেয়ে দল বেধে সকলেই নদীর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং বখতিয়ারের সেপাইদের নেজা–বল্লম আর তলোয়ারের বেপরোয়া ঘায়ে নদীর পানি লাল বর্ণ ধারণ করলো।

বখতিয়ারের তলোয়ার ঊর্ধ্ব মুখে উঠলো। সে বিজয় গর্বে পুনরায় আওয়াজ দিলো– নারায়ে– তকবীর–

সঙ্গীরা তার জবাব দিলো–আল্লাহু আকবার!

ঠিক সেই মুহূর্তে তিন তিনটি হাত তালী সহকারে বখতিয়ারের পেছন থেকে আকস্মাৎ আওয়াজ এলো–সাব্বাস্!

অশ্বের লাগাম টেনে বখতিয়ার খলজী বিদ্যুৎবেগে পেছন দিকে অশ্বের মুখ ঘোরালো। অতঃপর সামনের দিকে চেয়েই সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। তার একদম

সামনেই হস্তীপৃষ্ঠে উপবিষ্ট এক গুরুগম্ভীর শাহী ব্যক্তি। পেছনে তাঁর ফৌজ। বখতিয়ার ঘোড়ার মুখ ঘোরাতেই সেই শাহী ব্যক্তি ফের বললেন– সাব্বাস্ বাহাদুর!

এই শাহী ব্যক্তিই অযোধ্যার শাসনকর্তা মালীক হুসামউদ্দীন। পয়গামের পর পয়গাম পেয়ে খোদ মালীক হুসামউদ্দীন সসৈন্যে বেরিয়েছেন অযোধ্যার এই সীমান্তের হামেশাই আক্রান্ত সেই এলাকাটির পরিদর্শনে। পাশ দিয়েই যাচ্ছিলেন। হৈ চৈ শুনতে পেয়েই তিনি এইদিকে ধাবিত হন। এই নদীর তীরে এসে যখন পৌছেন, তখন বখতিয়ার তার সঙ্গীসাথী নিয়ে হামলাকারী দুষমনদের পানিতে নামিয়ে দিয়েছে।

হাতীর পিঠে বসে বসে মালীক হুসামউদ্দীন তাজ্জব হয়ে বখতিয়ারের এই বাহাদুরী অবলোকন করছিলেন। সেই ফাঁকে উপস্থিত লোকজনের কাছে তিনি ঘটনার খবর জেনে নিলেন। সেই সাথে জানলেন যে, বখতিয়ার নামের ঐ ছোটখাটো লোকটিই এই দলের সরদার।

"সাব্বাস্" বলে খোশ আমদেদ জানিয়ে অযোধ্যার শাসনকর্তা মালীক হুসামউদ্দিন হাত ইশারায় বখতিয়ারকে কাছে ডাকলেন। বিস্মিত বখতিয়ার কাছে এগিয়ে আসতেই মালীক হুসামউদ্দীন নিজ পরিচয় জ্ঞাপন করে বখতিয়ারকে প্রশ্ন করলেন–জনাবের নাম?

অযোধ্যার খোদ শাসনকর্তা তার সামনে উপস্থিত। আনন্দ বিস্ময়ে বিহ্বল বখতিয়ার তাজিমের সাথে সালাম জানিয়ে বিনীত কণ্ঠে জবাব দিলো– গোলামের নাম ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী।

ঃ মকান?

ঃ আপাততঃ ঐ যে ঐ সামনেই– মানে এখান থেকে অল্প একটু দূরে।

ঃ আপনিই এদের দলপতি?

ঃ জি, আমি এদের দোস্ত্।

ঃ আপনার সঠিক পরিচয়?

ঃ দেবার মতো তেমন কোন পরিচয় আমার নেই জনাব।

ঃ তবু তো পরিচয় একটা দিতেই হয় মানুষকে?

বিনীত কণ্ঠে এবং অল্প কথায় বখতিয়ার তার নিজের এবং দলের সকলের ইতিবৃত্ত তুলে ধরে মালীক হুসামউদ্দীনকে জানালো যে, কওম ও তৌহিদের খেদমতে নিবেদিত সে একজন ভবঘুরে মানুষ। অন্যায় ও জুলুমের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হাতে দাঁড়ানোই তার আপাততঃ কাজ। তার সঙ্গীরা সকলেই বাহাদুর ও বিশ্বস্ত। কিন্তু সে নিজে এবং তার সঙ্গীরা সকলেই এখন ভাসমান। তাদের কোন নিজস্ব মকান পরিচয় নেই।

শুনে মালীক হুসামউদ্দীন সাহেব আরো অধিক তাজ্জব বনে গেলেন। সেই সাথে তিনি সোচ করে দেখলেন– এই রকম জানবাজ আর অসীম সাহসী নওজোয়ানই এখন চাই তাঁর। অযোধ্যার পূর্বপ্রান্তে ঐ অস্থিরতার পাহারায় এই লোকটাকে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। আর না হোক, সাহসিকতার সাথে সে তার দল নিয়ে ওদিকের ঐ দুষমনদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে পারবে এবং যথা সময়ে খবরাদি সরবরাহ করতে পারবে।

ভেবে নিয়ে মালীক হুসামউদ্দীন সহৃদয়ে বললেন–আমি যদি আপনাকে আপনার দল নিয়ে আমার কোন কাজে লাগাতে চাই, আপনি কি রাজী হবেন?

বখতিয়ার খলজী বিনম্র কণ্ঠে বললো–মেহেরবানী করে কাজের ধারনাটা যদি–

হুসামউদ্দীন বললেন– ফৌজের কাজ। আমার এই অযোধ্যার পূব দিকের সীমানা পাহারার কাজ।

বখতিয়ারের দীল খুশীতে ফুলে উঠলো। মনের ভাব গোপন করে বখতিয়ার খলজী বললো– জনাব যদি মনে করেন আমার দ্বারা তা সম্ভব, তাহলে আমি আমার দল নিয়ে আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব ইমানের সাথে পালন করার কোশেশ করবো।

মালিক হুসামউদ্দীন প্রত্যয়ের সাথে বললেন–ঃ

আমি তা মনে করি। আর সেরেফ আপনার দলের এই কয়জনই নয়, আরো অধিক সঙ্গী সাথী নিয়ে যাতে করে খোশদীলে আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করতে পারেন, সে জন্য আপনাকে ব্যয় সংকুলানের নিমিত্তে ঐ এলাকায় উপযুক্ত ভূখণ্ড দান করবো।

আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হয়ে বখতিয়ার খলজী বললো– জাঁহাপানা দরাজ দীল। আমি রাজী।

হুসামউদ্দিন খুশী হলেন। বললেন– বহুৎ আচ্ছা। আপনি তাহলে আপনার দল নিয়ে সিধা অযোধ্যার সদর মোকামে রওয়ানা হোন। আমি এই এলাকার আরো একটু উত্তর দিকে যাবো। ওখানকার অবস্থাটা নিজের চোখে দেখেই জলদি জলদি ওয়াপস্ আসবো।

কথা মতোই কাজ হলো। বখতিয়ার তার দল নিয়ে অযোধ্যায় হাজির হলো। মালীক হুসামউদ্দিন তাঁর গন্তব্য পথে যাবার আগে বখতিয়ারের আরো কিছু খোঁজ খবর স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট থেকে সংগ্রহ করলেন। তারা বিশেষ কিছু সরবরাহ করতে না পারলেও যা তিনি পেলেন তাতে বুঝলেন– বখতিয়ার খলজী সেরেফ জানবাজই নয়, সত্যবাদীও বটে।

পরিদর্শন খতম করে যথাসময়ে অযোধ্যার মালীক, মালীক হুসামউদ্দীন অযোধ্যায় ফিরে এলেন। এরপর অযোধ্যার পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত ভাগবত ও ভিউলী নামক দুইটি পরগনার জায়গীরদারী দিয়ে তিনি বখতিয়ারকে এই সীমান্তের সীমান্ত রক্ষীর কাজে নিয়োজিত করলেন।

ছয়

ইওজ খলজীর সংসারে ইদানীং খুবই টানাটানি পড়েছে। তার আয় উপায়ের একমাত্র অবলম্বন- সেই গাধাটির আচানক ভাবে এক কঠিন বীমার হয়। খায়ওনা দায়ওনা পায়ের উপর উঠে দাঁড়াতেও পারেনা। ধরে পাকড়ে দাঁড় করালে কেবলই থর থর করে কাঁপে। হপ্তা দুই ধরে ইওজ খলজী কোন রকম কামাই করতে পারেনি। গাধাটিকে নিয়েই তাকে হরওয়াক্ত ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। এর উপর আবার পৈতৃক আমলের এক দেনা শোধের ভয়ানক চাপ পড়ে এই সময়। সঞ্চিত তামাম অর্থ দিয়ে এই দেনা শোধ করার পর ইওজ এখন কপর্দকহীন।

গাধা তার সবে মাত্র সুস্থ হয়ে উঠেছে। পেটের দায়ে এই গাধা নিয়েই তাকে ছোট ছোট মোট টেনে কোন মতে যাহোক কিছু রোজগার করতে হচ্ছে। এখন সে দিন আনে দিন খায়। কোন কোনদিন এই কাহিল ও কমজোর গাধা দিয়ে সারা দিনের পুরো পেট রুটিও সে কামাই করতে পারেনা। এক বেলার খানা দুই বেলা ভাগ করে খেতে হয়।

এমনই এক অবস্থার মধ্যে একদিন এক ঘটনা ঘটে গেল। সারাদিন ছুটো ছুটি করেও ইওজ সেদিন পুরোদিনের রুটির পয়সা কামাই করতে পারলোনা। গাধাটা ফের কমজোর হয়ে পড়বে ভয়ে, দূরের কোন ভাড়া সেদিন সে ধরলো না। এদিকে আবার নিকটে কোন মাল টানার ভাল কোন কাজও সে পেলো না। ফলে, সারাদিন দৌড়ঝাঁপ করে যা কামাই সে করলো, সাম ওয়াক্তের একটু আগে হিসেব মিলিয়ে দেখলো- তা দিয়ে এই রাতের রুটিটাই হবে তাদের, পরের দিন সকালের কোন সংস্থান তাদের থাকবে না। বেলাও প্রায় খতম হয়ে এসেছে। মকানে সবাই অনাহারে আছে। ফের কোন ভাড়া ধরার মতলব করলে, এই অবেলায় ভাড়া আর সে নাও পেতে পারে। খামাখা তার বউ বাচ্চা অনাহারে কষ্ট পাবে।

সাত পাঁচ ভেবে ইওজ তার গাধা নিয়ে বাড়ীর দিকে রওয়ানা হলো। বাড়ীর পাশেই দোকান আছে। সেখান থেকে রুটির আনযাম কিনবে।

বাজার থেকে বেরুতেই তার সামনে এসে দাঁড়ালো দুই কংকাল সার বৃদ্ধ। তাদের প্রত্যেকের পরিধানে ছেঁড়া ময়লা এক টুকরো চট। পেট তাদের পিঠের সাথে লেগে গেছে। সারা অঙ্গে আজাড়ী আর পেরেশানীর সকরুণ ছাপ।

বৃদ্ধ দুটি সামনে এসেই করুণ কণ্ঠে বললো–বাবা বড় ভূখ! দুইদিন হলো একরত্তি দানাপানিও পেটে যায়নি আমাদের। দ্বারে দ্বারে ঘুরে রুটির একটা টুকরাও কোথাও পাইনি। ক্ষুধার জ্বালায় পেট আমাদের জ্বলে যাচ্ছে। একটু কিছু পেটে দিতে না পারলে, পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকার তাকত্টুকু আর আমাদের থাকবেনা।

করুণ নয়নে চেয়ে বৃদ্ধ দুটি ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগলো।

অজ্ঞাতেই জেবের মধ্যে হাত গেল ইওজের। বউ বাচ্চা নিয়ে তার দিনান্তের আহার এখন এই জেবের মধ্যে। গাধার দড়ি ধরে থেকে আসমান জমিন ভাবতে লাগলো ইওজ। বউ বাচ্চা তার দিনমান ভূখা। ভূখা সে নিজেও। এদিকে আবার তার চোখের সামনে জইফ দুই বৃদ্ধ দুইদিন যাবত অনাহারে। বৃদ্ধ দুইটির করুণ–ক্লীষ্ট মুখের দিকে ক্ষণকাল নিবিড় ভাবে চেয়ে থাকার পর ইওজ খলজী তার সিদ্ধান্ত স্থির করে ফেললো।

ঘটিবাটি একটা কিছু বন্ধক রেখে বাচ্চার জন্যে রুটির একটা সংস্থান সে করতে পারবেই কোনমতে। স্বামী স্ত্রী দুইজনই তারা জোয়ান মানুষ। এক দেড় দিন পানি খেয়ে কাটাতে তারা পারবেই। কিন্তু এই বৃদ্ধদের পক্ষেতো–ভূখা থাকা আর একদণ্ডও সম্ভব নয়। এদের প্রয়োজন তাদের চেয়ে ঢের ঢের বেশী।

সামনেই একটা সরাই। ক্ষণকাল চিন্তা করেই সে বৃদ্ধদের বললো– আসুন। আপনারা আমার সাথে আসুন।

সরাইয়ে নিয়ে গিয়ে নিজে তদবীর করে ভূখা দুই বৃদ্ধকে ইওজ খলজী খাওয়ানো শুরু করলো। খাওয়াতে খাওয়াতে শেষ পয়সাটিও যখন তার শেষ হয়ে গেল, তখন সে বৃদ্ধদের দুঃখ করে বললো– বাবা, আরতো আমার পয়সা নেই। এইটুকুতেই আপনাদের সন্তুষ্ট হতে হবে।

বৃদ্ধদের পেট তখন ভর্তি হয়ে গেছে। আর পয়সা থাকলেও বৃদ্ধদের আর খাওয়ার ক্ষমতা ছিলনা। হাতধুয়ে উঠে ইওজ খলজীর সাথে বৃদ্ধেরাও বাইরে বেরিয়ে এলো। ইওজ খলজী প্রস্থানোদ্যোগ করলে দুই বৃদ্ধের একজন তাকে প্রশ্ন করলো– বাপজান, তামাম পয়সা খরচ করে আমাদের আপনি খাওয়ালেন। বালবাচ্চা নিয়ে আপনার খাওয়ার ব্যবস্থা আছে তো কিছু মাকানে?

ম্লান হাসি হেসে ইওজ খলজী বললো– আপততঃ কিছু দেখছিনে। তবে ইনশা আল্লাহ ব্যবস্থা একটা হয়েই যাবে।

ঃ হয়েই যাবে! কি ভাবে হবে? সেরেফ পানি খেয়ে!

ঃ সেটা তো বলতে পারবো না, তবে রেজেকের মালীক আল্লাহ! আল্লাহতায়ালা আমাদের জন্যে যে রেজেক আজ বরাদ্দ করে রেখেছেন, সেই রেজেকই জুটবে। তার বাইরে যাওয়ার সাধ্য তো কারো নেই?

এবার দ্বিতীয় জন বললো– অবশ্যই। তবে বউ বাচ্চা নিয়ে নিজেকে ভূখা থাকতে হবে জেনেও আপনি যখন আমাদের তামাম পয়সা খরচ করে খাওয়ালেন, তখন আপনাকেও তো কিছু একটা দেয়ার কোশেশ করতে হয় আমাদের।

ইওজ এবার বিস্মিত হয়ে বৃদ্ধদের মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো। ভাবতে লাগলো–পাগল নাকি! বলে কি!·এরা আবার কি দেবে! কৌতূহলের বশেই সে বৃদ্ধদের প্রশ্ন করলো–আপনারা কিছু দেয়ার কোশেশ করবেন– মানে?

ঃ হ্যাঁ অবশ্যই করবো। আপনি এতটা করবেন আর আমরা কিছুই করবোনা? আপনাকে আমরা একটা সোলতানত্ দেয়ার জন্যে আল্লাহ তায়ালার কাছে সুপারিশ করলাম।

নিছক একটা মামুলী বাত হিসাবে ইওজ খলজী হেসে বললো– ও, এই কথা?

ঃ হ্যাঁ, এই কথা। আপনি জলদি জলদি হিন্দুস্থান চলে যান। ওখানে গেলেই আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় আপনি সুলতান হবেন একদিন।

আর কথা না বলে বৃদ্ধদ্বয় জনতার সাথে মিশে গেল। তাদের রসিকতায় ইওজ খলজীও না হেসে পারলো না। মলিন হাসি হাসতে হাসতে ধীরে ধীরে সেও মকানের দিকে রওনা হলো।

মকান ফিরে ইওজ খলজী তাজ্জব বনে গেল। প্রকাণ্ড এক বর্তন ভর্তি গোস্তরুটি নিয়ে স্ত্রী হুসনেআরা বেগম তার জন্যে বিকেল থেকে এন্তেজারে আছে। প্রশ্ন করতেই হুসনে আরা জানালো– পাড়ার এক দৌলতমান্দের পুত্র সন্তান হওয়ায় খানাপিনার বিপুল আয়োজন করেন তিনি। সবাইকে তিনি দাওয়াত দিয়ে খাইয়েছেন এবং তাদের জন্যে এই এক বর্তন লোক দিয়ে পৌঁছে দিয়ে গেছেন।

ইওজ খলজী স্তম্ভিত হয়ে গেল। বৃদ্ধ দুটির কথা দীলে তার চকিতে একটা ঝিলিক দিয়ে গেল। আহার করতে বসে ইওজ খলজী স্ত্রী হুসনে আরাকে তামাম ঘটনা বয়ান করে শুনালো এবং বৃদ্ধদের সোল্তানত্ দানের কথাও সকৌতুকে উল্লেখ করলো।

শুনে হুসনেআরা বেগম গম্ভীর হয়ে গেল। একটু পর সে গম্ভীর কণ্ঠে বললো– তামাসা মনে করছো কেন? কার মধ্যে কি আছে তা বলা যায়? তাঁরা তো ফকির–দরবেশও হতে পারেন! দরবেশদের কথাতো জানি ঝুটা হয়না।

অবিশ্বাসের সুরে ইওজ খলজী বললো– তাই বলে একটা সোলতানত? মানে আমি সুলতান হবো এক মুলুকের? এটা বিশ্বাস করার কথা, না বিশ্বাস করা সম্ভব?

সেই রাতেই খোয়াব দেখলো ইওজ খলজী। আপাদমস্তক সফেদ পোষাক পরিহিত দুই দরবেশ এসে শিয়রে তার দাঁড়ালো। মুখ দেখেই ইওজ খলজীর মনে হলো– ঠিক এদেরকেই সে আজ সন্ধ্যায় আহার করিয়েছে সরাইয়ে। শিয়রে দাঁড়িয়ে দরবেশদ্বয় বললেন– দরবেশের কথা ঝুটা হয় না। জলদি জলদি হিন্দুস্থানে রওনা হন। কিছু তকলিফ মুসিবত থাকলেও সোলতানত্ আপনি একদিন পাবেনই।

পরেরদিন ফের এই খোয়াবের কথা হুসনেআরাকে বলতেই হিন্দু স্থানে যাওয়ার জন্যে সে জিদ ধরে বসলো। বখতিয়ার খলজির প্রসঙ্গ টেনে সে বললো– ছোট মিয়া যদি এতটা মনোবল নিয়ে হিন্দুস্থানে যেতে পারে, আমরা পারবোনা কেন? আমাদের নসীব তো কেউ কেড়ে নিতে পারবেনা?

ইওজ খলজী কিছুটা আপত্তির কথা তুলতেই হুসনেআরা ফের জোরদার কণ্ঠে বললো– এখানেই বা এমন কি সুখে আছি আমরা? এইভাবে মেহনত বিক্রি করে আর কতদিন চালাবেন আপনি? নসীবে যদি তকলিফ পেরেশানী থেকেই থাকে আমাদের, তা এখানে থাকলেও থাকবে , হিন্দুস্থানে গেলেও থাকবে। বরং চুপ করে এক জায়গাতেই বসে না থেকে নসীবটাকে যাচাই করে দেখতে আমাদেরই বা দোষ কি? বউ বাচ্চা নিয়ে কত লোকই এখন ভাগ্যের তালাশে হিন্দুস্থানে যাচ্ছে। তারা যদি সবাই সেখানে ভূখা হয়ে মরে, আমরাও না হয় মরবো!

কয়দিনের মধ্যেই গরমশিরের তামাম কিছু বেচে দিয়ে বউবাচ্চা নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে হিন্দুস্থান গামী এক কাফেলার সাথে ইওজখলজীও সামিল হলো।

জিন্দেগীর মোড় পুরোপুরিই ঘুরে গেল বখতিয়ারের। ভাগবত ও ভিউলী নামক দুই দুইটি পরগনার এখন তিনি জায়গীরদার। এই জায়গীরদারী লাভ করে তিনি এখন স্বাধীন ও স্বচ্ছল ভাবে তাঁর সেই চরম লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। অর্পিত দায়িত্ব তিনি ইমানের সাথে পালন করে অল্পদিনের মধ্যেই মালীক হুসামউদ্দীনের অখণ্ড বিশ্বাস ও সহানুভূতি অর্জন করলেন। তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে

হুসামউদ্দীনের এই সহানুভূতি মস্তবড় সহায়ক হলো বখতিয়ারের। পাশ্ববর্তী হিন্দুমুলুকের আগ্রাসন যথাযথ ভাবে প্রতিহত করার অজুহাতে নিজস্ব এক সেনাবাহিনী গড়ে তোলার পক্ষে তিনি সহজেই হুসামউদ্দীনের অনুমোদন লাভ করলেন।

-মালীক হুসামউদ্দীন চান- যেভাবেই হোক, পাশ্ববর্তী হিন্দুদের উৎপাতটা বন্ধ করুক বখতিয়ার। বখতিয়ার খলজী চান, যে কাজেই হোক, শক্ত একটা সৈন্যদল গড়ে উঠুক তাঁর অধীনে। হুসামউদ্দীনের আস্থা আর বখতিয়ারের ইমান- এই দুইয়ের সমন্বয়ে সুষ্ঠুভাবে হাসিল হলো উভয়েরই মকসুদ।

বখতিয়ার খলজী এবার তার জায়গীরদারীর আয় দিয়ে একটা নিয়মিত ও শক্তিশালী বাহিনী একিন দীলে গড়ে তুলতে লাগলেন। স্থানীয় কিছু বাছাই নওজোয়ানের সাথে তার চেনাজানা ভাগ্যান্বেষী খলজী সম্প্রদায়ের লোকজনদের ডেকে এনে তার বাহিনীতে ভর্তি করতে লাগলেন এবং ফৌজী বিদ্যায় তালিম দিতে লাগলেন।

এমনি করে দশ বারজন নওজোয়ানের দলপতির পরিচয় থেকে অতি অল্পদিনের মধ্যেই বখতিয়ার একটা ছোট হলেও অত্যন্ত সংঘঠিত এক বাহিনীর অধিনায়ক রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। অযোধ্যার পূর্বসীমান্তের তামাম এলাকায় বখতিয়ার এখন বীরদর্পে অশ্বপৃষ্টে ঘুরে বেড়ান এবং উৎপাত কারীদের গন্ধ পেলেই বাঘের মতো গর্জে উঠে তাদের খামোশ করে রাখেন।

দিনের পর আর একটা দিন গত হয়। তারপর আর একদিন। নয়া জিন্দেগীর নয়া স্বাদে বখতিয়ারের দিনগুলি একের পর এক অতিবাহিত হতে থাকে। ইতিমধ্যেই তিনি দুইজন সেপাইকে ঠিকানা সহ গরমশিরে পাঠিয়েছেন। পরম দোস্ত ইওজ খলজীকে সপরিবারে তার আস্তানায় আসার জন্যে অনুরোধ পত্র দিয়েছিলেন সেপইদ্বয়ের হাতে।

বখতিয়ারের দীলে এখন এক নেশা এক ধ্যান-বৈপ্লবিক একটা কিছুর সংঘটন তিনি করবেনই। সেপাইদের এক এক জনকে এক একটা ইস্পাতের টুকরা করে গড়ে তুলছেন বখতিয়ার। তালিমের পর তালিম পেয়ে তারা এখন দুর্বার। তাদের আগ্রহ ও একাগ্রতা ধরে রাখার উদ্দিদে বখতিয়ার তাঁর সেপাইদের আকর্ষণীয় বেতন দেন। শিরান খলজী, আহম্মদ খলজী প্রমুখ অতি নিকটের কয়েকজন বাদে বখতিয়ারের সেপাইরা বেতনভুক্ত সেপাই। কিন্তু বেতন ভুক হলেও বখতিয়ারের পূর্ব জীবনের মতো কোন অনিয়মিত বাহিনীর বেতনভুক সেপাই এরা নয়। অনিয়মিত সেপাইদের নিজস্ব কোন অবস্থান নেই। যখন যে কাজ প্রয়োজন, তখন তাদের সেই কাজই করতে হয়। কিন্তু বখতিয়ারের সেপাইরা নিয়মিত রণ বারহিনীর সার্বক্ষণিক সেপাই। বাহিনীতে

প্রত্যেকেরই অবস্থান আছে মর্যাদাপূর্ণ। বেতনও পায় অনেক। ফলে, এদের উদ্দীপনাই আলাদা।

মাগরিব ওয়াক্তের অল্প কিছু বাকী। সেপাইদের কুচকাওয়াজ পরিদর্শন অন্তে এদিক ওদিক কয়েক কদম পায়চারী করার পর বাহিনীর অধিনায়ক ইখতিয়ার উদ্দীন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী নিজ আস্তানায় ওয়াপস্ যাচ্ছেন। সেপাই ছাউনীর পাশ দিয়েই পথ তাঁর। ছাউনীর শেষ প্রান্তে আসতেই তাঁর কানে এলো এক চাপা কান্নার আওয়াজ। আওয়াজটা সেপাইদের এক কামরা থেকে আসছে। সেপাই ছাউনীর শেষ প্রান্তের কামরা থেকে।

কৌতূহলের বশবর্তী হয়েই বখতিয়ার খলজী এই কামরার কাছে এলেন এবং জানান দিয়ে কামরায় প্রবেশ করলেন। একজন মাত্র সেপাই সে কামরায় ছিল তখন। কুচকাওয়াজের পোষাকাদি না খুলেই সেই সেপাইটা খাটিয়ার উপর শুয়ে শুয়ে কাঁদছে। হাতে তার এক খত।

বখতিয়ারকে প্রবেশ করতে দেখেই সে ধড়মড় করে উঠে সালাম দিয়ে দাঁড়ালো। অতঃপর খেয়াল হতেই সে চোখের পানি আর হাতের পত্র গোপন করার কোশেশ করলো।

বখতিয়ার তাকে পাশে নিয়ে খাটিয়ার উপর বসলেন। অভয় আর সাহস দিয়ে বখতিয়ার তাকে কান্নার কারণ ব্যক্ত করার অনুরোধ করলেন। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করে বখতিয়ারের একান্ত আগ্রহের মুখে সেপাইটি তার কান্নার কারণ ব্যক্ত করলো। বেয়াদপীর মাফ চেয়ে নিয়ে সে বললো-

হুজুর, কুচকাওয়াজ সেরে এসে এই মাত্র এই খত পেলাম। আমার এক বাল্যবন্ধু এই খত আমাকে লিখেছেন। আমি একজন এতিম। বিষয়বিত্ত কম। আমার পাড়ারই আমার চেয়ে অনেকটা অবস্থাপন্ন এক ব্যক্তির সোহেলী নামের এক মেয়েকে আমি ভালবাসতাম। বছপন কাল থেকেই সোহেলীও আমাকে জান দিয়ে ভাল বাসতো। আমাদের এই মহব্বতের কথা জানাজানি হয়ে গেলে মেয়ের বাপ আমাকে ঘর জামাই করতে চাইলেন। কিন্তু ঘর জামাই হয়ে থাকাটা ইযযতে আমার বাধলো। আমি চাইলাম বিয়ে করে আমার বাড়ীতে বউ এনে স্বাধীনভাবে বাস করতে। এতে, মেয়ের বাপ অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। ভিখারীর সাথে তার মেয়ের বিয়ে কখনও হতে পারেনা বলে তিনি আমাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন।

সেপাইটি থামলো। বখতিয়ার খলজী বললেন- তারপর?

ঃ মনের দুঃখে আমি গ্রাম ত্যাগ করার ইরাদা গ্রহণ করলাম। উপার্জনে সক্ষম হওয়ার আগে আর আমি গ্রামে ফিরে আসবোনা বলে মতলব স্থির করলাম। আমার দীলের কথা কেমন করে জানতে পারলো সোহেলী। সে গোপনে এসে দেখা করলো আমার সাথে। যেখানেই থাকি– যেভাবেই থাকি, মাঝে মাঝে গ্রামে ফিরে তার সাথে দেখা করে যাওয়ার জন্যে সে হাতে পায়ে ধরে আমাকে অনুরোধ করে গেল।

সেপাইটি আবার একটু থেমে ফের বললো–কিন্তু সেই যে বেরিয়ে এলাম আমি, আর ফিরে যাইনি। মেয়ের কান্নাকাটি দেখে তার বাপটাও ফের আমার সাথেই তার বিয়ে দিতে রাজী হলেন। কিন্তু আমি তখন কোথায়–এ হদিস কেউ তারা জানলেনও না, পেলেনও না। দীর্ঘদিন আমাকে না ফিরতে দেখে কেমন করে গ্রামময় খবর রটে গেলো যে, আমি আর জিন্দা নেই। অনেক আগেই ব্যাধি বিমারে ইন্তেকাল করেছি। দেখে শুনে মেয়ের বাপ অন্যত্র মেয়ের বিয়ে ঠিক করলেন। মেয়েটি বার বার আমাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করতে অস্বীকার করা সত্ত্বেও বাপ তাকে জোর করে বিয়ে দিতে গেলেন। যে রাতে বর এলো সেই রাতেই সোহেলী গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করলো।

গুম হয়ে বসে রইলো সেপাইটি। বখতিয়ার খলজী বললেন– তাজ্জব ব্যাপার! তারপর?

সেপাইটি ফের ধরা গলায় বলতে শুরু করলো– এ ঘটনা হপ্তা খানেক আগের। আমার এক বাল্য বন্ধু এই এলাকায় থাকেন। তিনি বাড়ি গিয়ে ঘটনার কথা জেনে এসে এই খত লিখে তামাম কথা জানিয়েছেন। হপ্তা দুই ধরেই যাবো যাবো, করেও আজও আমার যাওয়া হয়নি। হুজুরের কাছে ছুটি চেয়ে কেউ কখনও বিমুখ হয়নি। আমার বিশ্বাস, আমি চাইলেও নিশ্চয়ই হুজুর না মঞ্জুর করতেন না। হপ্তা খানেক আগেও যদি যেতে পারতাম একবার, তাহলে আমার সোহেলীকে এই ভাবে জান দিতে হতো না।

বলেই সেপাইটি আবার ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেললো।

সেপাইটিকে শান্ত করতে অনেক সময় লাগলো। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বখতিয়ার যখন ছাউনি থেকে বেরুলেন, তখন মাগরিবের আযান শুরু হয়েছে। মসজিদে গিয়ে মাগরিবের নামাজ আদায় করে বখতিয়ার যখন আস্তানায় ফিরে এলেন, তখন তিনি বিলকুল ভিন্ন মানুষ। সেপাইটির সেই করুণ কান্নার সাথে তার সেই কথা– 'হপ্তা–খানেক আগেও যদি যেতে পারতাম একবার'– তখনও কানে বাজছে বখতিয়ারের। আর সেই সাথে তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠছে দিলারা বানুর বিদায় মুহূর্তের সেই সকরুণ মুখচ্ছবি। দিলারাও মাঝে মাঝে সাক্ষাৎ দিয়ে যাওয়ার জন্যে কত ভাবেই না আরজ

পেশ করেছে। সেই থেকে কতদিন পেরিয়ে গেল! এর মধ্যে তার একবারও আর দিলারার কাছে যাওয়া হয়নি। হয়তো বা ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ পেলেই দিলারা বানু বেরিয়ে আসছে বাইরে। ভাবছে, এই বুঝি বখতিয়ার এলো।

দিলারা বানুর অঙ্গুরীটি চোখের সামনে তুলে ধরে দিলারার কথা ভাবতে ভাবতেই বখতিয়ারের তামাম রাত অতিবাহিত হয়ে গেল! পরের দিন সকালেই শিরান খলজীকে ডেকে কয়দিনের জন্যে সীমান্ত রক্ষার তামাম দায়িত্ব তার উপর অর্পন করে বখতিয়ার খলজী আজমীরের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন।

পুত্র আরমান খাঁর সাদীর পয়গাম নিয়ে রাজস্ব বিভাগের উজির একদিন নিজে এলেন আজমীরে এবং দেওয়ান জান মোহাম্মদ সাহেবের কাছে পয়গাম পেশ করলেন।

বয়স হয়েছে মেয়ের। অনেক আগেই সাদীর ব্যবস্থা করতে হতো। কিন্তু দেওয়ান সাহেবের কন্যা দিলারা বড় জেদী। বিয়ের প্রশ্ন তুললেই তিনি হাতের কাছে যা পান তাই ভাঙ্গুর শুরু করেন। বিয়ের কথা একদম তাঁর না–পছন্দ। বিয়ের কথা আদৌ তিনি বরদাস্ত করতে পারেননা। বিয়ের ব্যাপারে স্বাভাবিক এক অনীহা তাঁর জন্মগত ব্যাপার। বিয়ে করতে আগ্রহ হয় এমন কাউকে এযাবত নজরে তাঁর না পড়ায়, তাঁর এই অনীহা দিনে দিনে জোর দার হয়ে উঠেছে।

দেওয়ান জান মোহাম্মদ সাহেব এই মা–মরা মেয়ের ভয়ে এ ব্যাপারে এযাবত চুপচাপই ছিলেন। মেয়ে তার সুন্দরী। মেয়ের দীল খোলাসা হলে বিয়ে দেয়াটা আদৌ কোন সমস্যা তার হবে না।

খোদ উজির সাহেব অবশেষে এই পয়গাম পেশ করায়, তাঁকে আর ফেরাতে তিনি পারলেন না। মেয়ের এবং নিজের আখের চিন্তা করে উজির সাহেবের প্রস্তাবে তিনি সম্মত হয়ে গেলেন। উজির সাহেবও সেজন্য তাকে মোবারকবাদ জানিয়ে খোশদীলে দিল্লীতে ওয়াপস্ গেলেন। সাব্যস্ত হলো, সময় ক্ষণ দেখে একদিন এই শুভ কর্ম সুসম্পন্ন করা হবে।

সময় ক্ষণের পরোয়া ঠান্ডা দীলের মরুব্বী করেন। কিন্তু তরতাজা আর গরম দীলের আরমান খাঁর কাছে কোন সময়–ক্ষণ নেই। দিলারা বানুর তসবীর দেখার পর থেকেই সে দিওয়ানা। বিয়ের পয়গাম কবুল হওয়ার পর তো আর কথাই নেই! দিল্লীতে তার কদাচিৎ সবেরা ওয়াক্ত হলেও, সাম ওয়াক্তে আজমীরে তার পৌঁছাই চাই।

সেখানে তাঁর এত প্রয়োজন এখন যে, জাররা মাত্র গাফিলতির কারণে দিল্লীর মসনদ যখন তখন ধূলোর দামে বিক্রি হয়ে যেতে পারে। আর দেওয়ান সাহেবের মকানে বসে দেওয়ান সাহেবের পরামর্শে সে প্রয়োজনগুলোর মোকাবেলা না করলে মসনদ তো মসনদ, গোটা কওমের আখেরতটা কান্ডারী হীন কিস্তির মতো মেসমার হতে বাধ্য। কাজেই, আরমান খাঁ কোথায়? এর এক উত্তর– আজমীরে।

আজও তিনি আজমীরেই। দিলারা বানুর মেজাজ মর্জির কিছুমাত্র হদিস করতে না পারলেও, আজমীরেই থাকবেন তিনি। কারণ, খুবসুরাত যার উমদা, তিনি একটু বেয়ারা আর বেপরোয়াই হন। তবে সাদীর লাগাম মুখে পড়লেই বিলকুল সব ঠাণ্ডা। আপসে-আপ ঠাণ্ডা না হলেও, অপরিসীম কুওতের খুল্লে মালীক খান-ই খানান আরমান খান সাহেব। ঠাণ্ডা করতে কতক্ষণ?

আরমান খাঁ আজও দক্ষিণ দিকের সেই খোলামেলা ভাল কামরাটি পান নি। বখতিয়ার খলজী বেরিয়ে যাওয়ার পর থেকেই তালা পড়েছে ও ঘরে। লাগিয়েছেন দিলারাবানু। এলানঃ অতঃপর কোন মেহমান আর ঐ কামরায় থাকবেনা। দিলারা বানুর কথার উপর হাত খেলানোর তাকত্ খোদ জান মোহাম্মদ সাহেবের ওয়ালেদেরও নেই। কাজেই, ঐ এলানই কায়েমী। মাঝে মধ্যে দিলারা গিয়ে বিরাম করেন ঐ ঘরে। বেরিয়ে আসেন তালা লাগিয়ে।

দিলারা বানু বদলে গেছেন। দীলে আর তাঁর প্রফুল্লতা নেই। তিনি এখন অতিমাত্রায় গম্ভীর ও ইবাদতমুখী। ভাবী খসমের খেদমতে নেক নজর মঞ্জুর করার জাররা মাত্র খাহেশও তার নেই, ফুরসুতও তাঁর নেই। সকাল-সন্ধ্যা-দুপুর, হর ওয়াক্ত তিনি এখন ইবাদতেই পড়ে থাকেন। দীন দুনিয়ার মালেকের কাছে আরজ গোজার করেন বালা-মুসিবত-তুফান থেকে নাজাত পাওয়ার উম্মিদে। প্রার্থনা করেন বখতিয়ার খলজীর ভালাই।

বখতিয়ার খলজী এখন আর বাদাউনে নেই। কোথায় আছে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন। খত সমেত দিলারা বানু বাদাউনে লোক পাঠান। লোকের সাথে খতটিও ওয়াপস্ চলে এসেছে। বখতিয়ারের কিছুমাত্র হদিস সাথে আসেনি। আসার মধ্যে এসেছে শুধু মালীক হিজবরের নছিহত। বাদাউনের অধিপতি মালীক হিজবর উদ্দীন নসিহত করে শুনিয়েছেন– এ লোক অতি অস্থির। বেপরোয়া ও চঞ্চল। এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকাতে একদম অনভ্যস্ত। বিপথে কি বিভূঁয়ে অপঘাতে মৃত্যু এর অবধারিত।

ফলে ইবাদতে মশগুল হয়ে পড়ে থাকা ছাড়া দিলারার আর কিছু করার নেই। কাঙ্গাল গরীব হলেও অষ্ঠধাতুর গড়া এই রকম তুলনাহীন চরিত্রের নির্লোভ মানুষ নিতান্তই দুষ্প্রাপ্য। নঙ্গর-বন্ধনহীন। পাওয়ার আশা দিলারাও বড় একটা রাখেন না। তাঁর নসীব তিনি এতটা শানদার মনে করেন না। এই শেকল কাটা ইনসানকে বেঁধে রাখার উপযুক্ত রজ্জু তার কি? সবাই বলেন, তাঁর খুবসুরাতটা খুবই নাকি উমদা। কিন্তু খুবসুরাতই কি সব? রূপ দিয়েই কি ভোলানো যায় সবাইকে– বিশেষ করে সে লোক যদি বখতিয়ার মাফিক তেজ কোটালের তরঙ্গ হয়?

কাঙ্খা তাঁর-সে সুখে থাক, বিপদ-আপদ-মুসিবত থেকে পরোয়ারদেগার হেফাজত করুন তাকে। খোদার আরশে এই আরজই হর হামেশাই পেশ করছেন দিলারাবানু। ইবাদতের বাইরে সময়কিছু থাকলে, সেটুকু তাঁর ছাদের উপরই কেটে যায় সদর ফটকের দিকে সতৃষ্ণ নয়নের নিরর্থক দৃষ্টিপাতে।

আরমান খাঁ সাহেবের না-খোশ হওয়ার কারণ আছে সঙ্গত। আজমীরে তিনি দিল্লীর তৈরী লাড্ডু বেচতে আসেননি। দিলারাবানু বিলকুল যদি ডুমুরের ফুল সাজতে চান, খান সাহেব আর তাহলে বরদাস্ত করেন কতক্ষণ? তিনি গোস্বা হয়ে জান মোহাম্মদ সাহেবের কাছে ফরিয়াদ পেশ করলেন। তিনি একজন উজির পুত্র। খোদ গজনীর শাহানশাহের বংশধর, ফালতু আদমী নন! সাদীর কথা পাকা! আজ বাদে কাল বিয়ে! তবু দুলহীনের এই নিদারুণ উপেক্ষা যে কোন অদ্না আদমীর পক্ষেও বরদাস্ত করা দুরূহ। এর অর্থ কি?

সাদাদীলের দেওয়ান সাহেব এর জবাবে বললেন--বাপজান, মেয়ে আমার খানিকটা খেয়ালী আর জেদী। তার উপর ফের অল্পদিনের মধ্যেই তোমাদের দুইয়ের সাদী। হয়তো শরম পেয়েই এতটা দূরে দূরে থাকছে সে। তবে সেজন্যে না -উম্মিদ হওয়ার কারণ নেই। সাদীর পর তামাম কিছুই ঠিকঠাক হয়ে যাবে। এদিকে তোমার যাতে করে তয়-তদবিরে ঘাটতি-গলতি না ঘটে, সে জন্যে আমি এক্ষুণি সবাইকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি।

মেয়ের এই উদাসীনতায় দেওয়ান সাহেবও খানিকটা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এতটা মনমরা তিনি দিলারাকে কোন সময়ই দেখেননি। এটা কোন কঠিন ব্যাধির আলামত কিনা, হেকিম ডাকা দরকার কিনা--এসব তিনি বসে বসে চিন্তা করতে লাগলেন।

দেওয়ান সাহেবের আওলাদ ফরমান আলীর স্ত্রী হাজেরা বিবি কয়দিন আগে খসমের সাথে দিল্লী থেকে এসেছেন। তিনি এসে দিলারা বানুর পাশে বসে বললেন– বহিন, কি হয়েছে আপনার, বলবেন তো?

দিলারা বানু হাজেরা বিবির মুখের দিকে চোখ তুলে চাইলেন। চেয়ে থেকে বললেন–কৈ, কিছু হয়নি তো!

হাজেরা বিবি অবাক হবার ভান করে বললেন–হয়নি মানে? জরুর হয়েছে। আপনাকে বেজায় পেরেশান দেখছি কয় দিন হতেই। আহার নিদ্রা এক রকম ছেড়েই দিয়েছেন আপনি! ব্যাপারটা কি বহিন? বীমারটা কি দেহের, না দীলের?

কোন গুরুত্ব আরোপ না করে এ প্রশ্নের জবাবটাও দিলারা বানু সহজ কণ্ঠে দিলেন। বললেন–বীমার কিসের! ভাল্ লাগেনা, তাই।

হাজেরাও নাছোড় বান্দা। চোখ কপালে তুলে বললেন–এই ভাল না লাগাটাও একটা মস্ত বড় বীমার বহিন, দীলের বীমার। চিকিৎসাতে দেরী হলেই বিলকুল আওয়ারা।!

ঃ কি সব বাজে কথা বলছেন?

ঃ বাজে বলেই তো বলছি। না বাজলে বলতাম না।

ঃ মানে!

ঃ কথাটা বেজে উঠেছে ইতিমধ্যেই। আপনার ভাব দেখে দাসী–বাঁদীরা সকলেই কানাঘুঁষা শুরু করেছে।

ঃ কানাঘুঁষা!

ঃ সবার ধারণা– সাদীর পয়গাম কবুল হলো, কথাবার্তা পাকা হলো–তবু সাদীতে এ বিলম্ব আপনি বরদাস্ত করতে পারছেন না।

দিলারা বানুর চোখের ভ্রূ কুঞ্চিত হলো। তিনি বললেন–বটে! তা ভাবী সাহেবার নিজের ধারণা কি–সেটা জানতে পারি?

ঃ আমার ধারণা অবশ্য এত চোখা নয়। একটু ভোঁতা।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ বীমারটা সাদী সংক্রান্ত–এ নিয়ে দীলে আমার দ্বন্দ্ব নেই। দ্বন্দ্ব শুধু, বহিনের আমার বীমারটা সাদীর পয়গাম পাওয়ার জন্যে, না, না পাওয়ার জন্যে–এই নিয়ে।

ঃ না পাওয়ার জন্যে মানে?

ঃ মানে, একজন এসে সাদীর উম্মিদে ঘাড়ে চেপে আছেন, আর একজনের পক্ষ থেকে পয়গামটাই এলোনা।

এসেছে–এসেছে–

পড়িমরি এক পরিচারিকা ছাদ থেকে ছুটে এসে চীৎকার করে বলতে লাগলো–এসেছে–এসেছে–

তার উল্লাস দেখে হাজেরা বিবি প্রশ্ন করলেন–এসেছে মানে? কি এসেছে?

ঃ ঘোড়া!

ঃ ঘোড়া!

ঃ জি, ঘোড়া!

ঃ ঘোড়া মানে?

ঃ মানে সেই ঘোড়া–মানে–ঐ সেই–

ঃ তাজ্জব! সেই ঘোড়া মানে?

ঃ মানে সেই ঘোড়াওয়ালা এসেছে। যে ঘোড়ার তালাশে ফুল বাগানে ঢুকে লোকটা সেবার সিধা গিয়ে আমাদের ঘাড়ের উপর পড়লো–সেই ঘোড়া মানে ঘোড়াওয়ালা এসেছে।

হাজেরা বিবির খেয়াল হতেই বললেন–বখতিয়ার সাহেব?

পরিচারিকাটি ব্যস্ত কণ্ঠে বললো–হ্যাঁ–হ্যাঁ, ঐ সাহেব, ঐ সাহেব।

দিলারা বানু ইতিমধ্যেই ছাদে যাওয়ার সিঁড়ি ভাংতে শুরু করেছেন।

ফটকে এসে দাঁড়াতেই দ্বাররক্ষী থেকে শুরু করে চাকর–নফর তামাম লোকই বখতিয়ারকে উষ্ণ দীলে গ্রহণ করলো। দহলীজে এসে দাঁড়াতেই ধড়মড় করে উঠে জান মোহাম্মদ সাহেব খোশদীলে বললেন–আরে এই যে বাবা, যাক, তুমি তাহলে বিলকুল ভুলে যাওনি আমাদের! এসো–এসো–

দেওয়ান সাহেবের ফরজন্দ ও শাহী দরবারের সহকারী ফরমান আলী সাহেব অল্পদিনের জন্যে আজমীরে এসেছিলেন। তিনি এখন বিদায়ের জন্যে তৈয়ার। অনেকদিন পর দেখতে পেয়েই বখতিয়ারকে তিনি একদম বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলেন। খুশীর আধিক্যে বললেন–আমাদের থেকে দূরে বেমালুম এইভাবে হারিয়ে লুকিয়ে থাকলে তো চলবেনা ভাই! আমার তো আর ভাই নেই, আপনিই আমার ভাই–এ কথাটাতো ভুলে গেলে চলবে না?

বখতিয়ার খলজী বিস্ময়ের সাথে বললেন–ভাই! আমাকে আপনি ভাই বললেন?

ফরমান আলী লাফিয়ে উঠে বললেন–বলবো না মানে? এমন একটা বাহাদুর ভাই থাকা কার না গর্বের কথা! সে মওকা হাতে পেয়ে আমরা কেন আপনাকে ভাই না বানিয়ে ছেড়ে দেবো?

হাসতে লাগলেন ফরমান আলী। সেই হাসিতে যোগ দিলেন দেওয়ান সাহেব ও দরজার আড়ালে দাঁড়ানো দিলারা বানু বেগম। দেওয়ান সাহেব বললেন–কোথায় ছিলে বাবা এতদিন? শুনলাম, বাদাউনে আর নাকি থাকো না?

বিগত ঘটনাগুলির ছিটে ফোঁটা আভাস দিয়ে বখতিয়ার খলজী রেখে ঢেকে বললেন–আমি এখন অযোধ্যায় আছি। অযোধ্যার পূর্বসীমানার সীমান্ত রক্ষী।

বখতিয়ারের আদব আকিদায় আর আন্তরিক আচরণে এ বাড়ীর বাঁদী-নফর-পরিচারিকা সকলেই পছন্দ করতো বখতিয়ারকে। সকলের খুশীর সাথে এরাও শরিক হলো।

ফরমান আলী সাহেব দিল্লীতে ওয়াপস্ গেলেন। হাজেরা বিবি স্বামীর সাথে না গিয়ে কয়েকদিন আজমীরেই রয়ে গেলেন। দিলারাকে আড়ালে পেয়ে হাজেরা বিবি বললেন-এতো এক আজব হেকিম বহিন! এসে চৌকাঠে পা না দিতেই বহিনের আমার বীমার ব্যাধি সাফ?

কপটরোষে দিলারা বানু বললেন-হুঁশিয়ার!

খুলে গেলো সেই তালা দেয়া খোলা মেলা কামরাটি। ঘর সাজালেন দিলারা বানু নিজে। বখতিয়ারকে সমাদরে সেই ঘরে তোলা হলো। দিলারা বানুর দীল খোলাসা হওয়ার ফলে বাড়ীতে ফের প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে এলো। দিলারাই এই মকানের মধ্যমণি। মধ্য মণির মন-মেজাজে বিষাদের ছায়া পড়লে, খোশ প্রবাহ সে মকানে প্রবেশ পথ খুজে পায় না। সেই দীলারা বানুর ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটে উঠায় গোটা মকানটাই ফের খুশীর আলোয় রোশনাই হয়ে গেল।

কিন্তু কুসুমের মাঝে কীটের মতো আঁধারটা তবু বিলকুলই মকান ছাড়া হলো না। মকানের তামাম আঁধার ছুটে এসে জমাট বাঁধলো এক জায়গায়। আর সে জায়গা কোন নিভৃত অঙ্গন নয়, সেটা উজির জাদা আরমান খাঁর মুখ মন্ডল। তিনি এখনও এই বাড়ীতেই আছেন। প্রথমে তাজ্জব হয়ে এবং পরে গোস্বার সাথে তিনি বখতিয়ার খলজীর এ বাড়ীতে বিপুল এই সমাদর মাপ-পরিমাপ করতে লাগলেন।

বখতিয়ার তার ঘরে এলে পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে দিলারা বানু বললেন-যাক, শেষ অবধি ফিরলেন আপনি তাহলে?

বখতিয়ার খলজী হেসে বললেন-কেন সন্দেহের কোন কারণ আছে?

ঃ থাকাই তো স্বাভাবিক। যে বেখেয়াল মানুষ আপনি, তাতে আমাদের ভুলে যাবেন-এ আর বিচিত্র কি! মাঝখানে যতদিন চলে গেল সে হিসেবে এ দিকে আসার কথা তো আপনার মনে থাকারই কথা নয়।

ঃ এই যে জাজ্জিল্যমান এসেছি, তাও বিশ্বাস হচ্ছে না?

ঃ হওয়াটাতো সত্যি সত্যিই কঠিন।

ঃ তাহলে আমার গায়ে হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখুন।

ঃ ও-মা-এত-!

হাসতে হাসতে দরজা থেকে ছিটকে গেলেন দিলারা বানু।

মাঝে একদিন কেটে গেল। পরের দিন আহার বিশ্রাম অন্তে দেওয়ান সাহেবের আহবানে দহলীজের বারান্দায় বসে বখতিয়ার খলজী তাঁর সাথে গল্প গুজব করতে লাগলেন। আসরের আযান শুরু হওয়ায় জান মোহাম্মদ সাহেবের সাথেই মসজিদে গিয়ে আসরের নামাজ আদায় করে দুই জনই ফের ওয়াপস্ চলে এলেন এবং দেওয়ান সাহেব জরুরী এক কাজে দপ্তরে ঢুকে পড়ায় বখতিয়ার তার কামরার দিকে রওনা হলেন।

বখতিয়ারের নাস্তা নিয়ে বাঁদীর সাথে দিলারাও দরজার কাছে এলেন। বখতিয়ার নামাজ আদায়ে মসজিদে গেছে শুনে বাঁদীকে বিদায় করে নিজেই তিনি ঘরে ঢুকে নাস্তা গুলো সাজিয়ে রাখতে লাগলেন। বখতিয়ারের সামনে আসার কোন ইরাদা নিয়ে না আসায় তিনি বোরকা পরার জরুরত বোধ করেননি। খোলা চুলে মুখ মন্ডল খোলা রেখে এবং ওড়নাটাও গলার সাথে পেঁচিয়ে তিনি নাস্তা পানি সাজানোর কাজে মসগুল হয়ে রইলেন। দরজার কাছে পায়ের আওয়াজ শুনে বাঁদীটাই ফের ফিরে এসেছে ভেবে মুখ তুলে দরজার দিকে চাইলেন।

ঘরে ঢুকলেন বখতিয়ার। ঘরে কেউ আছেন, এটা বখতিয়ারের জানার কথা নয়। তিনি আনমনে ঘরে ঢুকেই দুই জন একদম মুখোমুখী হয়ে গেলেন। চোখের উপর চোখ রইলো দুইজনের।

সেই উপমাহীন অনবদ্য রূপ। খোলা চুল দিলারাকে আরো বেশী আকর্ষণীয় করে তুলেছিল। মেঘবরণ কালো চুল। যেমনি ঘন তেমনি লম্বা। দুধে আলতায় বিধৌত দিলারার স্নিগ্ধ ও কুসুম পেলব মুখমন্ডলের সাথে অনুপম এই কুন্তল বাহার তার খুব-সুরাতকে আরো বেশী তাগড়া করে তুলেছিল।

তন্ময় হয়ে বখতিয়ার এই চন্দ্রনিন্দিত মুখচ্ছবি অবলোকন করছিলেন। অবলুপ্ত অস্তিত্বের নিরাকার এক পরিমন্ডলের মাঝে তিনি রুদ্ধশ্বাসে দিলারার রূপলাবণ্যের পেয়ালা তলানীতক শুষে নেয়ার জন্য এক নেশায় ক্ষণিকের তরে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন।

দিলারা বানুর অবস্থাও তখন তদ্রূপ। বখতিয়ারের আকর্ষণীয় স্বপ্নাপ্লুত দৃষ্টি দিলারাকে ক্ষণকাল বিহ্বল করে তুলেছিল। ক্ষণিকের জন্যে দিলারা বানুর বিস্মৃত সত্তা বখতিয়ারকে বেগানা বলে স্বীকার করতে ভুলে গেল। একান্তই আপনজনের মতো তিনি নির্দ্বিধায় চেয়ে রইলেন মুখোমুখী।

সুকঠিন বাস্তবের নিরন্তর তাড়নায় কয়েক লহমার মধ্যেই ফের চেতনায় ফিরে এলেন উভয়েই। চৈতন্য ফিরে পেতে উভয়েই অতিমাত্রায় চঞ্চল হয়ে উঠলেন। চোখ নামিয়ে বখতিয়ার খলজী পেছন দিকে সরতে গেলেন। দিলারা তাঁর ওড়নাটা গলা থেকে ক্ষিপ্রহস্তে খুলতে গিয়ে ফের তা আরো বেশী পেঁচিয়ে ফেললেন।

বখতিয়ার দরজার বাইরে পা বাড়াতেই দিলারা তাঁর ওড়নাটা মাথার উপর টেনে দিয়ে বললেন–এই যে শুনুন, যান কোথায়? আপনার নাস্তা।

থতমত করে ঘুরে দাঁড়িয়ে বখতিয়ার খলজী বললেন–না– মানে–

দিলারা বানু হাসিমুখে বললেন–শরমের যেটুকু বাকী ছিলো সেটুকুতো খতম হয়েই গেল। আর পালিয়ে গিয়ে লাভ কি?

ঃ জি?

ঃ নাস্তা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, আসুন–

এক কদম এগিয়ে বখতিয়ার ইতস্ততঃ করে বললেন–না, মানে–আপনি–

ঃ আমি কোন বাঘ ভাল্লুক নই।

ঃ জি?

ঃ আমি নিজে আপনাকে খাওয়াবো।

ঃ আপনি নিজে!

ঃ কেন, আমি কি অশুদ্ধ বা না জায়েজ কিছু?

ঃ ছি–ছি! তা নয়–

ঃ তা যদি না হয় তাহলে আসুন, শরম যখন ভেঙ্গেই গেল, তখন নিজেই আমি বসে থেকে খাওয়াই আপনাকে। দুদিন পর তো আর এ মওকা পাবো না।

ঃ কেন?

ঃ আমি এখানে থাকলে তো?

ঃ কোথায় যাবেন?

শ্বশুর বাড়ী। শুনেন নি– আমার সাদীর কথা কায়েমী হয়ে আছে?

ক্ষণিকের তরে বখতিয়ার কিঞ্চিৎ উদাসীন হয়ে গেলেন।

খেয়াল হতেই ফের বললেন–কায়েমী? কোথায়? নওশা কে?

ঃ কেন, ঐ যে একটা জ্যান্ত মানুষ খাচ্ছে দাচ্ছে আর বিনা কাজে হপ্তার পর হপ্তা ধরে এই মকানে গড়াগড়ি দিচ্ছে–দেখতে পান না কিছুই?

ঃ ও, ঐ খাঁ সাহেব?

ঃ জি না, সেরেফ খাঁ সাহেব নন, খান–ই–খানান।

ঃ সে তো ভাল কথা। সুখেই থাকবেন আপনি।

ঃ সুখেই থাকবো?

ঃ বাঃ! এমন ঘরে সুখে থাকবেন নাতো থাকবেন কোথায়?

দিলারা বানু ক্ষুব্ধ হলেন। এ জবাব তিনি আশা করেননি। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন–এমন ঘরে বিয়ে হলে আপনিও খুশী হবেন তাই নয়?

ঃ হ্যাঁ, হবোই তো।

ঃ হবেনই?

ঃ অবশ্যই হবো। না হওয়ার কোন কারণই নেই।

ঃ বটে। আপনিও তাহলে চান, আমার বিয়ে ওখানে হোক?

ঃ হ্যাঁ, চাই–ই তো। আপনি সুখে থাকবেন আর আমি তা চাইবো না?

আপনি আমাকে কত নেক নজরে দেখেন!

ঃ সেটা আপনি বোঝেন?

ঃ কোনটা?

ঃ আমি আপনাকে নেক নজরে দেখি?

ঃ জি, তা বুঝিই তো।

দিলারা বানু ক্রমেই উষ্ণ হয়ে উঠতে লাগলেন। ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললেন–আমার গরজ? আপনাকে নেক নজরে দেখার আমার গরজটা কি?

ঃ আপনি বড় সৎ আর দয়ালু, আপনার দীলটা বড় দরাজ মানে আপনি বড় দরাজদীল তাই!

ঃ দরাজদীলেরা সেরেফ একজনের প্রতি দরাজদীল হতে যাবেন কেন? দরাজদীল হলে তারা তো সবার প্রতিই দরাজদীল হবে। না কি হবে না?

ঃ জি তাতো হবেই।

ঃ দরাজদীলেরা এত দাস দাসী থাকতে নিজে এসে একজনকে নাস্তা খাওয়াতে যাবে কেন? খাওয়ালে সবাইকে খাওয়াবে?

ঃ হ্যাঁ, তাতো খাওয়াবেই।

ঃ সবাইকে এনে ভাল ঘরটায় তুলবে?

ঃ তা, ইচ্ছে করলে তুলতে তো পারেই।

ঃ আমিও তা পারি?

ঃ তা পারবেন না কেন?

ঃ তাহলে আপনার ধারণা–আমি সবাইকে এনে এই ঘরে তুলি?

ঃ জি?

ঃ সবার জন্যেই নাস্তা নিয়ে বসে থাকি? সবার পাশেই অহরহঃ ঘুরে বেড়াই, সবারই পথ চেয়ে দিনের পর দিন বসে থাকি? সবার, সবার, হিন্দুস্থানের, গজনীর, গরমশিরের–এ দুনিয়ার সবার?

ফেটে পড়লেন দিলারা বানু। হতবুদ্ধি বখতিয়ার হোঁচট খেয়ে বললেন–না, মানে–

ঃ মানে আমাকে এতটা অপমান করার সাহস আপনি কোথায় পেলেন?

ঃ অপমান।

ঃ হ্যাঁ–হ্যাঁ, অপমান। নিছক অপমান–

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন দিলারা বানু।

নিজেকে শান্ত করে নিয়ে খানিক পরেই দিলারা ফের ফিরে এলেন এ ঘরে। এসে তিনি দেখলেন–নাস্তা পানি ঐ ভাবেই পড়ে আছে, বখতিয়ার তার কাপড় চোপড় গুছাচ্ছেন। ফের মেজাজ বিগড়ে গেল দিলারার। ফের তিনি উষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন–এ সব কি?

মুখ তুললেন বখতিয়ার। রক্তের লেশমাত্র আর সে মুখে অবশিষ্ট নেই। কাঠপোড়া কয়লার মতো সে মুখ খানা কালো হয়ে গেছে। সে তপ্তকণ্ঠে বললো–প্রায় দুই দুইটে দিন হয়ে গেল, এখন আমার যাওয়ার দরকার।

ঃ যাওয়ার দরকার মানে? চলে যেতে চান?

ঃ জি।

ঃ উঃ!

দীর্ঘ একটা শ্বাস ফেললেন দিলারা। গুম হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। এরপর আফসোস করে বললেন আচ্ছা, দেহে যাদের প্রচুর বল থাকে, মাথায় কি তাদের বোধ শক্তি কিছুই থাকতে নেই?

ঃ মানে?

ফুঁশে উঠলেন দিলারা। বললেন, আপনি কি কিছুই বুঝতে পারেন না? আমি কি বলতে চাই তার একটা বিন্দুও কি মগজে আপনার ঢোকে না?

নীচের দিকে চোখ নামালেন বখতিয়ার। ক্ষণকাল নীরব থেকে ধীরে ধীরে বললেন–না বোঝার কি আছে?

ঃ বোঝেন?

ঃ জি, বুঝি।

ঃ কেন আমি রেগে তেতে বেরিয়ে গেলাম, সেটা বোঝেন?

ঃ আমি যে নীরেট একটা নির্বোধ এ ধারণাই বা কোথা থেকে হলো আপনার।

ঃ তাহলে তো আপনার পাশ দিয়েই গেলাম, কেন আমাকে আটকালেন না।

ঃ যা হবার নয়, তা করতে যাওয়া ঠিক নয়।

ঃ কি হবার নয়– কি করতে যাওয়া ঠিক নয়? কেন হবার নয়?

বখতিয়ার এবার সোচ্চার হয়ে উঠলেন। বলিষ্ঠ কণ্ঠে বললেন–দিলারা বানু বেগম, আপনার চেয়ে উচ্ছ্বাস বড় কম নেই আমার দীলেও। সুদূর অযোধ্যা থেকে দিওয়ানা মাফিক ঘোড়া ছুটিয়ে এই আজমীরে আমি এসেছি, দেওয়ান সাহেবের ইমারতের বাহার দেখার জন্যে নয়। কিন্তু আসার পর সব কিছু দেখে শুনে এবং গভীর ভাবে সোচ করে দেখে এখন বুঝতে পারছি–ভুল করেছি আমি। চরম একটা খামখেয়ালীর পেছনে

ছুটে বেড়াচ্ছি আমি। এটা ঠিক নয়, এটা উচিত নয়। দীল আমার জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেলেও আপনাকে পাওয়ার আশা করা আমার নির্বুদ্ধিতা, না-জায়েজ, অন্যায়। ঝোঁকের মাথায় এসেছি, শিগ্‌গির শিগ্‌গির সরে না পড়লে, আবেগের বশে হয়তো একটা অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি পয়দা হয়ে যাবে– যা আমার পক্ষে সেরেফ একটা নেমকহারামী একটা মস্ত বড় অন্যায়।

আবেগে আনন্দে এবং সবশেষে উৎকণ্ঠায় দিলারা তখন বিহ্বল। অত্যন্ত উৎসাহের সাথে প্রশ্ন করলেন তিনি– কেন, অন্যায় কেন?

ঃ আপনার জিন্দেগী বরবাদ করার কোন এক্তিয়ার নেই আমার। আপনি অবস্থাপন্ন খানদান ঘরের আওরত। প্রাচুর্যের মধ্যে, সুখ স্বাচ্ছন্দ্যময় পরিবেশে লালিত। আপনাকে আপনার যোগ্যস্থানে যেতে না দিয়ে, সেরেফ আবেগের দ্বারা প্রলুব্ধ করে আমার দীন দরিদ্র পরিবেশে আপনাকে টেনে নামানো শুধু অন্যায় নয়, অমাজনীয় গুনাহ!

ঃ আর আমি যে জিন্দেগী ভর মর্মদাহে তিলে তিলে দগ্ধ হয়ে খতম হয়ে যাবো এতে সেরেফ নেকীই হবে আপনার? কোন গুনাহ্‌ই হবে না?

ঃ দিলারা!

ঃ জান গেলেও ঐ উজিরজাদাকে খসম বলে কবুল করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এ বিয়ে হবে না।

ঃ হবে না।

ঃ কিছুতেই হতে পারে না।

ঃ তাহলে?

ঃ ঐ তবে তাহলে থাক। আপনাকে শুধু বাহাদুর বলেই এ যাবত আমি জেনেছি। আমি ভুল করেছি। আপনি যে এতটা বুঝদীল– এ যাবত তা বুঝতে পারিনি।

ঃ মানে!

ঃ আপনাকে যে অঙ্গুরীটা দিয়েছিলাম, সেটা কি আপনার কাছে আছে এখন?

ঃ আছে। কিন্তু কেন?

ঃ দিন, ওটা আমি ওয়াপস্ নেবো।

ঃ ওয়াপস্ নেবেন?

ঃ হ্যাঁ। কাজ আছে।

ঃ কিন্তু–

ঃ আগে দরকার হয়নি, এখন দরকার হচ্ছে।

বখতিয়ারের মুখ মন্ডলে আরো খানিক আঁধার নেমে এলো। ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে তিনি জেব থেকে বের করে সে অঙ্গুরীটা দিলারার হাতে দিলেন। দিলারা সেটা হাতে নিয়েই বললেন–আপনার হাতটা দেখি?

ঃ হাত!

ঃ হ্যাঁ, এই হাত।

খানিকটা জোর করেই বখতিয়ারের হাতটা টেনে নিয়ে অঙ্গুরীটা এক আঙ্গুলে পরাতে পরাতে দিলারা বানু ফের বললেন–এটা এখানে রাখার জন্যে আপনাকে দিয়েছি! বাহাদুরের মতো আর পাঁচজনকে দেখিয়ে বেড়ানোর জন্যে। ভয়ে জেবের মধ্যে লুকিয়ে রাখার জন্যে নয়।

ঠিক এই মুহূর্তে আরমান খাঁ দরজায় এসে দাঁড়ালেন। অঙ্গুরী পরিয়ে দিতে দেখে হাততালী দিয়ে তিক্তকণ্ঠে বললেন–মারহাবা! মারহাবা!

চমকে উঠে উভয়েই দরজার দিকে তাকালেন। আরমান খাঁকে দেখে দিলারা বানুও তিক্ত কণ্ঠে বললেন–আপনি এখানে?

আরমান খাঁ দাঁত পিষে বললেন–দিল্লীর দেওয়ান জনাব জান মোহাম্মদ সাহেবের শরীফা কন্যার আদব আখলাক দেখার জন্যে! তওবা–তওবা!

ঃ বটে! তাহলে তা দেখা হয়েছে?

ঃ অবশ্যই হয়েছে। স্বচক্ষে দেখলাম।

ঃ দেখা যখন হয়েছে, তখন আশা করি, আপনি এবার এখান থেকে চলে যাবেন?

ঃ তার মানে! আমি চলে যাবো আর আপনি তবু এখানেই থাকবেন?

ঃ থাকবো বলেই তো বলছি।

ঃ কিন্তু আমি তা থাকতে দিতে পারি না।

ঃ আপনি?

ঃ হ্যাঁ আমি। আপনি আমার হবু স্ত্রী। আপনাকে একজন খন্নাস আদমীর কাছে রেখে আমি কিছুতেই চলে যেতে পারিনে।

ঃ কিন্তু এই খন্নাস আদমীই আমার হবু স্বামী। তাঁকে ছেড়ে আপনার মতো একজন বেগানা আদমীর পরোয়া করাতো দূরের কথা, আপনাকে এখানে আর দাঁড়াতে দিতেও পারিনে।

আরমান খাঁ চীৎকার করে উঠলেন–দিলারা বানু–

দিলারাও মজবুত কণ্ঠে বললেন–ভুলে যাবেন না, এটা মাঠ নয়, মকান।

ওখান থেকে বেরিয়ে আরমান খাঁ ছুটে এলেন দেওয়ান সাহেবের কাছে। সব ঘটনা বয়ান করে প্রশ্ন করলেন–এসব কি?

দেওয়ান সাহেব অন্দর মহলে ছুটে এলেন। দিলারাকে নির্জনে ডেকে আরমান খাঁর অভিযোগ আগে শোনালেন। তারপর প্রশ্ন করলেন–ব্যাপার কি মা, এ সব সত্যি?

দিলারা বানু নিসংকোচে জবাব দিলেন–জি, হ্যাঁ আব্বাজান।

দেওয়ান সাহেব লা–জবাব হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর তিনি চিন্তিত কণ্ঠে বললেন–কিন্তু আরমানকে তাহলে এখন ফেরাবো কি করে?

ঃ তবু ফেরাতে তাকে হবেই আব্বাজান। তাকে কবুল করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

ঃ কিন্তু মা, ওরা মস্ত বড় লোক! ক্ষমতা শালী–বিত্তশালী–

ঃ আর বখতিয়ার কাঙাল– তাই?

ঃ না, কথাটা ঠিক তা নয়।

ঃ কথা তো এটাও হতে পারে না আব্বাজান যে, আমার রুচি–পছন্দ সব অর্থহীন হয়ে যাক আর আমার জিন্দেগীটা মিস্‌মার হয়ে যাক।

ঃ না–মানে–

ঃ এ ছাড়া আপনারই তো কথা–ধনী–গরীব বিচার হয় দীন দিয়ে, দৌলত দিয়ে নয়। তাহলে– তো বখতিয়ার ওদের চেয়ে অনেক গুণে অধিক দৌলতমান্দ আব্বাজান, কাঙাল তো নয়।

দেওয়ান সাহেব এক ধিয়ানে দিলারার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। সে দৃষ্টিতে রোষ নেই, বিরক্তি নেই, উৎকণ্ঠা নেই–আছে শুধু সীমাহীন প্রশান্তি। কিছুক্ষণ পর তিনি বললেন–আমিও দ্বিমত পোষণ করছিনে। কে শাক খায়, কে ঘি খায়, সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা, কে সুখে আছে। আমাকে ভুল বুঝোনা মা। তোমার রুচি এবং পছন্দ দেখে আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি। সত্যি কথা বলতে কি, আমার মামণির জন্যে বখতিয়ারের চেয়ে যোগ্য বর আজ পর্যন্ত নজরে আমার পড়েনি। কাঙাল বলে তুমি যদি না–খোশ হও, এই ভয়ে কথাটা আমি এ যাবত প্রকাশ করতে পারিনি। ইশ্‌! তোমার এই মনোভাবটা আগে যদি আঁচ করতে পারতাম, তাহলে আর ঐ দাম্ভিকদের আস্কারা দেই আমি।

দিলারা বানু বিহ্বল কণ্ঠে বললেন–আব্বাজান!

আরমান খাঁ এ প্রসঙ্গে দুসরাবার কথা বলতে এলে দেওয়ান সাহেব বললেন–সাদী হলো ইনসানের জিন্দেগীর সব–চেয়ে বড় সওদা। এখানকার কেনা কাটায় একটা ভুল একটা জীবন বরবাদ করে দেয়ার পক্ষে যথেষ্ট। দিলারা বানু সাবালিকা, ভালমন্দ বোঝে। সুতরাং আমি জোর করে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে তার জিন্দেগীটা বরবাদ করতে পারিনে।

মহারোষে ফুলতে ফুলতে উজিরজাদা দিল্লীর দিকে ছুটলেন। তিনি মকানে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন এবং একখানাকে সাত দুগুণে চৌদ্দ খানা করে দেওয়ান সাহেবের স্পর্দ্ধার কথা আব্বাজানকে শুনালেন। শুনে উজির সাহেব গর্জে উঠলেন– তবে রে!

সঙ্গে সঙ্গে তলব গেল দেওয়ান জান মোহাম্মদ সাহেবের কাছে। দেওয়ান সাহেব দিল্লীতে এসে হাজির হলে উজির বাহাদুর গোস্বাভরে বললেন–পানিতে বাস করে দেওয়ান সাহেবের কুমীরের সাথে লড়াই করার খাহেশটা হলো কিসে?

দেওয়ান সাহেব জিজ্ঞাসু নেত্রে বললেন–মানে?

ঃ আপনি নাকি আমার আওলাদের সাথে আপনার কন্যার সাদী দিতে অস্বীকার করেছেন?

ঃ না, মানে– মেয়ে আমার বেজায় কান্নাকাটি করছে। বিয়েতে কিছুতেই–

ঃ খামোশ!

হাত তুলে উজির সাহেব দেওয়ান সাহেবকে থামিয়ে দিয়ে বললেন–আপনার কথা আর আমি শুনতে চাইনে। এবার আমার কথা শুনুন। গজনীর শাহানশাহ আমার আত্মীয়–তা জানেন। গজনী থেকে কেন আপনাকে এই হিন্দুস্থানে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে, আর কেউ না জানলেও আমি তার সবটুকুই জানি। এই হিন্দুস্থানে এসেও আপনি শাহনাশাহর বিরুদ্ধে সেই সাবেক ষড়যন্ত্র পুরাদমে লিপ্ত আছেন, আপনার কন্যার পেয়ারের সেই সেপাইটি আসলে একটা গুপ্তচর, সেই সেপাইটাই আপনার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করছে–এই পয়গামটা যদি আমি এখন গজনীর শাহানশাহের কানে দেই, আপনার হালতটা কি দাঁড়াবে–তা একবার সোচ্ করে দেখেছেন?

কেঁপে উঠলেন দেওয়ান সাহেব। বললেন–কিন্তু এটাতো মিথ্যা! আর এটা যে মিথ্যা তা আপনিও জানেন।

ঃ মিথ্যা হোক আর সত্যি হোক, এই পয়গাম তাঁর কানে গেলে আপনার অবস্থা কি দাঁড়াচ্ছে, তাই আগে ভাবুন।

ঃ কিন্তু এতবড় অন্যায় আপনি করবেন?

ঃ আপনি আমার চোখে মুখে কাদা ছিটিয়ে দেবেন আর আপনাকে আমি রেহাই দেবো? বিয়ের কথাটা দরবারের তামাম লোক জেনে গেছে। এখন আপনি বেঁকে বসলে, এর বদলা আমি নেবো না?

ঃ জনাব!

ঃ আমি কছম খেয়ে বলছি, আপনি এ বিয়ে ভেঙ্গে দিলে, এ পয়গাম আমি শাহানশাহকে দেবোই।

ঃ দোহাই আপনার, দয়া করুন।

ঃ দয়া রহম নেই। আমার এই এক কথা–হয় বিয়েতে রাজী হবেন, নয় ওয়াপ্‌স গিয়ে আপনার পরিবারের সকলের জন্যে গুণে গুণে কবর খুঁড়বেন– যান–

গোস্বা ভরে উঠে গেলেন উজির সাহেব। দেওয়ান সাহেবের আকুতিতে এক বিন্দুও টললেন না। অতঃপর উজির সাহেবকে ধাওয়া করে জান মোহাম্মদ সাহেব পুনঃ পুনঃ হাতে পায়ে ধরলেন; কিন্তু ফল কিছুই হলো না। বরং ঐ এক জিদ ধরে তিনি দেওয়ান সাহেবকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন।

অদৃষ্টের পরিহাস! এই উজির সাহেবই একদিন রহম ভিক্ষে করে দেওয়ান সাহেবের পিছে পিছে কুকুরের মতো ঘুরেছেন। দেওয়ান সাহেবের রহম সেদিন না পেলে এ দুনিয়ার মুখ আর তিনি অতঃপর দেখতেন না। হঠাৎ বদলে গেল দৃশ্য। মোহাম্মদ ঘোরী মসনদে এলেন আর মোহাম্মদ ঘোরীর ইঙ্গিত কিছু থাক আর না থাক, তাঁর আত্মীয়ের সুবাদে একটা নজীরহীন অপদার্থ হয়েও উনি দিল্লী এসে উজির পদে উঠলেন।

এ ছাড়া পরিস্থিতিও দেওয়ান সাহেবের বিপক্ষে। প্রশাসনের সাময়িক ত্রুটিপূর্ণ বিন্যাসের কারণে উজির তার উপরওয়ালা। নইলে দরবারের শোভা হয়ে খামাখা বসে থাকা এক উজির দিল্লীর দেওয়ানের চেয়ে এমন কিছু আহামরি ব্যক্তিত্ব নয়।

পেরেশান দীলে স্বগৃহে ফেরার পথে দেওয়ান সাহেব ভাবতে লাগলেন–পরিস্থিতি অত্যন্ত মারাত্মক। এই উজিরের মতো অমানুষের পক্ষে এ কাজ করা মোটেই কিছু বিচিত্র নয়। বরং বিবেক আর দায়িত্ব কোন কিছুই না থাকায় এ ধরণের কাজই এদের একমাত্র কাজ। মোনাফেকী আর গাদ্দারী এই ধরণের লোকেরাই এ দুনিয়ায় এনেছে। যদিও নিছক মিথ্যা, তবু এই অভিযোগ পুনরায় মোহাম্মদ ঘোরীর কানে গেলে, একবার জানে না মারলেও এবার আর রেহাই তিনি দেবেন না। সরাসরি সপরিবারে কোতল করার হুকুম দেবেন।

অবশ্য, এ অবস্থায় তাঁকে বেশী দোষ দেয়া যাবে না। সত্যি হোক, মিথ্যা হোক মসনদ বিপন্ন হওয়ার কোন আশংকা কেউ জিইয়ে রাখতে পারেন না। নিতান্তই কোতল যদি নাও তিনি করেন, হিন্দুস্থান, গজনী–অর্থাৎ তাঁর রাজ্যের কোথাও আর স্থান হবে না দেওয়ান সাহেবের। বিষয়–বিত্ত পদ–পদবী হারিয়ে ভিন দেশে গিয়ে সপরিবারে পথে নামতে হবে। ফরমান আলীর সামনের এই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ–দরবার সহকারী মানেই অচিরেই সেই দরবারের উমরাহ–তামাম কিছু মেস্‌মার হয়ে যাবে। একটা মেয়ের আশা–আকাঙ্খার কিঞ্চিৎ হেরফেরের কারণে গোটা পরিবারের হয় মৃত্যু, নয় লোমহর্ষকর ভাগ্য বিপর্যয় ঘটবে।

এতটা ঠিক হতে দেয়া যায় না। দেওয়ান সাহেব দীলটাকে শক্ত করে ফেললেন। আর সুখ মেয়ের নসীবে সুখ থাকলে, আরমানের ঘরে গেলেও সুখেই সে থাকবে। আর সুখ নসীবে না থাকলে, বখতিয়ারও তাকে কখনও সুখী করতে পারবে না। দেওয়ান সাহেব

সিদ্ধান্ত নিলেন–দিলারাকে বুঝিয়ে ফল কিছু হবে না। ধরতে হবে বখতিয়ারকে। সে অত্যন্ত বিবেচক, সমঝাতে হবে তাকেই।

এদিকে, দেওয়ান সাহেবের মকানে খুশীর হাওয়া বইছে। খোদ দেওয়ান সাহেবই দিলারার জন্যে পছন্দ করেছেন বখতিয়ারকে। অতএব, বালামুসিবত তামাম কিছুই পরিষ্কার। খুশীর অফুরন্ত প্রবাহের মাঝে দিলারা আর বখতিয়ারের কয়েক দিন একটানা কেটে গেল। ভরে উঠলো বখতিয়ারের ভুখা–নাঙ্গা অন্তর। বখতিয়ারকে ঘিরে উল্লাসের আধিক্যে দিলারা বানু ফুলে ফুলে উঠতে লাগলেন। অদূর ভবিষ্যতের মধুময় এক স্বপনের সাগরে তনুমন ভাসিয়ে দিলেন দিলারা বানু বেগম।

অকস্মাৎ বজ্রপাত!বখতিয়ার উধাও। কক্ষটা শূন্য। বিছানার উপর আছে এক পত্র। তাতে লেখা–রুচি বদল করার ইরাদায় দুদিনের জন্যে আজমীরে এসেছিলাম। রুচিটা বদ্‌লে নিয়ে চলে গেলাম। সাদী করার খাহেশ কিছুমাত্র নেই আমার। ছিলও না কোনদিন। আমার এই জীবনের দুর্বার গতিপথে সাদী একটা জঞ্জাল–মস্ত বড় বিপত্তি। ওটা আমার অসহ্য। আপনি আপনার পথ দেখুন।

–বখতিয়ার।

ঘটনাঃ জান মোহাম্মদ সাহেব দিল্লী থেকে ওয়াপস্ এসেই বখতিয়ারকে নিরালায় ডেকে নিলেন। পরিস্থিতিটা আগাগোড়া বর্ণনা করে দুই হাতে বখতিয়ারের এক হাত চেপে ধরলেন। ঝর ঝর করে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বললেন–বাবা তুমি আমাদের বাঁচাও। নিশ্চিত ধ্বংস থেকে তুমি আমার পরিবারটা রক্ষে করো। তুমি সরে দাঁড়ালেই দিলারাকে সমৃঝে নিতে পারবো আমরা।

অসহায় দৃষ্টি হেনে আর্তের মতো চেয়ে রইলেন দেওয়ান সাহেব।

বখতিয়ারের সর্বাঙ্গ মূর্দার মতো ঠান্ডা হয়ে গেল। দীলটা তাঁর ফেটে ছিড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। বৃদ্ধের এই সকরুণ আবেদন আর আহাজারী উপেক্ষা করতে না পেরে রুদ্ধ কণ্ঠে–"আচ্ছা তাই হবে"–বলে অশ্বের লাগাম টেনে নিয়ে অশ্রুর তুফান তুলে দেওয়ান সাহেবের মকান থেকে বেরিয়ে গেলেন বখতিয়ার খলজী। দিলারার জন্যে রেখে গেলেন এক পত্র। দেওয়ান সাহেব ছাড়া দুস্‌রা কেউ জানলো না।

বখতিয়ারের পত্র পড়ে কক্ষের মধ্যে মূর্চ্ছা গেলেন দিলারা বানু বেগম।

অশ্বের পৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে আজমীর থেকে দিল্লীর দিকে ছুটতে লাগলেন বখতিয়ার। নিজের দীলের নিদারুণ–হাহাকার ছাপিয়ে দেওয়ান সাহেবের আখেরটা বড় বেশী

বাজতে লাগলো বখতিয়ারের অন্তরে। নিজেকে তিনি মস্ত বড় অপরাধী বোধ করতে লাগলেন। তাঁর জন্যেই হয়তো বা দেওয়ান সাহেবের পরিবারটা গোটাই মিস্‌মার হয়ে যাবে।

তাই, আরমান খাঁর সাথে সে নিজে গিয়ে সাক্ষাৎ করে মাফ–মাফী মেঙ্গে নিয়ে তাঁকে শান্ত করার জরুরত বোধ করলেন। দিলারা তাকে সাদী করতে চাইলেও তিনি এক জনের বাগদত্তাকে সাদী করতে অনিচ্ছুক–এ বার্তা আরমানকে নিজে গিয়ে পৌছে দিলে দেওয়ান সাহেবের উপর তাঁদের জুলুমটা হাল্কা হবে বিবেচনায় তিনি দিল্লীর দিকে ছুটতে লাগলেন।

বেখেয়ালে ছুটে চলেছেন বখতিয়ার। দীল তাঁর উদাস! ভাবহীন, অস্তিত্বহীন। দিল্লী শহরে প্রবেশ করতেই তাঁর সামনে পড়লো এক ভিস্তিওয়ালা। বখতিয়ারের দৃষ্টি তখন শূন্যে, কোনদিকেই খেয়াল নেই। যেমন তিনি ছুটছিলেন, তেমনি তিনি ছুটতে লাগলেন। ফলে, তাঁর অশ্বটা সামনের দিকে এগুতেই অশ্বের সাথে ধাক্কা লেগে ভিস্তিওয়ালা হুমড়ি খেয়ে রাস্তার উপর পড়ে গেল। মশকটা তার কাঁধ থেকে এক পাশে গড়িয়ে পড়লো এবং তামাম পানি রাস্তার উপর ঢেলে পড়লো। চারদিক থেকে ছুটে এল লোকজন।

ভিস্তিওয়ালার কাতরোক্তি কানে যেতেই ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরলেন বখতিয়ার। লাফ দিয়ে অশ্ব থেকে নেমে তিনি ভিস্তিওয়ালাকে টেনে তুললেন। তাকে টেনে তুলেই চমকে উঠলেন বখতিয়ার। তাঁর সর্বাঙ্গ থর থর করে কাঁপতে লাগলো। একি! এ যে ইওজ খলজী।

ইওজ খলজীও বখতিয়ারকে দেখে একদম কেঁদেই ফেললো ঝর ঝর করে। হতভম্ব বখতিয়ার ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন–দোস্ত্ তুমি এখানে?

কাফেলার সাথে ইওজ খলজী সরাসরি এসে দিল্লীতে হাজির হয়। কয়েকদিন সে বখতিয়ারকে নানা স্থানে তালাশ করে। সঙ্গে আনা পূঁজিটা ক্রমেই ফুরিয়ে যেতে দেখে রোজেকের তালাশেও সে বেপরোয়া ঘুরে বেড়ায় কয়েকদিন। শেষ অবধি একেবারেই রিক্ত হস্ত হয়ে পড়ায় এই ভিস্তিওয়ালার কাজটা সে যোগাড় করেছে কোন মতে।

বখতিয়ারের প্রশ্নোত্তরে ইওজ খলজী কাতর কণ্ঠে বললো–সবই নসীব।

একই রকম উদ্বেগের সাথে বখতিয়ার ফের প্রশ্ন করলেন ভাবী কোথায়? আমার ভাতিজা?

নিস্তেজ কণ্ঠে ইওজ খলজী বললো––শহরের বাইরে এক বস্তিতে।

ঃ কোথায় সে বস্তি? এসো –এসো এখনই আমি যাবো সেখানে।

ঃ কিন্তু–

ঃ কোন কিন্তু নেই। এসো–

ঃ এই মশকটা–

ঃ নিজের, না ধার করা?

ঃ নিজের।

ঃ ফিঁকে দাও। এসো জলদি–

ইওজকে অশ্বপৃষ্ঠে তুলে নিয়ে বখতিয়ার ফের ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। ইওজ খলজীর ইতিবৃত্ত শুনতে শুনতে তাঁরা নিতান্তই নোংরা ও তুচ্ছ এক বস্তিতে এসে হাজির হলেন।

বখতিয়ারকে দেখেই হুসনে আরা বেগম কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। তা দেখে বখতিয়ার খলজী বললেন–আল্লাহ তায়ালার কাছে শোকর গোজারী করেন ভাবী। একমাত্র তাঁরই রহমে আমাদের এই আচানকভাবে মোলাকাত ঘটে গেল।

চোখের পানি মুছে ফেলে হুসনে আরা প্রশ্ন করলো –আপনি এখন কোথায় আছেন ছোট মিয়া?

জবাবে বখতিয়ার বললেন–যেখানে আছি, সেখানেই আপনাদের শিগ্‌গির আমি নিয়ে যাবো ভাবী। কিন্তু আমি তো আপনাদের নিয়ে আসার জন্যে লোক পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। দেখা হয়নি তাদের সাথে?

ইওজ খলজী জবাব দিলো–কৈ, নাতো!

বখতিয়ার ফের প্রশ্ন করলেন–গরমশির থেকে কবে বেরিয়েছেন আপনারা?

জবাবে ইওজ খলজী যা বললো তাতে বখতিয়ার খলজী হিসেব করে দেখলেন–সেপাইরা পৌছার আনেক আগেই ইওজ খলজী সপরিবারে গরমশির ত্যাগ করে এসেছে। হিসেব মিলিয়ে দেখে বখতিয়ার ফের স্বগতোক্তি করলেন–কিন্তু সেপাইরা আমার গেল কোথায়? সীমান্তে আমি থাকতে তো ওয়াপ্‌স তারা আসেনি।

বখতিয়ারকে বিড় বিড় করতে দেখে ইওজ খলজী প্রশ্ন করলো–ব্যাপার কি দোস্ত? সেপাই, সীমান্ত–

ঃ ওসব পরে হবে। এবার এসোতো দেখি আমার সাথে।

প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও ইওজ খলজীর ছেলেটাকে অশ্বের পৃষ্ঠে চাপিয়ে দিয়ে বখতিয়ার খলজী ঘোড়ার লাগাম ধরে ইওজ ও হুসনে আরাকে সঙ্গে নিয়ে হেঁটে শহরের এক সম্ভ্রান্ত সরাইয়ে এসে উঠলেন। পরের দিন এক ফাঁকে তালাশ করে গিয়ে

আরমান খাঁকে সমঝিয়ে অনেকটা ঠান্ডা করে রেখে তার পরের দিন ইওজ খলজীদের সঙ্গে নিয়ে অযোধ্যার পথে পা বাড়ালেন বখতিয়ার।

সাত

হিন্দুস্থানে ইসলামের অগ্রগতি অযোধ্যাতক্ এসেই অনেকদিন থেমে রইলো। অযোধ্যার পূর্বদিকে আর ইসলামের ঝান্ডা দীর্ঘদিন এগুলো না। কোন মুসলমান বীর সৈনিকের জঙ্গী তৎপরতাও এ অঞ্চলে রইলো না। অযোধ্যার অধিপতি মালিক হুসাম উদ্দীন বিজিত অংশটুকুর হেফাজতি নিয়ে তখন পেরেশান। খাপ খোলা তলোয়ার হাতে সামনে এগুনোর সাহস এবং অবকাশ তাঁর বড় একটা ছিল না। অযোধ্যার পূর্বপাশে মগধ এবং মগধের চারপাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেশুমার হিন্দু মুলুক। মগধের এপারেই অযোধ্যার গাঁ ঘেঁষে অনেক গুলো সামন্ত মুলুক বিদ্যমান। হুসামউদ্দীনের জঙ্গী মেজাজ না থাকায় পূর্ব অঞ্চলের এই সমস্ত হিন্দু রাজাদের দীলে এই প্রত্যয় দানা বেঁধে উঠতে লাগলো যে, হিন্দুস্থানের বুকে মুসলমানদের হিম্মত এখন কমজোর হয়ে পড়েছে, তলোয়ার তাদের তামামই ভোঁতা হয়ে গেছে, জং ধরেছে তীর–বল্লমের ফলায়। এই মুহূর্তে একটা ঝড় ঝাপটা এলেই বা নিরন্তর আঘাতে জর্জরিত করলেই হিন্দুস্থানের মুসলমানেরা জানের ভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে হিন্দুকুশের ওপাড়ে।

পূর্বাঞ্চলের পাল, সেন এবং মগধের বৌদ্ধদের দীলেও এমনই একটা ভুল ধারণা জোরদার হয়ে উঠায় তারা অযোধ্যার পূর্বসীমানায় লাগাতার হামলা শুরু করে।

এই হামলাকারীদের মধ্যমণি যিনি তিনি গয়ার রাজা গোবিন্দ পাল। বিগত পালরাজাদের উত্তরসূরী গোবিন্দপাল এ সময়ে এ অঞ্চলে হুংকার ছেড়ে ফিরতে থাকেন। তাঁরই নেতৃত্বে ও উস্কানীতে অযোধ্যার সীমান্তবর্তী ভূখন্ডের ছোট ছোট রাজারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে অযোধ্যার সীমান্ত দেশে হামলা চালায় ও সীমান্ত এলাকা লুণ্ঠন করতে থাকে।

বখতিয়ার খলজী সীমান্ত রক্ষীর দায়িত্বগ্রহণ করার পর তার হুংকার শুনে হামলাকারীরা ঘাবড়ে যায় এবং কিয়ৎ কাল খামোশ থেকে এই সীমান্তরক্ষীর শক্তি সামর্থ্য পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। সেরেফ সীমান্ত রক্ষে করা ছাড়া এই সীমান্তরক্ষীর পক্ষ থেকে বাহিরাক্রমণের কোন আগ্রহ–উদ্যোগ না দেখে, তারা তাকে নিতান্তই হীনবল মনে করে এবং পুনরায় নব উদ্যমে হামলা শুরু করে।

বখতিয়ারের অনুপস্থিতির সময়ে এই নয়া হামলার আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং কয়েকদিনের মধ্যেই এটা এমন এক চরম আকার ধারণ করে যে হররোজ সকালে সীমান্তের বিভিন্ন স্থান থেকে বীভৎস লুটতরাজের খবর আসতে থাকে। রণ বিদ্যায় শিরান খলজীর হাত তখনও পুরোপুরি পাকেনি। তাই একা শিরান খলজী এই হামলার মোকাবেলায় পেরেশান হয়ে পড়ে এবং নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ায় আতংকগ্রস্ত সীমান্তবাসীদের মধ্যে বাস্তুত্যাগের প্রবণতা ব্যাপক হয়ে উঠে।

বখতিয়ার খলজী ওয়াপস্ যখন এলেন তখন সীমান্তে চরম আতংক বিরাজ করছে। হুসামউদ্দীনের নজর এদিকে নেই, সীমান্তরক্ষীর তাকত্ওএমন জোরদার কিছু নয়–এই রকম একটা ধারণা সীমান্তবাসীদের দীলে একদম শিকড় গেড়ে বসেছে। তারা এখন বাস্তুত্যাগে উন্মুখ।

অবস্থা দেখে বখতিয়ার খলজী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। এমনটি তিনি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারেন না। তিনি এখন দুর্ধর্ষ ও সুশৃঙ্খল এক বাহিনীর অধিপতি। নেতৃত্বের ত্রুটিই এই পরিস্থিতির কারণ, তাঁর সেনাবাহিনীর ব্যর্থতা কিছু নয়।

ওয়াপস্ আসার পর তামাম ঘটনা শুনে বখতিয়ারের মাথায় আগুন ধরে গেল। অন্তরে তার দাউ দাউ আগুন জ্বলছে অবিরাম। এখন তিনি মরিয়া। সামন্তদের বর্বরতার বিবরণ তাঁর দীলের আগুন মাথায় টেনে আনলো। অন্তরের দুর্বলতা অন্তরেই চাপা দিয়ে বখতিয়ার ফের দৃঢ় চিত্তে কর্তব্যের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। দাঁত ভাঙ্গা জবাবটা সঙ্গে সঙ্গে না পেলে পঙ্গুরও স্পর্ধা ক্রমে ক্রমে আকাশচুম্বি হয়ে উঠে। সামন্তরা বখতিয়ারের গর্জনটাই শুনেছে, তার থাবার জোর দেখেনি। তারা জানেনা, বখতিয়ার যখন কারো দিকে ধাবিত হন তিনি নিজে ধ্বংস না হওয়া তক্ সেই ব্যক্তির ধ্বংস রোধ হওয়ার বিন্দু আশাও নেই।

সন্তানসহ হুস্নে আরাকে শিরান খলজীর স্ত্রীর হাওলায় ন্যস্ত করে বখতিয়ার খলজী আক্ষেপের সাথে ইওজ খলজীকে বললেন–দোস্ত্, এই আমার জিন্দেগী। এমন এক জিন্দেগী বেছে নিয়েছি আমি, যেখানে তলোয়ারে জং ধরলে গো–ভাগাড়ে নিক্ষিপ্ত হওয়া ছাড়া দুস্রা কোন গতি থাকে না।

ইওজ ও তার স্ত্রীকে বখতিয়ার ইতিমধ্যেই তার বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন। বখতিয়ারের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে ইওজ খলজী বললো–দোস্ত্, বাহাদুরের তলোয়ারে জং কখনও ধরে না। গোভাগাড়ে ঠাঁই লাভ যার ঘটে, সে বুঝদীল, তলোয়ারে যার জং ধরে সে কাপুরুষ, বাহাদুর সে কোনক্রমেই নয়। দোস্ত্ আমার বাহাদুর। বুঝদীলের আঁক–আঁচড়ও তার মধ্যে নেই। কাজেই তার অসিতে জং ধরার প্রশ্নই কিছু উঠে না।

ইওজ খলজীর উৎসাহে বখতিয়ার খলজী চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। বললেন–আচ্ছা?

ঃ যে অবস্থা থেকে দোস্ত্ আমার আজ এই অবস্থায় উপস্থিত, তাতে তার বাহাদুরীর জুটি নেই। এখানে তার তলোয়ারে জং ধরার মওকাই আমি দেখিনে

ঃ দোস্ত্!

ঃ এমন গৌরবময় জিন্দেগীর অগ্রগতি থামিয়ে, এমন আলো ঝলমল সামনের পথ ত্যাগ করে পশ্চাতের অন্ধকারে এসে তলোয়ারে জং ধরাতে আগ্রহী যে উন্মাদ, সে উন্মাদ দোস্ত্ আমার নয়।

ইওজের প্রত্যয় দেখে বখতিয়ার খলজী সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন– তাহলে আশা করি, দোস্ত্ আমার অতঃপর এই জিন্দেগী কবুল করতে ইতস্ততঃ করবে না?

ইওজ খলজী হেসে বললো–বাহাদুরের দোস্ত্ কখনও কাপুরুষ হয় না। এ ছাড়া গরমশির ত্যাগ করে এই হিন্দুস্তানে এসেছি আবার সেই মোট টানার জন্যে নয়, ঝড় তুফানে ঝাঁপিয়ে পড়ে জিন্দেগীটা যাচাই করে দেখার জন্যেই।

আনন্দে লাফিয়ে উঠে বখতিয়ার খলজী বললেন–মারহাবা!

অতঃপর এক সময় শিরান খলজীকে ডেকে ইওজের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার পর বখতিয়ার খলজী শিরান খলজীকে বললেন–ভাই সাহেব যে বাহাদুর, বাঘের সাথে লড়াই করে এ পরিচয় দিয়েছেন। তবে মানুষের সাথে লড়াইয়ের কৌশলগত দিক সম্পর্কে ভাই সাহেব আমার এখনও কিছুটা অনভিজ্ঞ আছেন।

শিরান খলজী জিজ্ঞাসু নেত্রে চাইতেই বখতিয়ার ফের বললেন–ঐ সমস্ত খুদে রাজ্যের সামন্তরা এমন কিছু বাঘ নয়। তামামগুলোই ফেউ। সেরেফ আস্কারা পাওয়ার জন্যেই ফেউগুলো সব বাঘ সেজে আমার এলাকায় আতংক পয়দা করেছে।

শিরান খলজী বললো–আস্কারা শব্দের অর্থটা পরিষ্কার হলোনা উস্তাদ। আর একটু খোলাসা করে বললে–

ঃ আস্কারা মানে দুষমনদের স্বাধীনভাবে বিচরণ করার মওকা দেয়া?

ঃ মানে?

ঃ দুষমনদের নিরাপদে রেখে আপনি সেরেফ নিজের ঘরটা সামলানোর পদ্ধতি নিয়ে ছিলেন। ফলে, এ চালে এসে পাহারা দিতে দুষমনেরা ও চালে গিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। আপনিও যদি পাল্টা গিয়ে তাদের ঘরে আগুন ধরিয়ে দিতেন, তাহলে দেখতেন, দুষমনেরা সকলেই তখন পরের ঘর ফেলে রেখে নিজের ঘর রক্ষে করার তাকিদে মুক্ত–কচ্ছ দৌড়াচ্ছে।

শিরান খলজীর মুখমন্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললো সোবহান আল্লাহ! তাইতো! এ বুদ্ধি মগজে আমার একবিন্দু খেলেনি।

ঃ শান্তশিষ্ট গোবেচারা বোধে আর সম্প্রীতি বজায় রাখার ইরাদায় এই হাতের কাছের সামন্তদের গায়ে আমি হাত তোলার কথা একদিনও ভাবিনি। মারেঙ্গা তো গন্ডার, লুটেঙ্গা তো ভান্ডার, বাজুটা মজবুত হলে, এই নীতি মেনে চলবো–এই ছিল আমার মানসিকতা। কিন্তু বেয়াকুফেরা ফায়দা লুটতে এসে আমারই তকলীফটা লাঘব করে দিয়েছে।

ইওজ খলজী প্রশ্ন করলো–তকলিফ লাঘব করলো মানে?

জবাবে বখতিয়ার খলজী দীপ্ত কণ্ঠে বললেন–দৌলত চাই আমার। অফুরন্ত দৌলত আমার চাই। আমার বাঞ্ছিত সেই সেনাবাহিনী তৈয়ার করার প্রয়োজনে অপরিমিত অর্থ আমার চাই। ইচ্ছে ছিল–জায়গীরদারীর আয় থেকে দিনে দিনে গড়ে তুলবো সে বাহিনী। উর্বর এই কাঁচামাটির বুকচিরে তুলে আনবো সেই সম্পদ। কিন্তু সে তকলীফ করার জরুরত আর আমার রইলো না। আমার গায়ে হাত তুলে সহজ পথের সন্ধান দিয়ে আমাকে সে তকলীফ থেকে নাজাত দিয়েছে তারাই।

বখতিয়ার খলজীর দুই চোখ জ্বল জ্বল করে জ্বলে উঠলো। ইওজ খলজী তাজ্জব হয়ে বললো–দোস্ত!

ঃ আমার এলাকায় হাত দিয়ে একটা মুদ্রা নিয়ে গেছে যারা, আমার সে বাহিনী তৈয়ার করার খাতে এবার লক্ষ মুদ্রা তাদের ভান্ডারই যোগাবে।

অতঃপর শিরান খলজীকে লক্ষ্য করে বললেন–ভাই সাহেব

শিরান খলজী সোচ্চার কণ্ঠে বললো–জ্বি–

বখতিয়ার খলজী বললেন মানসিকভাবে তৈরী হয়ে নিন। দুষমনদের কিছুতেই আর ফুরসুৎ দেয়া যাবে না।

ঃ আমি দৈহিক ভাবেও তৈয়ার উস্তাদ। হুকুম পেলে যে কোন দন্ডে আমি কদম তুলতে সক্ষম।

ঃ বহুৎ আচ্ছা

বখতিয়ার তার কামরার দিকে এগুলেন।

দিল্লী থেকে অযোধ্যায় আসার পথেই ইওজ ও হুসনে আরা–উভয়েই দিলারা বানুর ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠে এবং তা জানার জন্যে কয়েকবার প্রশ্ন করে। প্রতিবারেই "পরে বলবো" বলে বখতিয়ার তাদের নিবৃত্ত করে রাখেন।

বখতিয়ারের আস্তানায় এসে হাজির হওয়ার পরের দিন তারা এক সময় বখতিয়ারকে ফাঁকে পেয়ে প্রশ্ন করলো–কৈ, দিলারা বহিনের ব্যাপারে কোন কিছুই তো এখনও আমরা জানলাম না? একবার ভাবলাম, বহিন বোধ হয় এই মকানেই আছেন। কিন্তু কৈ তাতো নেই?

সীমান্তের ব্যাপার নিয়ে বখতিয়ারের মন মেজাজ গরম ছিল। এর মাঝে ঐ একই প্রশ্ন আবার টেনে আনায় বখতিয়ার বড় বিব্রত বোধ করলেন। তিনি না খোশ কণ্ঠে বললেন–দোস্ত, দেখতেই তো পাচ্ছো, কি অস্থিরতার মধ্যে দিয়ে দিন কাটছে আমার! দিলারা বানুর চিন্তাভাবনা করার এখানে অবকাশ আমার কৈ?

ইওজ খলজী বললো–চিন্তা ভাবনা করার কথা তো আমরা কেউ বলছিনে দোস্ত। আমরা বলছি, হিন্দুস্থানে এসে তার সাথে আদৌ তোমার মোলাকাতটা ঘটেছে কি ঘটেনি।

বখতিয়ারের বুকটা আবার টন টন করে উঠলো। ঊষর জিন্দেগী তাঁর ঊষরই থেকে গেল–এ ব্যথাটা পুনরায় নাড়া দিয়ে উঠলো। অতিকষ্টে যে ক্ষতটা ঢেকে রাখতে চান তিনি সেখানেই এরা হাত দিচ্ছে বার বার। দিলারার পাকপবিত্র দীল আর তার অনুপম মহব্বত যেভাবে তিনি দুই পায়ে দলে দিয়ে এসেছেন, তার কি কাহিনী বখতিয়ার এদের বলবেন? যে মিথ্যাচার করেছেন তিনি, যে অমানুষিক আঘাত একটা নিষ্পাপ অন্তরে তিনি হেনেছেন, তাতে এ প্রসঙ্গে কথা বলার কোন মুখ আর আছে তাঁর?

ইওজ খলজীর প্রশ্নের কোন তাৎক্ষণিক জবাব বখতিয়ার খলজী তালাশ করে পেলেন না। খাণিকক্ষণ নীরব থেকে ধীরে ধীরে বললেন––জমিনে বাস করে, কি হবে ঐ আসমানের তারার সাথে মোলাকাতের প্রসঙ্গ টেনে!

হুসনে আরা বললো–মানে?

বখতিয়ার খলজী বললেন–এগুলো দূর থেকে দেখার জিনিস ভাবী, হাতের মধ্যে পাওয়ার বস্তু নয়।

ইওজ খলজী ব্যস্ত কণ্ঠে বললো এ্যাঁ মোলাকাত তাহলে হয়েছিল?

ঃ হ্যাঁ, হয়েছিল। ঐ যে বললাম, এগুলো সেরেফ দেখার বস্তু। অতি উর্ধ্বের পদার্থের মধ্যে অনেক বেশী জটিলতা দোস্ত। হাত বাড়ালে হাতে পাওয়া তো যায়ই না, তার উপর ফের তপ্ত পদার্থে মর্তের লোকের হাত লাগানোও সম্ভব নয়। তাতে হাতই শুধু পুড়ে না, দীলটাও ঝলসে যায়।

ইওজ খলজী বললো–তোমার বক্তব্য বড় জটিল হয়ে যাচ্ছে দোস্ত! একটু খোলাসা করে কি বলবে–ওরা এখন কোথায় আর কি অবস্থায় আছেন?

ঃ আজমীরের সুরম্য অট্টালিকায় সুখেই আছেন দেওয়ান সাহেব।

তবে–

ঃ তবে?

ঃ এক উজির জাদা খসম নিয়ে এই মুহূর্তে দিলারা বানু কি অবস্থায় আছেন, তা আমার পক্ষে বয়ান করা শক্ত।

ইওজ ও হুসনে আরা একসাথে চমকে উঠলো। উভয়েই ব্যস্তকণ্ঠে এক সাথে বললো–তার মানে! দিলারা বুবুর সাদী তাহলে ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে?

ভারাক্রান্ত দীলে বখতিয়ার খলজী বললেন–কথাবার্তা অনেক আগে থেকেই পাকা হয়ে আছে। বরপক্ষের যে আগ্রহ দেখে এসেছি–তাতে এ কয়দিনে হয়ে যাওয়ারই কথা।

ঃ সে কি!

স্বামী স্ত্রী দুইজনই আর্তনাদ করে উঠলো। রুদ্ধ কণ্ঠ পরিষ্কার করে নিয়ে বখতিয়ার ফের বললেন–তাই, দীল নিয়ে আর কোন কারবারই নেই আমার। তামাম কারবার আমার এখন তলোয়ার নিয়ে। কওমের খেদমতে জান কোরবান করা নিয়ে।

ইওজ খলজী ধরা গলায় বললো–দোস্ত্!

বখতিয়ার খলজী বললেন–বেঁচে থাকার জন্যে তো প্রত্যেক ইনসানেরই অবলম্বন চাই একটা। কওমের খেদমতে একটা বড় কিছু করার আমার আজন্মের সাধ। অবশ্য হৃদয়ের চাওয়া পাওয়ার সাধটুকুও জড়িয়ে ছিল তার সাথে। সেই হৃদয়টাই টুটে গেল। একদিক দিয়ে ভালই হলো ইয়ারা। কওমের খেদমতে এখন একনিষ্ঠভাবে আত্ম নিয়োগ করতে পারবো।

সকলেই নীরব হয়ে গেল। কারো মুখেই কোন কথা যোগালো না।

উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে কিছুটা ভগ্নোৎসাহ সেপাইদের সংক্ষিপ্ত তালিম দিয়ে বখতিয়ার ফের সতেজ করে তুললেন। অতঃপর সবাইকে একত্র করে নিয়ে বুলন্দ কণ্ঠে বললেন–ভাই সব, তলোয়ার তামাম কোষমুক্ত করুন। অনেক আঘাত ইতিমধ্যেই আমাদের উপর এসেছে। এবার বদলা নেবার পালা।

শুরু হলো বখতিয়ারের অভিযান। একটানা। অখন্ড। আতর্কিতে, অকস্মাৎ এবং অভাবনীয় ক্ষিপ্রতার সাথে বখতিয়ার তার পার্শ্ববর্তী সীমান্ত মুলুকের উপর হামলার পর হামলা চালাতে লাগলেন। মুলুকগুলি তছনছ করে আশাতীত গনীমাত বা বিজিত ধন সম্পদ সংগ্রহ করতে লাগলেন। বখতিয়ারের ক্ষিপ্রগতি আর তার সুশিক্ষিত সেপাইদের দুর্বার কৃপাণের মুখে হীনবল সামন্তরা বিলকুল অসহায় হয়ে পড়লো। বিরামহীন এই হামলায় মউত তাদের অবশেষে নিশ্চিত হয়ে উঠায়–তারা রাজ্য ছেড়ে পলায়ন শুরু করলো।

এতবড় প্রত্যাঘাত অযোধ্যা থেকে আসবে –এটা তারা কল্পনাও করেনি। এতবড় এক শক্তি যে ইতিমধ্যেই গড়ে উঠেছে সীমান্তে, এটা কিছুমাত্র আন্দাজ করতে পারলে, অযোধ্যার উপর হাত তোলার দুর্মতি তাদের হতো না। একে এই সামন্ত রাজাদের মধ্যে কোন সম্প্রীতি ছিল না, তার উপর গোবিন্দপালের মদদ যথা সময়ে না পৌঁছায়, বখতিয়ারের প্রচন্ড ও অপ্রতিরোধ্য হামলার মুখে রাজ্য ত্যাগ করা ছাড়া সামন্তদের কোন রকম গত্যন্তরই রইলো না। পর পর কয়েকটা সফল হামলার পর তুর্কী হামলার, বিশেষ করে বখতিয়ার খলজীর হামলার নামে পার্শ্ববর্তী হিন্দুরাজারা এতই আতংকগ্রস্ত হয়ে উঠলো যে, নাম মাত্র হামলাতেও হিন্দুরাজারা পলায়ন শুরু করলো এবং বখতিয়ারের পরবর্তী কোন হামলাই আর বাধার সম্মুখীন হলো না। ফলে, নির্বিঘ্নে ও অনায়াসে অযোধ্যার পূর্ববর্তী রাজ্য থেকে প্রভূত গনীমাত্ বখতিয়ার খলজী সংগ্রহ করতে লাগলেন।

একদিকে গনীমাত্ যোগাড় করণ ও অন্যদিকে গণীমাতের অর্থ দিয়ে বিরাট এক সেনাবাহিনী গঠন–এই দুই কাজ এক সাথে চলতে লাগলো। যদিও এই পর্যায়ে ধনদৌলত সংগ্রহ করা ছাড়া কোন রাজ্য জয়ের পরিকল্পনা বখতিয়ারের ছিল না, তবু ভাগবত ও ভিউলী এলাকার একান্ত সংলগ্ন এক সামন্ত মুলুকের মধ্যে তিনি চরণদ্বার নামের এক বিশাল ও সুরক্ষিত দূর্গ দেখতে পেলেন। সসৈন্যে গিয়ে নাম মাত্র হামালা করতেই চরণদ্বারের অধিপতি দূর্গ থেকে পালিয়ে গেল এবং চরণদ্বার বখতিয়ার খলজীর হস্তগত হলো।

এ ঘটনা বখতিয়ারের প্রাথমিক অভিযানের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। চারপাশের এলাকাটা শত্রু মুক্ত করে নিয়ে বখতিয়ার তার সদর দপ্তর মালীক হুসামউদ্দীনের মাটি থেকে সরিয়ে চরণদ্বারে পার করলেন। ক্ষুদ্র হলেও বখতিয়ার এখন এক স্বাধীন ভুমির অধিপতিতে পরিণত হলেন।

পার্শ্ববর্তী সীমান্ত রাজাদের দমন করার কারণে বখতিয়ারের বীরত্বের কথা চার দিকে ছড়িয়ে পড়লো। মালীক হুসাম উদ্দীন এ বীরত্ব দ্বীন ইসলামের বীরত্বরূপে গ্রহণ করলেন এবং সীমান্তের বিপর্যয় পূর্ণভাবে দূরীভূত হওয়ায় তিনি বখতিয়ারকে বাহবা দান করলেন। বখতিয়ারের এই খ্যাতির খবর শুনে চারদিক থেকে ভাগ্যান্বেষী মুসলমানেরা, বিশেষ করে বখতিয়ারের স্বগোত্রীয় খলজী সম্প্রদায়ের লোকেরা দলে দলে এসে বখতিয়ারের বাহিনীতে সামিল হতে লাগলো। গনীমাতের অর্থদিয়ে বিপুল সংখ্যক অশ্বক্রয় চলতে লাগলো এবং দেখতে দেখতে বখতিয়ার খলজীর ফৌজ বিশাল আকার ধারণ করলো।

যে দুইজন সেপাই ইওজ খলজীকে আনার জন্যে গরমশিরে গিয়েছিল, তারা এতদিনে ফিরে এলো। সঙ্গে এলো আলী মর্দান খলজী। গরমশিরে ইওজ খলজীকে না পেয়ে লোকমুখে ইওজদের গজনীর দিকে যাওয়ার কথা শুনে সেপাই দুইজন গজনীতে গমন করে এবং গজনীর শাহী ফৌজ এদের গুপ্তচর বিবেচনায় কয়েদ করে কয়েদ খানায় পূরে রাখে। দীর্ঘদিন কয়েদ খানায় থাকার পর নাজাত পেয়ে ওয়াপস আসার পথে আলী মর্দানের সাক্ষাৎ ঘটে এদের সাথে এবং এরা বখতিয়ারের লোক জেনে এবং বখতিয়ারের বর্তমান অবস্থার কথা শুনে আলী মর্দান এদের সঙ্গ নিয়ে চরণদ্বারে চলে আসে।

ইওজ খলজীকে চরণদ্বারে দেখে আলী মর্দান উল্লাসের সাথে বলে উঠলো–মার কেল্লা! আরে দোস্ত্, তুমি এখানে আর আমি কিছুই জানলাম না।

স্মিতহাস্যে ইওজ খলজী বললো–ইয়ে এক দিক্‌দারী কা দস্তান, দোস্ত্। বহুৎ তকলীফ করার পরই এই চরণ দ্বারে চরণ পড়েছে আমার। তোমার মতো এত সিধে ভাবেপড়েনি।

আলী মর্দান প্রশ্ন করলো–তার অর্থ?

ইওজ খলজী বললো নসীব তোমার খোলাসা তাই বিনা তকলীফেই দরিয়া পার হয়ে গেলে! কিন্তু আমার বেলায় তা ঘটেনি।

ইওজ তার তামাম কাহিনী বর্ণনা করে বললো–গরমশির থেকে আসার সময় তোমাদের কাউকে পেলাম না যে, বলে কয়ে আসি। গরমশিরে হিন্দুস্থান গামী কাফেলাও তখন পেলাম না। গজনীর দিকে রওনা হয়ে কাফেলা পাই এবং সেই কাফেলার সাথে সামিল হয়ে হিন্দুস্থানে আসি।

বখতিয়ার খলজী আলী মর্দানকে বললেন–তুমি কেন খামাখা এই তকলীফের মধ্যে এলে? আরাম প্রিয় লোক তুমি। আজীবন তোমার আরাম করার অভ্যাস। এত তকলীফ সইতে পারবে তুমি?

আলী মর্দানের মাথা নীচু হয়ে এলো। সে শরমিন্দা কণ্ঠে বললো––আর শরম দিয়োনা দোস্ত্। লাগাতার দীর্ঘদিন অনাহারে অর্ধাহারে কাটিয়ে সে অভ্যাস ছুটে গেছে আমার। ইদানীং আর গরমশিরের কোথাও মুখের জোরে রুটির যোগাড় হয় না। বড্ড কহর পড়েছে ওখানে। মানুষও খুবই চালাক চতুর হয়ে গেছে।

বখতিয়ার খলজী বললেন–তাই?

ঃ মেহনত ছাড়া মুখে কিছু উঠে না। কাজেই, 'এলেম' আমার ইতিমধ্যেই অনেকখানি হয়েছে।

ঃ আচ্ছা।

ঃ আর তাছাড়া তুমিই তো আমাদের সামনে নজীর খাড়া করেছো–বিনা শ্রমে বড় হওয়া যায় না। বিরাট কিছু হতে না পারলেও, ইযযতের সাথে বেঁচে থাকার খাহেশ কার দীলে না জাগে বলো?

বখতিয়ার খলজী খোশদীলে বললেন–যাক, শুনে খুশী হলাম যে, এতদিনে সুবুদ্ধি কিছু পয়দা হয়েছে দীলে তোমার।

তিন বন্ধুতে মিলন ঘটলো আবার। আলী মর্দানের পরিচয় হলো শিরান খলজীর সাথে। তিন ইয়ার অচিরেই চার ইয়ারে রূপান্তরিত হলো। বখতিয়ার তার সুবিশাল ফৌজকে সুশিক্ষিত করে তোলার পাশাপাশি সুনিপুণ প্রশিক্ষণে তার তিন ইয়ারকে সুদক্ষ* সৈন্যধ্যক্ষে পরিণত করায় আত্মনিয়োগ করলেন। সেনা সৈন্য হাতে পেয়ে বাইরের লোক বেঈমানী করতে পারে সন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ পদে তিনি বেছে বেছে সগোত্রীয় লোকদেরই নিয়োগ করতে লাগলেন। অখন্ড মনোবল, পরিশ্রম আর একাগ্রতার ফলশ্রুতিতে বখতিয়ার খলজী শিগিগরই এক বিশাল ও অপরাজেয় সেনাবাহিনীর মালীক হয়ে উঠলেন।

মহড়ার জন্যে সেপাইরা ছাউনী থেকে বেরিয়েছে। চার ইয়ার তৈয়ার হয়ে ময়দানের দিকে এগুচ্ছেনা। এমন সময় এক দ্রুতগামী অশ্ব এসে বখতিয়ারের সামনে থামলো। আরোহীটি বখতিয়ারেরই গোয়েন্দা বাহিনীর বার্তা বাহক। ছদ্মবেশে তার গোয়েন্দারা মগধের সুগভীরে ঢুকে গেছে।

বার্তা বাহক অশ্ব থেকে নেমে বখতিয়ারকে সালাম দিয়ে বললো–জনাব, বড় না–খোশ পয়গাম আছে।

বখতিয়ার খলজী বললেন–না–খোশ পয়গাম!

ঃ রাজা গোবিন্দপাল বিপুল এক বাহিনী নিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছেন।

বখতিয়ারের ললাটে কুঞ্চন দেখা দিলো। স্থির হলো তার দৃষ্টি। ধীর অথচ শানিত কণ্ঠে বললেন–গোবিন্দপাল!

ঃ জি–হাঁ, জনাব।

ঃ বটে!

ঃ ভেগেপড়া তামাম সামন্তরাজা গোবিন্দপালের নেতৃত্বে একত্রিত হয়েছে।

ঃ তার সৈন্য সংখ্যা?

ঃ সে তথ্য সঠিক এখনও পাওয়া যায়নি। তবে বাহিনী যে বিপুল–এটা জানা গেছে।

ঃ গোবিন্দপালের বিপুল বাহিনী কোথা থেকে এলো?

ঃ মগধের তামাম ফৌজ গোবিন্দ পালের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে জনাব। সাথে আছে সামন্তদের সেপাই আর বাঙ্গালার পুরো এক বাহিনী।

আবার ভাঁজ পড়লো বখতিয়ারের ললাটে। তিনি বললেন–বাঙ্গালার বাহিনী।

জবাবে বার্তা বাহক বললো–জি–হ্যাঁ। গৌড়ের সেন রাজা ভেলিয়াগড় দূর্গ থেকে পুরো একটা বাহিনী গোবিন্দপালের অধীনে আমাদের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছেন।

বখতিয়ারের দুই বাহু মুষ্টিবদ্ধ হলো। লোহার মতো শক্ত হলো পেশী। বললেন–হুঁ!

ঃ তারা গয়া ছেড়ে অনেক দূরে এগিয়ে এসেছে জনাব। এতক্ষণ হয়তো কম্পিলার কাছাকাছি এসে গেছে।

ঃ কম্পিলা। এতদূর এসেছে?

ঃ জি হাঁ জনাব। গয়া থেকে একটানা উত্তর দিকে এসে তারা পশ্চিম দিকে ঘুরে নদীর তীর বেয়ে বেয়ে কম্পিলার দিকে এগুচ্ছে।

ঃ আসুক। উপযুক্ত জবাব তাদের জন্যে তৈয়ার।

বার্তা বাহককে বিদায় করে বখতিয়ার তার বন্ধুদের উদ্দেশ্য করে বললেন–বন্ধুগণ, আর মহড়া নয়, এবার আসলী লড়াই সামনে। এ লড়াই অস্তিত্বের লড়াই। এলড়াই এ অঞ্চলে মুসলমানদের ভাগ্য পরীক্ষার লড়াই। টিকতে পারলে, এ এলাকায় দ্বীন ইসলাম টিকবে। না পারলে শুধু এখানে নয়, গোটা হিন্দুস্থানে আমাদের কওমের ভবিষ্যৎ মারাত্মকভাবে বিপন্ন হয়ে পড়বে। অতএব, সেই মোতাবেক সেপাইদের তৈরী করে তোমরা সবাই তৈয়ার হয়ে যাও–

ঝিলিক খেলে শূন্যে উঠলো বখতিয়ারের তলোয়ার। সঙ্গে সঙ্গে পেছনে তার বেশুমার তলোয়ারে আছাড় খেলো সূর্যের আলো। চার ইয়ারের অধীন চারভাগে ভাগ হলো বখতিয়ারের ফৌজ। মূল দলের সামনে রইলেন বখতিয়ার খলজী নিজে। দ্রুত অথচ সন্তর্পনে এগিয়ে চললো বখতিয়ারের বাহিনী।

গোবিন্দপাল তখনও এসে কম্পিলায় পৌছাননি। তবে আওয়াজ কিছু ভেসে আসছে দূর থেকে। বখতিয়ার তার বাহিনী নিয়ে এসে কম্পিলার ময়দানের এক কৌশলগত জায়গায় চারিদিক ঘিরে নিয়ে ওঁৎপেতে রইলেন। গোবিন্দপাল বাহিনী নিয়ে সেই জায়গায় পৌছামাত্র "আল্লাহু আকবর" আওয়াজ দিয়ে চারদিক থেকে বখতিয়ারের সেপাইরা বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো গোবিন্দ পালের ফৌজের উপর।

শুরু হলো লড়াই। প্রাথমিক আক্রমণেই যে আতংক পয়দা করলো বখতিয়ারের সেপাইরা, সেই আতংকেই গোবিন্দপালের অদৃষ্ট নির্ধারিত হয়ে গেল। বখতিয়ারের বাহিনী শুধু সুশিক্ষিতই নয়, তারা সংঘবদ্ধ ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ দল। ইমান তাদের দৃঢ়, লক্ষ্য তাদের স্থির। দ্বীন ইসলামের খেদমতে শহীদের সোওয়াব নিতে প্রত্যেকেই তারা উন্মুখ। ফলে, গতি তাদের দুর্বার, আঘাত তাদের অব্যর্থ।

পক্ষান্তরে, গোবিন্দপালের বাহিনী বিভিন্ন দিক থেকে আগত বিচ্ছিন্ন মানসিকতার হাওলাত করা সেপাই গোষ্ঠী। এদের অধিকাংশই সুবিধেবাদী। এদের কাছে জীবনটাই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান। জয় পরাজয়ের হিসেব–নিকেশ এদের কাছে মামুলী।

ফলে, প্রথমেই আঁতকে উঠে ঐ যে তারা কাত্ হয়ে পিছু হটতে শুরু করলো, সোজা হয়ে দাঁড়ানোর মতো সাহস আর তাদের হলো না বা সে মওকাও আর পেলো না। প্রচন্ড মারের মুখে ক্ষণকালের মধ্যেই গোবিন্দপালের বিপুল ফৌজের সিংহভাগই পলায়নের ব্যর্থ চেষ্টা করে লাশ হয়ে পড়ে গেল জমিনে আর বাদবাঁকীরা জান নিয়ে আতংকে গ্রস্ত অবস্থায় যে যেদিকে পারলো পড়িমরি ছুটতে লাগলো।

অসহায় গোবিন্দপাল সামন্তরাজাদের সাথে জান্ বাঁচানোর তাকিদে ছুটোছুটি করে মুষিকের মতো প্রাণ দিলো বখতিয়ার আর তার ইয়ারদের তলোয়ারের মুখে।

এক বেলার লড়াইয়ে অর্ধেক মগধ চলে এলো বখতিয়ারেরা দখলে। 'নারায়ে তকবীর'–বলে কম্পিলার ময়দানেই বখতিয়ার খলজী উড়িয়ে দিলেন দ্বীন ইসলামের ঝান্ডা। 'আল্লাহু আকবর' আওয়াজ দিয়ে বখতিয়ারের সঙ্গীরা অভিবাদন জ্ঞাপন করলো সগৌরবে উড্ডীয়মান পাক ইসলামের পতাকায়।

অভিবাদন জ্ঞাপনান্তে শিরান খলজী প্রশ্ন করলো–উস্তাদ, অতঃপর?

বখতিয়ার খলজী দীপ্তকণ্ঠে বললেন–সামনে বাড়ো–

ঃ উস্তাদ!

ঃ মগধ রাজ্যের এত ভেতরে এসেছি যখন, তখন মগধের ডেরা না ভেংগে ফিরবোনা।

সমস্বরে সমর্থন এলো–ঠিক ঠিক। সাপ মেরে লেজুর জিয়িয়ে রাখবো না। সামনে চলো–

ফের ছুটলো বখতিয়ারের বাহিনী। আসমান–জমিন ধূলি উড়িয়ে তারা একটানা দীর্ঘপথ অতিক্রম করে এলো। কত নগর–বন্দর–জনপদ সামনে পড়লো তাদের, কত শস্যভরা মাঠ, কত অনুর্বর প্রান্তর, কত পশুপালের চারণভূমি, কত পাল তোলা নদনদী, কত বাজার–গঞ্জ মঠ–মন্দির পেরিয়ে এলো তারা, কিন্তু কোথাও থেকে কোন প্রতিরোধ তাদের সামনে এলো না। বরং গোবিন্দপালের শোচনীয় পতনের পর ঐ তল্লাটে এমনই এক ভীতির সঞ্চার হলো যে, দুইজন অশ্বারোহীকে এক সাথে কোন পথে ছুটে আসতে দেখলেও তুর্কী ফৌজ এলো ভেবে রাজপুরুষ বা রনবিদরা লোকালয় ছেড়ে আতংকে বন জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করতে লাগলো। ফলে প্রত্যেকটি নগর বন্দরে বিনা বাধায় বখতিয়ার খলজী কওমী নিশান গেড়ে গেড়ে সামনের দিকে এগুতে লাগলেন। শোন এবং গোগরানদীর সংগমস্থলে এসে তাঁরা দক্ষিণ দিকে ঘুরলেন এবং একটানা গয়ার দিকে ছুটে চললেন।

আবার এক দীর্ঘপথ পেরিয়ে আসার পর হঠাৎ তাদের সামনে পড়লো চুতর্দিকে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা দুর্গবৎ এক উচুঁ ও সুরক্ষিত স্থান। সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়ালো বখতিয়ার খলজীর বাহিনী। এটি একটি দুর্গ এবং মগধের সেনাবাহিনীর কেন্দ্রীয় ঘাঁটি ধোধে তারা অসি উন্মুক্ত করে অতি সন্তর্পনে স্থানটিকে চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেললো। অতঃপর আল্লাহু আকবর আওয়াজ দিয়ে ক্ষিপ্র গতিতে সকলে এক সাথে দূর্গের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। কিন্তু অনেকক্ষণ যাবত অসি চালনা করার পরও তাদের বিরুদ্ধে একটা লোকও এলো না। বখতিয়ার তখন সদলবলে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং প্রবেশ করেই তাজ্জব বনে গেলেন। অভ্যন্তরে বেশ কয়েকজন মুন্ডিত মস্তক লোক আর গাদা গাদা কিতাব। যুদ্ধাস্ত্রের নাম গন্ধও নেই।

জিজ্ঞাসা করলে এদের একজন জানালো–এটি একটি বৌদ্ধ বিহার–অর্থাৎ বৌদ্ধদের আশ্রম বা সংঘ। সবাই তারা বৌদ্ধ ভিক্ষু। স্থানের নাম ওদন্তপুর আর এটি ওদন্তপুর বিহার।

বিনাযুদ্ধেই ওদন্তপুর বিহার সহ ওদন্তপুর এলাকাটি বখতিয়ার খলজীর হস্তগত হলো। বখতিয়ার এই জায়গাকে বিহার বলে অভিহিত করে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে কওমী ঝান্ডা উড়িয়ে ছিলেন। অতঃপর এই এলাকাটি বিহার বা বিহার শরীফ নামে পরিচিত হলো।

বখতিয়ারের তরবারি এখানেই কোষবদ্ধ হলো না। আরো খানিক এগিয়ে গয়া ও বুদ্ধগয়াসহ মগধ রাজ্য তামামটাই তিনি অধিকার করে নিলেন এবং প্রভূত গনীমাত্ তিনি হস্তগত করলেন। অতঃপর তিনি বিহার শরীফে সদরদপ্তর খুলে চরণদ্বার দূর্গ থেকে সদর দপ্তরের তামাম কিছু বিহার শরীফে পার করলেন।

বখতিয়ার খলজী সেরেফ একটা সেনানায়ক বা কোন ক্ষুদ্রভূমির অধিপতি আর নন এখন। এখন তিনি বিশাল এক ভূখন্ডের সর্বময় কর্তা।

বিহার শরীফের নয়া দপ্তরে বন্ধুবান্ধব ও সেপাই সেনা নিয়ে কয়েকদিন আরাম আয়েশের পর বখতিয়ার ফের ইয়ার বন্ধুদের নিয়ে পরবর্তী কর্মপন্থা নির্ধারণের ইরাদায় এক আলোচনায় বসলেন। গৌড়ের অধিপতি লক্ষ্মণ সেনের এই অযাচিত আঘাতের জবাব দেয়া প্রয়োজন–এই প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা শুরু হলো। আলাপ খানিক এগুতেই অন্দর থেকে ডাক পড়লো ইওজের। খানিক পরে ইওজ খলজী ওয়াপস্ এসে ডাক দিলো বখতিয়ারকে। বললো–দোস্ত্, তোমার ভাবী তোমাকে স্মরণ করেছে।

ইওজ খলজীর স্ত্রী হুসনে আরা বেগমকে মায়ের মতো শ্রদ্ধা করেন বখতিয়ার। তার আহবান উপেক্ষা করার তাকত্ তাঁর ছিল না। তিনি আলাপটা আপাততঃ এখানেই স্থগিত রেখে ইওজের সাথে অন্দর মহলে ছুটলেন।

বখতিয়ার খলজী অন্দরের এক বারান্দায় এসে বসলে, দরজার আড়ালে দাড়িয়ে কক্ষের ভেতর থেকে হুসনে আরা বেগম শক্ত কণ্ঠে বললো–ছোটমিয়া নাকি শুনছি এখনই আবার আর এক নয়া আর মারাত্মক–ঝুঁকিপূর্ণ অভিযানের চিন্তা ভাবনা করছেন? এটা কি তাঁর বাস্তবিকই অভিযান, না আত্মহত্যার প্রচেষ্টা–এটা জানার এখন গরজ দেখা দিয়েছে।

কিঞ্চিৎ তাজ্জব হয়ে বখতিয়ার খলজী স্মিতহাস্যে বললেন–এ কথা কেন ভাবী?

ঐ একই রকম শক্ত কণ্ঠে হুস্নে আরা বললো–যদি সত্যিই তা না হয়, তাহলে আমি তাঁকে আগে দায়িত্বশীল হওয়ার জন্যে অনুরোধ করবো। দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে তিনি প্রমাণ করুন, তিনি দায়িত্বহীন নন, এবং যখন খুশী তখনই জান দিতে পারেন না।

ঃ ভাবী!

ঃ ইসলামের বিজয় নিশান দূরে এবং আরো দূরে এগিয়ে যাক, এটা আমি দীলেপ্রাণে কামনা করি। আমার বাহাদুর ছোট মিয়ার খ্যাতিতে এ দুনিয়া ভরপুর হয়ে যাক, এটা আমার আন্তরিক কামনা। কিন্তু কোন দায়দায়িত্ব ঘাড়ের উপর না থাকায় উনি নির্দ্বিধায় অহরহঃ আগুনে ঝাঁপ দিতে যাবেন–এটা হতে দেয়া যায় না।

বখতিয়ার খলজী হেসে বললেন–আপনি কিন্তু কেবলই হেঁয়ালী করছেন ভাবী, কোন কথা খোলাসা করে বলছেন না।

ঃ আরো খোলাসা করে বলতে হলে বলবো–আপাততঃ আর অভিযান নয়, জানের শরিক করে একজন কাউকে ঘরে আনার পর আপনি পাহাড়–পর্বতের চূড়ায় উঠে নীচে লাফিয়ে পড়ুন, আপত্তি করতে যাবো না। তখন ভাববো, দায়িত্ব ঘাড়ে আছে দায়িত্বহীন নন, যা করছেন তিনি বুঝে সুঝেই করছেন।

ইওজ খলজী লাফিয়ে উঠে বললো–একদম কায়েমী কথা। ওসব টালবাহানা আর চলছেনা দোস্ত্। আগে দায়িত্ববান হতে হবে। দায়িত্ব ঘাড়ে চাপলেই ভারত্ববোধ আসবে। আর ভেতরে ভোরত্ববোধ নিয়ে যত বীরত্ব খুশী করে যাও, তামাম টুকুই দানাদার হয়ে উঠবে।

বখতিয়ার খলজীর ঠোঁটে তখন হাসির রেখা লেগেই আছে। বললেন–বাঃ! আমাকে নিয়ে আপনারা এই ঘরে বাইরে দুইজন সেরেফ মোজাকই করছেন না, মোজাকের কিসিমটাও চমৎকার।

ইওজ বললো–জি?

বখতিয়ার বললেন–তারিফ পাওয়ার যোগ্য।

হুস্নে আরার কণ্ঠস্বরে পরিবর্তনহ এলো না। বরং সে আরো গম্ভীর এবং ধারালো কণ্ঠে বললো-এটা কি আপনার দীলের কথা ছোট মিয়া? আপনার কি সত্যিই মনে হয় মোজাক করছি আমরা? বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন, আমি যা বলছি তা আপনি কিছুই বুঝতে পারছেন না?

বখতিয়ারের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। বিবর্ণ হলো মুখমন্ডলের রং। বললেন-ভাবী।

ঃ কেন আপনি আপনার এমন মূল্যবান জিন্দেগীটা বরবাদ করতে চান? আপনি জিন্দা থাকলে আমাদের এই কওমের আরো কত উপকার হতে পারে। এক জনের উপর গোস্বা করে পানির দামে কেন আপনি আপনার এই এত দামী জিন্দেগীটা বিকিয়ে দিতে চান?

বখতিয়ারের কণ্ঠ স্বর ভারী হলো। চাপা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন-আমার এই জিন্দেগীর আদৌ কি কিছু মূল্য আছে ভাবী?

ইওজকে আর ধরে রাখা গেল না। সে হাত পা ছুঁড়তে লাগলো। বললো-নেই মানে! নেই মানে কি? এক বাজারে বিক্রি কিছু না হলে কি তার তামাম কিস্মত ফুরিয়ে যায়? আর এক বাজারে দাম দিয়ে তা কেনে না কেউ? দিলারা বহিন আর তার বাপ মায়েরা মূল্য কিছু না দিলেও আমার এমন দামী দোস্তের দাম দেয়ার কি জন মানব এ দুনিয়ায় নেই? একবার হ্যাঁ করেই দেখো না?

আরো অধিক গম্ভীর হলেন বখতিয়ার। ক্লীষ্ট হাসির রেখা একটা অধরে তাঁর ফুটে উঠেই অদৃশ্য হয়ে গেল। তিনি বললেন-দীলটাকে আমার হাটবাজারের পণ্য বানিয়েই ছাড়লে দোস্ত্? ফেরী করে বেড়ানোর একটা দ্রব্যের সামিল করলে?

চমকে উঠলো ইওজ খলজী। বখতিয়ারের অনুভূতিটা আঁচ করেই সে খামোশ হয়ে গেল। হুস্নে আরা তবু কিছু বলার কোশেশ করতেই বখতিয়ার ফের বললেন-ভাবী, আপনি তো মেয়ে ছেলে! অন্ততঃ আপনার তো এদিকটা বেশী বোঝা উচিত।

লা-জবাব হয়ে গেলো হুস্নে আরা বেগমও। আর তার মুখ থেকে কোন শব্দ বেরুলো না। বুক থেকে বেরিয়ে এলো দীর্ঘ এক নিঃশ্বাস!

ইতিমধ্যেই বাইরে থেকে খবর এলো-অযোধ্যার শাসনকর্তা মালীক হুসামউদ্দীন সাহেবের লোক এসেছে পত্র নিয়ে। পত্র খানা বখতিয়ারের হাতেই সে দিতে চায়।

খবর পেয়েই বাইরে এলেন বখতিয়ার। পত্র বাহক সামনে এসে সালাম দিয়ে পত্র খানা হস্তান্তর করলো। হাতে নিয়ে ওখানে ঐভাবেই পত্রখানা পাঠ করলেন বখতিয়ার।

পত্র পাঠ অন্তে পত্র বাহককে বিদায় করে পত্রের বিষয়বস্তু তিনি ইয়ার বন্ধুদের শোনালেন।

মালীক হুসামউদ্দীন বখতিয়ারের এই বিজয়কে ইসলামের বিজয় বলে দুস্রাবার বখতিয়ারকে মোবারকবাদ জানিয়েছেন। বখতিয়ারের মাধ্যমে তৌহিদের বার্তা আরো দূরে ছড়িয়ে পড়ুক, তিনি খাস্‌দীলে এ আকাঙ্খা পত্রের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। সেই সাথে মালীক হুসামউদ্দীন তাকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন-হিন্দুস্থানে মুসলমানদের মূলশক্তি দিল্লীর তখ্‌ত্। কুতুবউদ্দীন আইবক তার প্রতীক। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ না রেখে বিচ্ছিন্ন ভাবে বখতিয়ারের এই অগ্রগতি বিপরীত প্রতিক্রিয়া পয়দা করতে পারে। বখতিয়ারকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে তিনিই বখতিয়ারের বিপত্তি হয়ে দাঁড়াতে পারেন। সেটা হবে হিন্দুস্থানে গোটা মুসলমান জাতির জন্য চরম এক দূর্ভাগ্য। অতএব, বখতিয়ারের উচিত অতি শীঘ্র তাঁর সাথে মোলাকাত করা এবং সদাচরণের মাধ্যমে তাঁর সম্প্রীতি ও দোওয়া আদায় করা।

নিতান্তই যুক্তিযুক্ত কথা। পত্রের বিষয়বস্তু শুনেই বখতিয়ারের ইয়ারেরা সমস্বরে বললো-হুসামউদ্দীন সাহেবের এই নেক নজরকে আমারা মোবারকবাদ জানাচ্ছি। তিনি অত্যন্ত সৎ ও যুক্তি সঙ্গত নসিহত দান করেছেন। দিল্লীর সাথে আমাদের আত্মঘাতী মনোমালিন্য হওয়া মানেই এ অঞ্চলে আমাদের সকলের জন্যে মস্তবড় এক লানত নাজেল হওয়া। সুতরাং আমরা মনে করি, যথাযথ সম্মানীসহ দোস্তের আমাদের অতিসত্বর সৌজন্য সাক্ষাতের জন্যে দিল্লী যাওয়া এখন একদম ফরয্।

দিল্লী। ফরমান আলীর দিল্লী! আরমান খাঁর দিল্লী! দিলারা বানুর শ্বশুরবাড়ী দিল্লী। বখতিয়ার খলজীর দীলটা ফের আনচান করে উঠলো। সেই সাথে কিসের একটা অদৃশ্য ও দুর্বোধ্য আকর্ষণ বখতিয়ারকে জোরদার টানে দিল্লীর দিকে টানতে লাগলো। প্রচুর ও আকর্ষণীয় উপঢৌকন সাথে নিয়ে পরের দিনই বখতিয়ার খলজী দিল্লীর দিকে অশ্ব ছুটিয়ে দিলেন। সঙ্গে রইলো কয়েকজন বাছাই বাছাই পাহারাদার।

আরমান খাঁর সাদী এখনও আটকে আছে। দিলারা বানুর আত্মহত্যার হুমকীর জন্যেই নয়। সাদীর দিনে তিনি হয়তো এ হুমকী বাস্তবায়নও করতে পারেন। কিন্তু সাদীটা আজও আটকে আছে অন্য কারণে। সেটা হলো-আরমানকে পাওয়ার যত অনাগ্রহই দীলারা বানুর দীলে থাক, আরমানকে পাওয়ার জন্যে খোদ আজরাইল আওয়ারা হয়ে উঠেছেন। আরমান আজ দীর্ঘদিন মৃত্যু শয্যায়।

ইওজদের নিয়ে দিল্লী থেকে বখতিয়ার খলজীর ওয়াপস যাওয়ার পর পরই রাষ্ট্রীয় এক অনুষ্ঠানে বাহাদুরী করে হাতীর দৌড়ে অংশ নেন আরমান খাঁ। বখতিয়ার খলজী তুচ্ছ একটা সেপাই। আরমান খাঁ তার চেয়ে অনেক বড় বাহাদুর–এমন একটা নজীর স্থাপনের খাহেশই তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে এই কাজে। কিন্তু দৌড় দিয়ে হাতীটি তাঁর কয়েক কদম না এগুতেই ছুটন্ত হাতীর পিঠ থেকে চিৎপটাং জমিনের উপরে গড়িয়ে পড়েন আরমান খাঁ এবং হাতীর পায়ে পিষ্ট হন। হাতীর পা সরাসরি তাঁর বুকের উপর না পড়ে এক পাঁজর ঘেঁষে পড়ায় তিনি তৎক্ষণাৎ ইন্তেকাল না ফরমায়ে আজরাইলের কাজটা ঝুলিয়ে রেখে দিয়েছেন এবং সেই থেকেই বিছানায় শুয়ে মউতের সাথে এনতার মল্লযুদ্ধ করছেন।

সুস্থ হয়ে উঠে নওশার সাজ পরিধান করার চেয়ে এখন তাঁর কাফন পরার সম্ভাবনাই অধিক। তবু আরমান খাঁর ওয়ালেদ উজির সাহেবের বড় খাহেশ–ছেলেকে তিনি সুস্থ করে তুলবেনই এবং দেওয়ান জান মোহাম্মদ সাহেবের অনিন্দ সুন্দরী কন্যা দিলারা বানুর সাথে তিনি আওলাদের সাদী দেবেনই।

আরমান খাঁ মরেও না, পথ ছেড়েও দাঁড়ায় না–এমনই এক অবস্থার মধ্যে ঝুলে আছেন দেওয়ান জান মোহাম্মদ সাহেব। উজির সাহেবকে না–খোশ করার ভয়ে দিলারা বানুর ব্যাপারে দুসরা কোন সিদ্ধান্ত তিনি গ্রহণ করতে পারছেন না। এমনিতেই উজির সাহেব কথায় কথায় গজনীর হাঁক হাঁকেন, তার উপর তাঁর আওলাদের এই দুর্দিনে হবু জামাইকে নিয়ে ব্যস্ত হওয়ার পরিবর্তে অন্য কাউকে জামাই বানানোর খাহেশ প্রকাশ করলে, উজির সাহেব নির্ঘাত গজনীতে ছাউনী ফেলে সুলতানের বিরুদ্ধে দেওয়ান সাহেবের ষড়যন্ত্রের আজগুবী সেই কাহিনী ডংকা পিটে জাহির করতে থাকবেন।

এদিকে দিলারা বানুর অবস্থা দীর্ঘদিন বড় নাজুক হয়ে থাকে। বখতিয়ারের দুর্বোধ্য ঐ আচরণের ফলে তিনি তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছা যান এবং মূর্চ্ছা ভঙ্গের পর একদম খামুশ হয়ে যান। কারো সাথে দীল খুলে কথাও আর বলেন না।, ঘর ছেড়ে বাইরেও তেমন আসেন না। পানাহার তো মোটামুটি ছেড়েই দেন প্রথম দিকে। অনেক সাধ্যি-সাধনার পর হয়তো কখনও কিছু মুখে একটু তোলেন, কখনও বা কিছুই মুখে দেন না। নিষ্প্রাণ হয়ে দিনরাত শুয়ে থাকেন একা একা। খোলাজানালায় চোখ লাগিয়ে কখনও বা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন বিষাদ ও বিষণ্ণতার পটে আঁকা মূর্তির মতো।

হাজেরা বিবি দিল্লীতে তাঁর স্বামীর কাছে আসার পর অবস্থা আরো সংকটজনক হয়ে উঠে। একান্তই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ায় তার বিষন্নতা অসুস্থতার মোড় নেয়। বিছানা

থেকে আর তিনি উঠেনই না। আহারেও একদম রুচি হারিয়ে ফেলেন। স্বভাবতঃই দিলারা বানু জেদী। এই ঘটনা ও একাকিত্বের কারণে তাঁর মেজাজ ক্রমে এতই খিট খিটে হয়ে উঠে যে, তাঁর কাছে ভয়ে কেউ এগুতেই সাহস পায় না।

নিরুপায় হয়ে দেওয়ান সাহেব হাজেরাকে সংবাদ দেন। হাজেরা এসে দিলারাকে দিল্লীতে নিয়ে আসেন। এখন তিনি অনেক খানি সুস্থ। হাজেরার সঙ্গ আর নয়া পরিবেশ পেয়ে দিলারা এখন অনেকখানি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছেন। মাঝে মাঝে কিছুটা আনমনা থাকলেও, এখন তিনি কথা বলেন, গল্পগুজব করেন, মাঝে মাঝে হাসি ঠাট্টাতেও যোগদেন।

সেদিন পূর্ণিমা। আকাশ সুনির্মল। সাঁঝওয়াক্তের সাথে সাথেই সোনালী বলের মতো পূর্ণিমার ভরা চাঁদ পূর্ব আকাশে রাশি রাশি রং ঢালতে লেগেছে। সূরুজের লালীমা পশ্চিম আকাশ দখল করে থাকলেও পূর্ব আকাশে চাঁদ তার আধিপত্য বিস্তার করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

মাগরিব নামাজ পড়ে উঠেই দিলারাকে সাথে নিয়ে হাজেরা বিবি ছাদে এসে বসলেন। কথায় কথায় বললেন–আচ্ছা বহিন, বখতিয়ার ভাই কি যাওয়ার আগে ক্ষণিকের জন্যেও একবার দেখা করেননি আপনার সাথে?

দিলারা বানু নিঃশ্বাস ফেলে বললেন–বড় দুঃখ তো এখানেই। কি তাঁর অভিযোগ, কি তাঁর অসুবিধা–যাবার আগে সাক্ষাৎ করে এ সব যদি রাগ করেও বলে কয়ে যেতেন, তাহলে আজ নিজেকে সান্ত্বনা দেয়ার রাহা খুঁজে পেতাম। কিন্তু ব্যাপারটা একেবারে গায়েবী হয়ে রইলো।

ঃ তিনি যে এইভাবে চলে যেতে পারেন, কোনদিন কোন কথার মধ্যেও কি এমন আভাস দেননি তিনি, বা আপনিও কিছু আঁচ করতে পারেননি?

ঃ না,কিছু মাত্র,না।

একটু ইতস্ততঃ করে হাজেরা বিবি বললেন–আচ্ছা বহিন, অনেক বারই তো তাঁর সাথে কথা বলেছেন আপনি, তাঁর কোলে কাছেও গেছেন। তাঁর পত্রে তিনি যে ইঙ্গিত দিয়েছেন–অর্থাৎ তাঁর আচরণ দেখে আপনার সত্যিই কি মনে হয়–তিনি একজন অসচ্চরিত্রের লোক, তাঁর আদব আখলাক–

তীব্র প্রতিবাদ করে হাজেরাকে থামিয়ে দিলেন দিলারা বানু। বললেন–না–না, না–ভাবী, তাঁর সম্বন্ধে এমন মনোভাব পোষণ করলে গুনাহ্ হবে।

ঃ মানে!

ঃ ভাবী, সেই প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত আমি তাঁর সাথে অন্তরঙ্গভাবে মিশেছি। এমন শরীফ আর এতটা পাকদীলের মানুষ এ জিন্দেগীতে দুস্রাটি আমি দেখিনি। অথচ সেই মানুষ–

দিলারা বানুর চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে আঁসু ঝরে পড়লো।হাজেরা বিবি অপ্রতিভ হয়ে বললেন–আচ্ছা, আচ্ছা। ওসব কথা থাক এখন।

ঠিক এই সময় রাস্তা থেকে উচ্চ কণ্ঠে আওয়াজ এলো, লড়াই–লড়াই! জব্বোর লড়াই। আগামী কাল সকালে শাহী মহলের সামনের উন্মুক্ত ময়দানে মানুষের সাথে লড়াই হবে পাগলা হাতীর। হাতী–মানুষের লড়াই! এ লড়াই উপভোগ করার জন্যে নগরবাসী সকলকে দাওয়াত করা যাইতেছে। জেনানাদের জন্যে পৃথক ব্যবস্থা আছে। আসুন–আসুন, জব্বোর লড়াই। মগধের বাহাদুর বখতিয়ার খলজীর সাথে পাগলা হাতীর লড়াই। হাতী মানুষের লড়াই–

এলানটি সামনের দিকে এগিয়ে গেল। দিলারা বানু চীৎকার করে উঠলেন– নাঃ–

হতভম্ব হাজেরা বিবি বললেন–এ্যাঁ সেকি! বখতিয়ার খলজী! তাহলে উনিই তো– মানে উনিইতো–

দিলারা বানু আর্তনাদ করে বলতে লাগলেন–মেরে ফেলবে, মেরে ফেলবে, হাতী ওঁকে মেরে ফেলবে ভাবী, ওকে বারণ করুন।

হাজেরা বিবিও দিশেহারা হয়ে বলতে লাগলেন–তাইতো! সে কি কথা! উনি এখানে কোথা থেকে এলেন? এটা উনি কেন করতে যাচ্ছেন?

হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ফিরলেন ফরমান আলী সাহেব। ছাদের উপর কথা শুনে তিনিও ছাদের উপর আসতেই হাজেরা বিবি বললেন–এসব কি শুনছি?

খবর শুনে ফরমান আলীও চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি চিন্তিত ভাবেই বললেন–তাইতো, ব্যাপারটা সত্যি জটিল!

চমকে উঠে দিলারা বানু বললেন–মানে

ফরমান আলী বললেন–মানে এই বখতিয়ারই আমাদের সেই বখতিয়ার। বখতিয়ার নাকি মগধ জয় করেছে। বাহাদুর বটে সত্যিই। মগধ জয় করেই সে দিল্লীর দরবারে এসেছে। আজ আমি দরবারে হাজির ছিলাম না। আর এরমধ্যেই ঘটে গেছে ব্যাপারটা।হাজেরা বিবি বললেন–কি রকম?

ঃ শুনলাম, খোদ হুজুরে আলার নির্দেশেই এটা হচ্ছে। এ লড়াইয়ের উদ্যক্তা খোদ জনাবে আলা কুতুবউদ্দীন আইবক।

সঙ্গে সঙ্গে দিলারা বানু উতলা হয়ে বললেন–বন্ধ করুন ভাইজান, এলড়াই বন্ধ করুন। ওঁকে লড়াই লড়তে নিষেধ করুন!

ফরমান আলী সাহেব অসহায় কণ্ঠে বললেন–তা কি করে সম্ভব! খোদ কুতুব উদ্দীন আইবকের আনযাম! আমার কি তাকদ আছে সে আনযাম বন্ধ করার। আর বখতিয়ারকে এখন আমি পাবোই বা কোথায় যে তাকে আমি নিষেধ করবো? খোদ দিল্লীর মালীকের হুকুমে কোথায় তাকে রাখা হয়েছে, সে হদিসই বা পাই আমি কি করে, আর আমার নিষেধে কাজই বা হবে কি?

কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে দিলারা বানু বললেন–ভাইজান–

বখতিয়ার খলজীর অজ্ঞাতেই দিল্লীর দরবারে বখতিয়ারের অনেক দুষমন ইতিমধ্যেই পয়দা হয়ে গিয়েছিল। জবরদস্ত সালাররা আর দিল্লীর পালোয়ানরা যে কৃতিত্ব হাসিল করতে পারেন নি, তুচ্ছ একজন ভবঘুরে সেপাই তা করবে, দরবারের বাহাদুররা এটা বরদাস্ত করবেন কোন মুখে? তাহলে তাদের মান থাকে, না উঁচু শির উঁচু থাকে?

ফলে, সবাই এরা আগে থেকেই বখতিয়ার খলজীর উপর চরম না–খোশ ছিলেন। এবার তার উপস্থিতির কথা শুনে সবাই এঁরা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। ষড়যন্ত্রে নেতৃত্ব দিলেন আরমান খাঁর ওয়ালেদ রাজস্ব মন্ত্রী এবং দিল্লীর পেশ আরিজ।

এই আরিজ যে বখতিয়ারকে একটা সেপাইয়ের পদেরও যোগ্য মনে করেন নি– এটা ইতিমধ্যেই প্রকাশ পেয়ে গিয়েছিল। কাজেই, বখতিয়ারকে অপদস্ত করতে না পারলে, দিল্লীর মালীকের কাছে নিজেরই তাঁর অপদস্থ হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা।

রাজস্ব উজিরের ক্ষোভটা দিলারাকে কেন্দ্র করে। পুত্রের যে প্রতিদ্বন্দ্বি তার সুখ্যাতি কম পিতারাই সইতে পারেন। রাজস্ব উজিরের মতো হীন মনের লোকতো এটা পারেনই না কিছুতেই।

বখতিয়ারের আগমন বার্তা পেয়েই তাঁরা কুতুবউদ্দীন আইবককে সমঝালেন– বখতিয়ার নামের এ লোকটা আসলেই একটা ফেরেববাজ! হুজুর তাঁর চেহারা দেখলেই বুঝতে পারবেন, বাহাদুর সে জাররা মাত্রও নয়। ঘোলা পানিতে মাছ ধরে সে বাহাদুরের নাম কিনতে এসেছে। হুজুর যে এক সময় মগধজয়ে যাত্রা করতে চেয়েছিলেন–ঐ খবর শুনেই মগধরাজ সহকারে ঐ এলাকার তামাম রাজ–রাজারা আতংকে সৈন্য সামন্ত নিয়ে বাঙ্গালা মুলুকে চলে গেছে। সেই থেকে ও এলাকা লা–ওয়ারিশ পড়েছিল। মওকা বুঝে কয়েকজন ভবঘুরে সঙ্গী সাবুদ নিয়ে এ ব্যাটা গিয়ে ঐ এলাকায় বিজয় নিশান উড়িয়ে দিয়ে কিছু গৃহস্তের ধন সম্পদ লুট করে নিয়ে হুজুরকে ধোঁকা দিতে এসেছে। অতএব হুজুর, এই ধোঁকাবাজের বাহাদুরী পরীক্ষা করা হোক।

মতলব বাজেরাই পরীক্ষার পথটাও সেই সাথে বাতলিয়ে দিলেন। তাদের উদ্দেশ্যে বখতিয়ার খতম হয়ে যাক। তাঁরা জানালেন, হস্তিশালায় কয়দিন হলো সদ্য আনা

একটা বুনো হাতী ভয়ানক ক্ষীপ্ত হয়ে উঠেছে। সামনে যে যাচ্ছে তাকেই সেই হাতীটা তুলে আছাড় মারছে। কয়েকজন মাহত ইতিমধ্যেই ঐ হাতীর কবলে প্রাণ দিয়েছে। বখতিয়ার কেমন বাহাদুর ঐ হাতীর সামনে দাঁড়িয়ে তা প্রমাণ করুক।

সেরেফ অনেক লোকেরই নয়, দরবারের সেরা সেরা ব্যক্তিবর্গের সুপারিশ! দিল্লীর মালীক সাদরে তা গ্রহণ করলেন। বললেন–তাই হবে।

বখতিয়ার খলজী তাজিমের সাথে দরবারে প্রবেশ করে উপঢৌকনের দ্রব্যাদি হুজুরে আলা কুতুবউদ্দীন আইবকের সামনে বাড়িয়ে ধরতেই হুজুরে আলা তাকে হাত তুলে থামিয়ে দিয়ে বললেন–থাক, তুমি যে সত্যিই একটা বাহাদুর, এটা প্রমাণ করতে পারলে, তবেই ওগুলো কবুল করবো আমি!

অতঃপর বখতিয়ারকে এক কক্ষে আটক করে রেখে এই হাতী মানুষের লড়াইয়ের আয়োজন করা হলো এবং বখতিয়ারকে সে বিষয়ে অবহিত করা হলো।

পরের দিন সবেরেই শাহী মহল সংলগ্ন বিশাল ময়দানটা লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। ময়দানের একপাশে বিরাট এক মঞ্চ তৈরী হয়েছে। সভাসদদের সাথে নিয়ে দিল্লীর শাসনকর্তা কুতুবউদ্দীন আইবক এসে মঞ্চের উপর আসন গ্রহণ করলেন। মঞ্চের সামনে বিরাট বিরাট লৌহদন্ডের বেড়া বিশিষ্ট গোলাকার ও প্রশস্ত এক খোয়াড় বানানো হয়েছে। এই খোয়াড়ের মধ্যেই লড়াই হবে হাতীর সাথে মানুষের। সেই খোয়াড়ের সাথেই অনুরূপ লৌহদন্ড পুঁতে অতিক্ষুদ্র দ্বার বিশিষ্ট ক্ষুদ্র এক খাঁচা তৈরী হয়েছে। একটা হাতী কোন মতে প্রবেশ করতে পারে এই রকমই দ্বারটা এই খাঁচার। খাঁচার দ্বারে লোহার শিকের পাল্লা লাগানো হয়েছে। পাল্লা এখন খোলা আছে। এই ক্ষুদ্রকায় খাঁচার মধ্যে তুলতে হবে হাতীটাকে।

পুরো একটা বাহিনী মিলে নেজা–বল্লম–ফালা–সরকী প্রয়োগ করে হাতীটাকে ছেঁদে বেঁধে কোন মতে খোয়াড়ে এনে তুললো। খোয়াড়ে উঠে হাতীটি আরো অধিক মত্ত হয়ে উঠে বিপুলবেগে লাফালাফি ও গর্জন শুরু করলো।

খোয়াড় থেকে অল্পদূরে সুরক্ষিত ঘেরার মধ্যে জেনানারা বসেছেন। জেনানাদের সামনের কাতারে বসে হাতীটার বিক্রম দেখে দিলারা ও হাজেরা বিবি থর থর করে কাঁপতে লাগলেন।

কোষমুক্ত তলোয়ার হাতে খোয়াড়ের মধ্যে প্রবেশ করলেন বখতিয়ার। সঙ্গে সঙ্গে দর্শক কুলের শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল।

সামনে মানুষ দেখেই পাগলা হাতী বিকট আকৃতি ধারণ করে ঝড়ের বেগেবখতিয়ারকে ধরতে এলো। "হায়–হায়" আওয়াজ দিয়ে দর্শককুল চক্ষু বন্ধ করলো। দিলারা বানু তখন প্রায় অজ্ঞান।

কিন্তু বখতিয়ার তৎক্ষণাৎ বিদ্যুৎ বেগে সরে দাঁড়িয়ে হাতীর শুঁড়ে তলোয়ারের ঘা মারলেন। যন্ত্রণায় ক্ষীপ্ত হয়ে উঠে হাতীটা ফের দ্বিগুণ বেগে বখতিয়াকে ধরতে গেল। ঐ একই কায়দায় বখতিয়ার ফের আঘাত করলেন হাতীকে। হাতী এবার লাফিয়ে উঠে অন্য দিকে ছুটে গেল। বখতিয়ারও হাতীর গতি রোধ করতে দৌড়ে গিয়ে হাতীর সামনে দাঁড়ালেন। আবার হাতী ধরতে এলো বখতিয়ারকে। আবার বখতিয়ার তলোয়ার তুলে হাতীটাকে আঘাত করতে গেলেন।

এই ভাবে কিছুক্ষণ লড়াই চলার পর হাতীটা আঘাতে আঘাতে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে ছুটোছুটি শুরু করলো। তলোয়ার হাতে বখতিয়ার হাতীটাকে তাড়া করে ফিরতে লাগলেন। ভয়ংকর আতংকিত হয়ে হাতীটা এবার আত্মরক্ষার নিমিত্তে এদিক ওদিক ছুটতে ছুটতে অবশেষে ক্ষুদ্র ঐ খাঁচার মধ্যে বিপুল বেগে ঢুকে পড়লো। তলোয়ার খাপ বন্ধ করে বখতিয়ার লোহার শিকের পাল্লাটা টেনে খাঁচার মুখ বন্ধ করে দিলেন।

সাব্বাস্ সাব্বাস্ রবে দশদিক ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো।

দিশেহারা দিলারা বানু কিছুক্ষণ হতবুদ্ধি হয়ে থাকার পর বখতিয়ার বেঁচে আছেন এবং যুদ্ধে তিনি জিতে গেছেন বুঝতে পেরে আনন্দে চীৎকার করে একাই তিনি জেনানা মহল মাতোয়ারা করে তুললেন।

খুশীতে হাততালী বাজিয়ে মঞ্চ থেকে নেমে এলেন হিন্দুস্থানের অধিপতি কুতুবউদ্দীন আইবক। মোসাফেহা করে বখতিয়ারকে সাদরে টেনে আনলেন মঞ্চের উপর। তিনি সানন্দে বখতিয়ারের উপঢৌকন গ্রহণ করলেন। শুধু গ্রহণই নয়, তিনি দিলেনও। বখতিয়ারের বীরত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি তাকে নৌবৎ, নিশান, নাকাড়া, সুসজ্জিত অশ্ব, কোমরবন্ধ, তরবারি ও বহমূল্যের খিলাত প্রদান করেন।

উপঢৌকনাদি গ্রহণ করে বখতিয়ার তার নিজস্ব পাহারাদার সেপাইদের নিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে যখন ময়দান থেকে বেরুবার ফটকে এসে হাজির হলেন, তখন তিনি দেখলেন, একটু দূরে নির্জন এক স্থানে ফরমান আলী, হাজেরা বিবি ও দিলারা বানু দন্ডায়মান। বোরকা পরা দিলরা বানুর মুখের ঢাকনা উঠানো। হাতে তার সদ্য ভাঙ্গা ফুলের গুচ্ছ।

লহমার জন্যে বখতিয়ার আত্মবিস্মৃত হলেন। "আরে! একি, আপনারা!"–বলে উচ্চ কন্ঠে আওয়াজ দিয়ে তিনি উল্লাসে তাদের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। ফরমান আলীদের একদম কাছাকাছি এসেই অকস্মাৎ লাগাম টেনে বখতিয়ার খলজী তাঁর ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিলেন এবং তাঁর সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে "বিহার চলো জলদি" বলে আওয়াজ দিয়েই ঝড়ের বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে সেখান থেকে উধাও হয়ে গেলেন।

আট

রাজ ভবনের অবস্থা বড় নাজুক। অন্তঃপুর থম থমে। রাজপুত্র মাধব সেন ও বিশ্বরূপ সেন দুই জন দুইদিকে বিক্ষুব্ধ চিত্তে দণ্ডায়মান। রাজপুত্র কেশব সেন অন্য পাশে উপবিষ্ট। মহারাজের শয়ন কক্ষের দুই দিকের দুই দুয়ারে দুই মহিষী–বসুদেবী ও বল্লাল দেবী বক্র নয়নে দাঁড়িয়ে। রাজা লক্ষ্মণসেন কক্ষের মাঝে শয্যার উপর আসীন। রাজার কাছে সিদ্ধান্ত চান তিন তনয় আর দুই মহিষী।

রাজার বয়স অশতিবর্ষে পৌঁছেছে। দৈহিক ও মানসিকভাবে রাজা লক্ষ্মণসেন সতেজ ও সুস্থই আছেন। তবু এঁদের ধারণা আর বাঁচার আশা নেই রাজার। মৃত্যু তাঁর আসন্ন।

তাই পুত্রেরা তার জানতে চান–কাকে তিনি বাঙ্গালার মসনদ দিয়ে যাবেন স্থির করেছেন। মহিষীরা জানতে চান–কারপুত্র এ রাজ্যের রাজা হচ্ছেন অতঃপর।

লক্ষ্মণসেনের জীবদ্দশাতেই মসনদের উত্তরাধিকার নিয়ে বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃদ্বয় বা পক্ষান্তরে ভ্রাতৃত্রয়ের মধ্যে চরম বিরোধ দেখা দিয়েছে। এ বিরোধে ইন্ধন দিচ্ছেন প্রতিদ্বন্দ্বীদের জননীরা। বসুদেবীর দুইপুত্র–মাধব সেন ও কেশব সেন। বল্লাল দেবীর একপুত্র–বিশ্বরূপ সেন। কেশব সেন একেবারেই গণ্ডীর বাইরে নাহলেও, প্রতিদ্বন্দ্বিতা মূলতঃ মাধব সেন আর বিশ্বরূপের মধ্যে।

সন্তানেরা এক মহিষীর গর্ভজাত হলে লক্ষ্মণসেনের দুর্ভাবনা ছিল না। তিনি অনায়াসেই জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ঘোষণা করতে পারতেন। কিন্তু দুই মহিষীর হওয়ায় তিনি দুই বা ত্রি সংকটে পড়েছেন। কারণ, দাদা মাধব সেনের ভাগ্যে শিঁকে যদি না–ই ছিঁড়ে, কেশব সেন নেহি ছোড়েগা মসনদ।

রাজা লক্ষ্মণ সেনের চিন্তা এখন অন্যদিকে। তুর্কী হামলা দ্বার প্রান্তে দণ্ডায়মান। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও জ্যোতিষীদের তালাশে লোক গেছে নানা দিকে। বাঙ্গালার সিংহাসনের ভবিষ্যত তিনি জানতে চান। একদিকে সিংহাসন তাঁর বিপন্ন, অন্য দিকে জানটাও তাঁর বিপন্ন করে তুলেছেন পুত্র ত্রয় ও মহিষীদ্বয়।

রাজাকে নীরব দেখে মাধবসেন বললেন–আমি এখানে মৌনব্রত পালন করতে আসিনি। আমি জানতে চাই, এ রাজ্যের ভবিষ্যৎ রাজা হিসাবে আমার নাম ঘোষণা করা হচ্ছে কিনা?

বিশ্বরূপ সেন বললেন–আমিও জানতে চাই–বাঙ্গালার সিংহাসন আপনি আমাকে দিয়ে যাচ্ছেন কিনা?

কেশব সেন বললেন–যোগ্যতার দিক দিয়ে এ রাজ্যের রাজা হওয়ার ন্যায্য অধিকার যে আমারই–এবং একমাত্র আমারই, এ স্বীকৃতি আজ আপনার মুখ থেকে আসুক। দাদাকে আপনার অপছন্দ হলে, আমাকে অপছন্দ করার যাতে করে কারণ কিছু না থাকে।

রাজা লক্ষ্মণ সেন বললেন–আহহা রাজ্যের এখন চরম দুর্দিন! এ কথা না ভেবে কেন তোমরা–

মাধব সেন ক্ষীপ্ত কণ্ঠে বললেন–গোল্লায় যাক রাজ্য। সিংহাসন না পেলে, এ রাজ্য রসাতলে গেলেই বা আমার কি?

সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমার বিশ্বরূপ সেনও ঐ একই কথা বললেন। কেশব সেনের কথাও ঐ একটাই। আগে মসনদ, পরে রাজ্য।

লক্ষ্মণ সেন এর জবাবে কি বলবেন ভাবতেই, রাজ সভার প্রহরী এসে গড় হয়ে প্রণাম করে বললো–মহারাজ কয়েকজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত আর এ রাজ্যের সেরা একজন জ্যোতিষী রাজ সভায় আগমন করেছেন। সভাসদরাও সকলে উপস্থিত। তাঁরা মহারাজের উপস্থিতি সাগ্রহে কামনা করছেন।

রাজা লক্ষ্মণ সেন সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন–তাই নাকি? চলো–চলো–

রাজপুত্রেরা প্রশ্ন করলেন–আমাদের জবাব?

রাজা বললেন–এখন কোন জবাব নেই।

প্রহরীর সাথে বেরিয়ে গেলেন রাজা। এতদৃশ্যে তিনপুত্র গোস্বায় গঁ–গঁ করতে লাগলেন। দুই মহিষী দাঁত পিষে ছিটকে গেলেন দুই দিকে।

রাজা লক্ষ্মণ সেন রাজ সভায় প্রবেশ করে পণ্ডিতগণকে বাঙ্গালা দেশের ভাগ্যটা গণনা করে দেখতে বললেন। তামাম হিন্দুস্থান মুসলমানেরা দখল করে ফেললো, বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ কি?

শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ বললেন–গণনার কিছু নেই মহারাজ। আমাদের প্রাচীন ধর্মীয় গ্রন্থে উল্লেখ আছে–এই বাঙ্গালা দেশ একদিন তুর্কীরা দখল করবে। তুর্কীরা গোটা মাগধ জয় করেছে। গোটা উত্তর ভারত এখন তুর্কীদের পদানত। কাজেই বাঙ্গালাদেশও যে তাদের পদানত হবে এতে আর সন্দেহ নেই মহারাজ।

লক্ষ্মণ সেন জ্যোতিষীকে বললেন–আপনি গণনা করে দেখুন তো, কোন সময় এই বাঙ্গালা রাজ্য তুর্কীরা দখল করবে?

জ্যোতিষী বললেন–আমি পূর্বাহ্নেই গণনা করে দেখেছি মহারাজ। আর দেরী নেই। অতি শীঘ্রই এদেশ তুর্কীরা দখল করে নেবে। সময় একদম আসন্ন।

শুনে পাত্রমিত্র সভাসদরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। লক্ষ্মণ সেন পুনরায় পন্ডিতদের প্রশ্ন করলেন–আমাদের সেই পুরাতন গ্রন্থে যে তুর্কী এ দেশ দখল করবে, তার নাম ধাম পয়–পরিচয়, এসব কিছু আছে?

পন্ডিতেরা বললেন–নামধাম, পয়–পরিচয়–এসব কিছু উল্লেখ নেই মহারাজ। তবে তার চেহারার একটা সুস্পষ্ট বিবরণ সেখানে দেয়া আছে।

ঃ চেহারা!

ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ। সে লোক হবে উচ্চতায় খাটো, মুখাকৃতি আপাতদৃষ্টিতে অসুন্দর আর তার বাহু হবে আজানুলম্বিত অর্থাৎ মানুষটি হবে খাটো, কিন্তু তার বাহু হবে বেজায় লম্বা!

ঃ তাই?

ঃ হ্যাঁ মহারাজ। এই বর্ণনাই আছে।

রাজা লক্ষ্মণসেন গম্ভীর হয়ে গেলেন। তাঁর মন্ত্রী হলায়ূদ মিশ্র বললেন–মহারাজ, মগধ বিজয়ী বখতিয়ারকে নিয়েই এখন আপাততঃ ভয়। সে–ই এখন আমাদের দ্বার–প্রান্তে উপস্থিত। সে ছাড়া আর কোন তুর্কী বিজেতার বা আক্রমণকারীর খবর আমাদের কাছে নেই। কাজেই লোক পাঠিয়ে এই বখতিয়ার খলজীর চেহারাটা শিগিগর শিগিগর আমাদের দেখে নেয়া উচিত।

সভাসদরা সকলেই এ প্রস্তাব সমর্থন করলেন। বললেন–ঠিক, ঠিক, ঠিক।

লক্ষ্মণ সেন কয়েকজন বিশ্বস্ত ও ধী সম্পন্ন লোককে গোয়েন্দা গিরিতে পাঠালেন। কয়েকদিন পর গোয়েন্দারা আতংকিত হয়ে পড়িমরি ছুটে এলেন বিহার থেকে। তাদের একজন ছুটে এসে বললো–মহারাজ সর্বনাশ।

লক্ষ্মণসেন মনে মনে চমকে উঠলেন। বললেন–সর্বনাশ!

ঃ একেবারেই সর্বনাশ!

ঃ মানে!

ঃ মানে সেই হাত–সেই মুখ!

ঃ সেই হাত সেই মুখ!

ঃ গড়নটাও অবিকল।

ঃ অবিকল! কি অবিকল?

ঃ ঐ বখতিয়ার।

ঃ বখতিয়ার?

ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ। পন্ডিতেরা যে বিবরণ দিয়েছেন, তা হুবহু মিলে গেছে।

ঃ বলো কি!

ঃ ঐ বখতিয়ারের গড়ন–গঠন–আকৃতি একেবারেই–ঐ রকম।

রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজ নিবাস দুইটি। একটি পূর্ব বাঙ্গালার বিক্রমপুর, অপরটি বাঙ্গালার পশ্চিম প্রান্তের নদীয়া বা নবদ্বীপ। লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী ফের গৌড়ে। নিজের নামানুসারে লক্ষ্মণ সেন গৌড়ের নাম রেখেছেন লক্ষ্মণাবতী। কিন্তু এই লক্ষ্মণাবতীতে লক্ষ্মণ সেন কদাচিত বাস করেন। গঙ্গার তীরে অবস্থিত নদীয়া একটি পূণ্য স্থান বিবেচনায় শেষ বয়সে লক্ষ্মণ সেন এই নদীয়ায় বাস করছেন।

বখতিয়ার খলজীর চেহারা অবিকল শাস্ত্র বর্ণিত সেই ভবিষ্যৎ বঙ্গ–বিজেতা তুর্কী বীরের চেহারার মতো–এ খবর গোয়েন্দাগণ প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে নদীয়ায় এক অকল্পনীয় আতংক পয়দা হলো। ব্রাহ্মণ পন্ডিত শাস্ত্রজ্ঞরা এ বার্তা পাওয়া মাত্রই রাজ সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় না থেকে পূর্ব বাঙ্গালায় আর কামরূপে সপরিবারে পলায়ন করলেন। পলায়ন করলেন অনেক বর্ধিষ্ণু হিন্দুরা ও ছোট বড় পাত্রমিত্রেরা। মন্ত্রী হলায়ুদ মিশ্র রাজাকে নদীয়া থেকে পলায়ন করতে পুনঃ পুনঃ তাকিদ দিলেন। বললেন–যা অবশ্যম্ভাবী তার বিরুদ্ধে জিদ ধরে লাভ নেই মহারাজ। চলুন সময় থাকতে পালাই আমরা।

রাজা লক্ষ্মণসেন নীরব। এর জবাবে কোন কথাই বললেন না।

মন্ত্রীমহাশয় পুণরায় প্রশ্ন করলেন–তাহলে কি এখানে থাকারই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন মহারাজ?

মহারাজ মাথা নেড়ে বললেন–হ্যাঁ।

মহারাজ নদীয়াতেই রয়ে গেলেন। মন্ত্রী সহ রাজ–পুরুষদের অনেকেই প্রকাশ্যে ও গোপনে নদীয়া থেকে পালালেন।

রাজমহিষী বল্লাল দেবী পুত্র বিশ্বরূপকে গোপনে ডেকে বললেন–বাবা, এ সব কি শুনছি?

বিশ্বরূপ সেন বললেন–মা, মহা বিপদ! বখতিয়ার খলজী এ রাজ্যে প্রবেশ করলে আর রক্ষে নেই। রাজার সাথে অনেকেরই নির্ঘাত প্রাণ যাবে।

বল্লাল দেবী চমকে উঠলেন। বললেন–সেকি! তুই তো রাজপুত্র! তোর প্রাণ তো তাহলে–

ঃ সেইটেই বড় চিন্তা মা। অনেকেই পূর্ব বাঙ্গালায় পালিয়ে যাচ্ছে। আমি যে কি করি?

বল্লাল দেবী সঙ্গে সঙ্গে বললেন–কি করি না করি– নয় বাবা। ঐ তুর্কীরা বড় নচ্ছার। তুই রাজপুত্র। তোকে ওরা ধরতে পারলে একদম আছড়িয়ে মারবে। শিগিগর শিগগির তুইও ঐ পূর্ব বাঙ্গালায় পালিয়ে যা।

ঃ কিন্তু সিংহাসনটা বখতিয়ার যদি—

ঃ চুলোয় যাক সিংহাসন। ওটা রক্ষা পেলেই যে সেটা তুই পাবি, এমন কোন নিশ্চয়তা আছে? ঐ আশাতে থেকে কেন প্রাণটা দিতে যাবি তুই। বরং বিপদ কেটে গেলে তখন এসে দাবী করিস ওটা।

মাতৃভক্ত সন্তান খানিকটা মাতার আদেশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে আর অধিকটা প্রাণের আতংকে মায়ের কথায় সম্মত হয়ে বললেন—ঠিক মা, ঠিক। তুমি ঠিক কথা বলেছো। বিক্রমপুরেই যাই আমি আর তুমিও আমার সাথে এসো—

চমকে উঠে বল্লালদেবী বললেন—ওরে বাপরে! আমি? সর্বনাশ! তাহলে আর রক্ষে আছে! মহারাজকে পাহারা দিয়ে না রেখে আমি সরে গেলেই ঐ সর্বনাশী সঙ্গে সঙ্গে মহারাজকে ফুসলিয়ে বাঙ্গালার সিংহাসনটা তার ছেলেদের জন্যে হাত করে ফেলবে। আমি এখানেই থাকি। আমি মেয়ে মানুষ, তোর চেয়ে আমার প্রাণের ঝুকি কম।

রাজকুমার বিশ্বরূপ সেন গোপনে পূর্ব বাঙ্গালায় পালিয়ে গেলেন। রাণী কমুদেবীও ঐ একইভাবে এবং একই যুক্তিতে তাঁর পুত্রদ্বয়কে পূর্ব বাঙ্গালায় পাঠিয়ে দিয়ে নিজে লক্ষণ সেনকে পাহারা দিয়ে রইলেন যাতে করে তাঁকে ফুসলিয়ে বল্লালদেবী তাঁর পুত্রের জন্যে মসনদটা কব্জা করতে না পারেন।

রাজা লক্ষণ সেন অটল। বাঙ্গালা মুলুকের প্রবেশদ্বার তাঁর সুরক্ষিত। সেখানে তিনি আরো সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন। বখতিয়ারের কি সাধ্য এবার বাঙ্গালা মুলুকে প্রবেশ করে। কারো কথায় কর্ণপাত না করে অবশিষ্ট সভাসদ ও দ্বারী—প্রহরী নিয়ে নদীয়াতেই থেকে গেলেন। বখতিয়ার যদি এরপরও বাঙ্গালা মুলুকে প্রবেশ করে, নদীয়া বহুৎ দূর। তখনও তিনি অনায়াসেই নদীয়া ছেড়ে যেতে পারবেন।

দিল্লী থেকে ওয়াপস্ এসেই বখতিয়ার ফের তাঁর ইয়ার বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে বসলেন। দিল্লীর মালীক কুতুব উদ্দীন আইবক বখতিয়ারের মাধ্যমে তাদের এই বিজয়ের যথাযথ ইযযত দিয়েছেন দেখে, ইয়ার—বন্ধু ও সেপাই সেনা নয়া উৎসাহে উৎসাহিত হয়ে উঠলো। বখতিয়ার তার ইয়ার—বন্ধুদের বললেন—এতটার পর বাঙ্গালা মুলুকের ঐ দুবমনির জবাবটা না দিয়ে হাতগুটিয়ে অলসের মতো বসে থাকা কাপুরুষতা। এটা আমার পক্ষে কিছুতেই বরদাস্ত করা সম্ভব নয়।

সঙ্গে সঙ্গে তার বন্ধুরাও উৎসাহের সাথে বললো—অবশ্যই অবশ্যই। এটা কারো পক্ষে বরদাস্ত করা সম্ভব নয়। আমরা এটা বরদাস্ত করতে কক্ষনো রাজী নই।

ইওজ খলজী যোগ দিয়ে বললো—হুকুম পেলেই অশ্ব সহ সেপাইদের কাতারবন্ধ করে ফেলি।

শিরান খিলজী বললো পদাতিক ফৌজের উপর আর আমাদের ভরসা করতে হবে না। এবার অশ্বদিয়েই পুরোবাহিনী সাজাতে পারবো আমরা।

বখতিয়ার খলজী প্রশ্ন করলেন—অতিরিক্ত অশ্বক্রয়ের ইরাদায় যে অর্থ বরাদ্দ করা ছিল, তা কি কাজে লাগানো হয়েছে?

আলী মর্দান খলজী বিপুল উৎসাহে বললো—বিলকুল—বিলকুল। আরে আমাদের এই ইওজ আর শিরানভাই জব্বোর কাজের লোক। তোমার অনুপস্থিতির এ কয়দিনেই কোথা থেকে যে এত অশ্ব যোগাড় করে আনলো তারা, তা কল্পনাই করা যায় না। দেখে তো আমি তাজ্জব।

বখতিয়ার খলজী খুশী হয়ে বললেন—চমৎকার এবার অশ্বগুলোকে তালিম দিয়ে নাও।

শিরান খলজী বিস্মিত কণ্ঠে বললো—তালিম মানে! তাতে তো কয়েকদিন সময় লাগবে। এখনই যখন বেরুবো আমরা, তখন যেগুলোর তালিম আছে—

হাত তুলে বখতিয়ার খলজী স্মিতহাস্যে বললেন—না।

শিরান বললো—কি, না?

ঃ এখুনি আমরা বেরুচ্ছি না।

ঃ মানে!

ঃ আবার আমাকে বলতে হয়, ভাই সাহেবের সাহস প্রচুর। বাঘ তাড়ায়। কিন্তু—

ঃ মগজে অনেক ঘাটতি?

বখতিয়ার হেসে ফেললেন। হেসে বললেন—না—মানে—ঘটনা অনেকটা—

আবার বখতিয়ার হেসে ফেললেন। শিরান খলজী গোস্বা হলো। গোস্বাভরে বললো—সেই ঘাটতিটা হলো কিসের শুনি। এখন সবাই আগ্রহী। লড়াইয়ের নামে সবাই এখন গরম। এই গরমটা ঠান্ডা হতে দেয়ার নামই মগজ?

বখতিয়ার খলজী বললেন—আরে ভাই সাহেব, আপনার এ কথা অগ্রাহ্য করছে কে? কিন্তু আর একটা দিকও যে আছে এখানে।

ঃ আর একটা দিক!

ঃ হ্যাঁ। একেবারেই অচিন মুলুক। পথঘাট বিলকুল অজানা। অচিন রাস্তায় পা বাড়ানোর আগে পথঘাটগুলো জেনে নিতে হবে না?

শিরান খলজী মাথা নীচু করলো। নীচু গলায় বললো হ্যাঁ, উও ভি ঠিক বাত।

বখতিয়ার খলজী বললেন—গোয়েন্দা বাহিনীর তৎপরতা এক রকম বন্ধ হয়ে আছে। পায়ে বোধ করি বাত ধরে গেছে ওদের। ওরা কিছুটা ছটোছুটি করে আসুক।

অনেকেই এবার সমর্থন দিয়ে সমস্বরে বললো—বিলকুল ঠিক—বিলকুল ঠিক।

গোয়েন্দা বাহিনীকে তলব দিয়ে বখতিয়ার তাদের বাঙ্গালা মুলুকের অবস্থাদি ও পথ ঘাটের খোঁজ খবর নেয়ার জন্যে পাঠিয়ে দিয়ে এন্তেজার করতে লাগলেন।

বেশ কয়েকদিন অতিবাহিত হওয়ার পর খবর নিয়ে ওয়াপৃস এলো গোয়েন্দারা। তাদের দলপতি বখতিয়ারের সামনে এসে হতাশ কণ্ঠে বললো—জনাব, খবর মোটেই ভাল নয়।

বখতিয়ারের চাহনি অতি তীক্ষ্ম হলো। প্রশ্ন করলেন—মানে?

ঃ মানে বাঙ্গালা মুলুক দখল করা অসম্ভব।

ঃ অসম্ভব।

বখতিয়ার খলজী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। গোয়েন্দা বাহিনীর দলপতি ভয়ে ভয়ে বললো—জি, জনাব।

চোখ দুটো জ্বলে উঠলো বখতিয়ারের। তিনি শানদার কণ্ঠে বললেন— অসম্ভবকে সম্ভব করাই তো বাহাদুরী! সহজ হলে সে কাজ তো কাপুরুষও করতে পারে। বলো, কেন সেটা অসম্ভব।

ঃ বাঙ্গালা মুলুকে প্রবেশের কোন পথ নেই।

ঃ বাইরের লোক কি তাহলে আসমান দিয়ে বাঙ্গালা মুলুকে যাওয়া আসা করে?

ঃ না জনাব। বাঙ্গালা মুলুকে প্রবেশ পথ একটাই। তেলিয়াগড় ও শরকীগলি গিরিপথ। লাগালাগি এই গিরিপথ দুইটিই বাঙ্গালা মুলুকে প্রবেশ করার এক মাত্র পথ।

ঃবটে।

ঃ এই গিরিপথ দুইটির দুইমুখেই গৌড়ের রাজা লক্ষ্মণ সেনের সেনাবাহিনীর শক্ত শক্ত দুর্গ। ইতিমধ্যে আরো সেপাই সেখানে এনে মোতায়েন করা হয়েছে।

ঃ হুঁ

ঃ ঐ গিরিপথে ঢোকার পর বাঙ্গালার বাহিনী গিরিপথের দুই মুখে দাঁড়ালে খাঁচায়-পড়া মুষিকের মতো অসহায় ভাবে জান দিতে হবে আমাদের।

ঃ এরপর?

ঃ এরপর আর কোন পথ নেই।

ঃ বিপথও কি নেই?

ঃজনাব।

ঃ ঐ তেলিয়াগড় শরকীগলির উত্তর দিক কি পাহাড় দিয়ে ঘেরা?

ঃ না জনাব, নদী।

ঃ নদী!

ঃ বিশাল-বিশাল নদী। পয়লাই সামনে পড়বে গঙ্গা নদীর মূল ধারা যা আয়তনে এত বিশাল যে অনেক স্থানে এপার থেকে ওপারটা দেখাই যায় না। এরপর আবার কুশী নদী। এ ছাড়াও ছোট ছোট আরো অনেক নদী বাঙ্গালা মুলুকের এদিকে সীমান্ত ঘিরে আছে।

ঃ তেলিয়াগড়ের দক্ষিণেও কি নদী?

ঃ না জনাব, বন। তেলিয়া গড়ের দক্ষিণ দিকে তেলিয়াগড়, শরকীগলি ও রাজমহল থেকে সমুদ্র বরাবর ঝাড়খণ্ড নামের সুদীর্ঘ আর দুর্ভেদ্য এক অরণ্য। পথের কোন নাম নিশানা এ দিকটায় নেই।

ঃ অরণ্য? পাহাড়-নদী নয়?

ঃ না জনাব, অরণ্য।

ঃ অরণ্য কোন দুর্লংঘ বস্তু নয়।

ঃ জনাব!

তুর্কীরা নদী লংঘনে অনেকটা হীনবল। কারণ সন্তরণে তারা অনেকটা অপটু। নদী বা পাহাড় নয় অরণ্য, এটা জেনে বখতিয়ারের দুর্ভাবনা কেটে গেল। তিনি বললেন—রাজা লক্ষ্মণসেন কি গৌড়ে এখন?

ঃ গৌড়ে নয়, নদীয়ায়।

ঃনদীয়ায়।

ঃ জি জনাব। নদীয়া তাঁর রাজ নিবাস। তিনি বরাবর নদীয়াতেই থাকেন।

ঃ অর্থাৎ ঐ ঝাড়খণ্ডের ওপারে?

ঃ জি, আমাদের এখান থেকে পূর্ব দক্ষিণে।

ঃ আলহামদুলিল্লাহ। রাজাকেই তো চাই আমার। রাজার পতন না ঘটলে রাজ্যের পতন ঘটবে কিসে।

ঃজনাব।

ঃ কুছ পরোয়া নেহি। ঐ ঝাড়খণ্ডই বখতিয়ারের খন্তাকার বাহিনীর রাহা করে দেবে।

গোয়েন্দা বাহিনীর দলপতি বখতিয়ারের মুখের দিকে হা করে চেয়ে রইলো। মুচ্‌কী হেসে বখতিয়ার খলজী সেখান থেকে উঠে গেলেন।

পরের দিন বখতিয়ারের নির্দেশে তার সেপাইদের খোলা ময়দানে দাঁড় করানো হলো। তামাম গুলোই অশ্বারোহী সেপাই। সবাইকে লক্ষ্য করে বখতিয়ার খলজী বললেন–বন্ধুগণ, ঝাড়খন্ড নামের ঐ অরণ্য ভেদ করেই পথ ধরবো আমরা। গতি আমরা যতটা ক্ষিপ্র করতে পারবো আমাদের কামিয়াবীর সম্ভাবনা ততটা অধিক হবে। একেবারেই অতর্কিতে আর অকস্মাৎ নদীয়ার উপর হামলা চালাবো আমরা। এত দ্রুত যেতে হবে আমাদের যে, লক্ষণ সেনের কোনগুপ্তচর যদি এখন আমাদের রওনা হতে দেখে এবং আমরা নদীয়াতে যাচ্ছি, এটাও যদি জানে, তবু সে যেন আমাদের আগে গিয়ে নদীয়াতে হাজির হতে না পারে বা আমাদের খবর রাজার কাছে পৌঁছাতে সক্ষম নাহয়।

আলী মর্দান খলজী ইতস্ততঃ করে বললো–এতবড় বাহিনী ঐ অরণ্যের মধ্যে দিয়ে--

আলী মর্দানের জবাবে বখতিয়ার খলজী বললেন–এক সাথে নয়, খন্ড খন্ড হয়ে হয়ে। প্রয়োজনে হাজার খন্ডে বিভক্ত হবো আমরা। পনের বিশজন লোক, নিয়েও এক একটা দল হবে আমাদের। আমরা নেতৃস্থানীয় এই কয়জন ছাড়াও আমাদের এক একজন পারদর্শী সেপাই নেতৃত্ব দেবে ঐ সব দলের।

ইওজ বললো–মারহাবা। মারহাবা।

বখতিয়ার খলজী বললেন–যাবো আমরা এক সাথেই আর পাশাপাশিই। বড়জোর কিছুটা আগে পিছে হয়ে ছুটতে হবে আমাদের। কিন্তু গতি সবার একই রকম ক্ষীপ্র হওয়া চাই যাতে করে কেউ আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ি।

আলী মর্দান বললো–দোস্ত্।

বখতিয়ার আরো যোগ দিয়ে বললেন–যেখানেই দাঁড়াইনা কেন, পলকের মধ্যে সবাইকে এসে সেখানে পৌঁছতেই হবে যেভাবে হোক।

নসিহত শেষ করে অল্প সংখ্যক সেপাই বিশিষ্ট অসংখ্য ক্ষুদ্র দলে গোটা বাহিনীটাকে বিভক্ত করা হলো। বিভক্ত করার পর প্রত্যেক দলের নেতৃত্বে লোক নিয়োগ করা হলো। বখতিয়ার তার দল নিয়ে সবার আগে দাঁড়ালেন। "আল্লাহ আকবর" আওয়াজ উঠলো আসমানে। কয়েক সহস্র অশ্বারোহী সেপাই বেশুমার ধূলোর তুফান ছুটিয়ে ঝাড়খন্ডের অভিমুখে রওনা হয়ে গেল।

সেদিন বেলা দ্বিপ্রহর। রাজা লক্ষণ সেন তার নদীয়ার বাসভবনে মধ্যাহ্ন ভোজনে বসেছেন। দ্বারী–প্রহরী–রক্ষীরা বিরাম–বিশ্রামে রত। রাজ ভবনের আর পাঁচজন পাঁচ কাজে মগ্ন। রাজ ভবনের বাইরে শহরেরও সকলেই কর্মমুখর। ক্রেতা বিক্রেতা প্রত্যেকেই কেনা–বেচায় ব্যস্ত। রাজপথে পথচারীরা গন্তব্যের দিকে ছুটছে।

দোকানদারেরা দোকান খুলে বসে আছে। ফেরীওয়ালারা ফেরীঘাড়ে ঘুরছে। শহরের পরেই হাল বাইছে হেলে, জাল বাইছে জেলে, নাও বাইচে নাইয়া, গান গাইছে বাউড়ে বাউল রাখাল রসিক লোকেরা। গৃহস্তেরা গৃহকর্মে মজবুর। জলকে যাওয়ায় বউড়ি ঝিউড়ি ব্যস্ত।

ঝাড়খন্ড পার হয়ে জঙ্গলের আড়াল দিয়ে বখতিয়ারের ফৌজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল–বিভক্তভাবে শহরের দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। এই ক্ষুদ্রাকার দলগুলির সর্বাগ্রে ছিলেন বখতিয়ার খলজী নিজে। সেরেফ সতেরজন অশ্বারোহী তাঁর দলে ছিল এই সময়।

হাতিয়ার সামাল করে বখতিয়ার খলজী ও তার সতেরজন অশ্বারোহী সঙ্গী এমন ভাবে শহরের ভেতর প্রবেশ করলেন যে, তাঁরা কোন ফৌজী লোক বা এই শহরে তাঁরা হামলা চালাতে এসেছেন–এমন কোন সন্দেহ শহরবাসী কোন লোকেরই হলোনা। সবাই ভাবলো–নিশ্চয়ই এরা অশ্বব্যবসায়ী বিদেশী। অশ্ব নিয়ে রাজ ভবনে যাচ্ছে।

পরের দলও যখন ঐ একইভাবে শহরের মধ্যে প্রবেশ করলো, তখন বখতিয়ার খলজী রাজা লক্ষণ সেনের বাসভবনে পৌঁছে গেছেন। রাজ ভবনের দ্বারে গিয়েই বখতিয়ার ও তাঁর সঙ্গীরা ক্ষিপ্র গতিতে অসি উন্মোচন করলেন এবং অতর্কিতে হামলা করে দ্বারী রক্ষীদের হত্যা করলেন।

ইতিমধ্যেই শহরে এসে বখতিয়ারের আরো কয়েকদল পৌঁছে গেল। এবার তারা শহরের মধ্যে হামলা চালানো শুরু করলো। এরপর এলো আর এক দল, এরপর আর একটা। পর পর আসতেই থাকলো বখতিয়ারের ফৌজ এবং শহরময় বিপুল রকম চীৎকার ও হৈ চৈ শুরু হলো।

দ্বারপ্রান্তে প্রহরীদের আর্তনাদে কান দিতেই শহরের ঐ তুমুল হৈচৈ কানে এসে পড়ায় প্রচন্ডভাবে চমকে উঠলেন বাঙ্গালার রাজা লক্ষণ সেন। বখতিয়ার খলজীর চেহারার কথা দাস দাসীদের অনেকেই শুনে ছিল। এদের একজন বখতিয়ারকে দ্বারপ্রান্তে দেখেই আঁতকে উঠে রাজার কাছে দৌড়ে এলো। নানা দিকের আর্তনাদে হতবুদ্ধি রাজা তখন অসমাপ্ত আহার ফেলে লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। এই সময় পড়িমরি সেই দাস এসে জানালো –মহারাজ, সর্বনাশ! বখতিয়ার খলজী।

আতংকে লাফিয়ে উঠলেন লক্ষণ সেন। থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে বললেন–বখতিয়ার খলজী! কোথায়?

ঃ সদর দ্বারে মহারাজ, রাজ ভবনের সদর দ্বারে।

ঃ সদর দ্বারে। সে কি!

ইতিমধ্যেই সদর দ্বারের আর্তনাদ অন্দর মহলে চলে এলো। দাসদাসী ও পরিজনেরা এলোপাথাড়ি চীৎকার করে ছুটোছুটি করতে লাগলো। শহরের হৈচৈটাও

এখন এত তীব্র হয়ে উঠলো যে, সে আওয়াজ শহর ছেড়ে বহুৎ দূরে গিয়ে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো।

কিংকর্তব্য বিমূঢ় রাজা কি করবেন লহমা খানেক কিছুই ভেবে স্থির করতে পারলেন না। অতঃপর তাঁর খেয়াল হলো–কোন কিছু করতে যাওয়ার চিন্তা এখন বৃথা। কারণ শত্রু যখন নদীয়ায় এসে পৌঁছেছে, তখন তেলিয়াগড় দূর্গ আর তাঁর নেই। পতন ঘটেছে তেলিয়াগড়ের। এরা তেলিয়া গড়ের পথ হয়েই এসেছে এবং রাজবাহিনীকে পরাজিত করেই এসেছে। অতএব, প্রতিরোধ করার শক্তিই তাঁর আর নেই এখন। বরং এখানে আর একপলক অপেক্ষা করা মানেই নির্ঘাত মৃত্যু।

এই খেয়াল মাথায় আসতেই তিনি সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে আহার ফেলে এঁটো হাতে ও নগ্নপদে রাজ ভবনের পেছন দিকে দৌড় দিলেন। তার অসংলগ্ন পরিধেয়ের একপ্রান্ত পথি মাঝে আছড়ে আছড়ে পড়তে লাগলো। রাজ ভবনের পেছনে নর্দমা আর আবর্জনার পাশে ছিল খিরকী দুয়ার। সেই দুয়ার দিয়ে ভবন থেকে বেরিয়ে তিনি বন জঙ্গল ভেঙ্গে নদীর দিকে ছুটলেন। তার একান্ত নিকটের কয়েকজন লোকসহ তখনই নৌকা ধরে তিনি সকলের অজ্ঞাতে বাঙ্গালার পূর্ব দিকে বিক্রমপুর লক্ষ্য করে নৌকা ছুটিয়ে দিলেন।

ফলে, বহু সংখ্যক দাস দাসী, নরনারী, হাতীঘোড়া ও বিপুল ধন সম্পদ সহকারে লক্ষ্মণ সেনের রাজ ভবন অনায়াসেই বখতিয়ার খলজীর হস্তগত হলো। ইতিমধ্যেই বখতিয়ার খলজীর তামাম ফৌজ পৌঁছে গেল। তারা বিনাযুদ্ধেই নদীয়া শহর দখল করে নিলো।

আকাশ বাতাস প্রতিধ্বনিত করে লক্ষ্মণ সেনের রাজ ভবনে মুহূর্মুহূ আওয়াজ উঠলো–আল্লাহু আকবর। ওখানে ঐ রাজ ভবনেই মুসলমানদের বিজয় পতাকা উড়িয়ে দিলেন বখতিয়ার। ইসায়ী বারশত তিন সালের শেষ দিকে পাক ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল পতাকা এই সর্বপ্রথম বাঙ্গালার বুকে সগর্বে পৎ পৎ করে উড়তে শুরু করলো।

বখতিয়ার খলজী অতঃপর ইয়ারবন্ধু ও সেপাই সৈন্য নিয়ে গনীমাত্ সংগ্রহ করতে মনোনিবেশ করলেন। একটানা তিনদিন গনীমাত সংগ্রহের কাজে এই নদীয়াতেই সদল বলে ব্যাপৃত রইলেন বখতিয়ার। এর মধ্যেও কোথাও থেকে কোন ফৌজ তাদের বিরুদ্ধে এলো না। নদীয়াতে লক্ষ্মণ সেনের যা কিছু বা সেপাই–সেনা ছিল, লক্ষ্মণ সেনের কোন প্রকার সাড়া শব্দ না পেয়ে তারাও তৎক্ষণাৎ দূরে ছিটকে পড়েছিল। বাধা দেয়ার কোন কোশেশ তারা আর করলো না। লক্ষ্মণ সেন পালিয়ে গেছে শুনে তারাও পশ্চাৎধাবন করলো। তেলিয়াগড় আর শরকীগলিতে অবস্থিত লক্ষ্মণ সেনের সেপাইরা বাঙ্গালা মুলুক একদিন তুর্কী ফৌজের হস্তগত হবে, এই ভাবিষ্যৎ বাণী আগে থেকেই জানতো। তুর্কী ফৌজের হাতে নদীয়ার পতন ঘটেছে–এটা শোনা মাত্র ঐ পদাতিক

সেপাইরা বিশাল এই অশ্বারোহী তুর্কী বাহিনীর মোকাবেলায় আসাতো দূরের কথা, তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে ওখান থেকেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

হাতী মানুষের লড়াই শেষে অপেক্ষমান ফরমান আলীদের একদম নযদীক্ এসে বখতিয়ার ফের অশ্বের মুখ ঘুরিয়ে নিলো এবং তড়িৎ বেগে সেখান থেকে অন্তর্হিত হলো। এতদ্দৃশ্যে ফরমান আলী লা–জবাব হয়ে গেলেন। হতবুদ্ধি হাজেরা বিবি যেমন ছিলেন তেমনি ভাবেই দাঁড়িয়ে রইলেন। বিদ্যুৎ পিষ্ট রোগীর মতো একবার একটা ঝাকুনী দিয়ে উঠে দিলারা বানুর সর্বাঙ্গ অসাড় হয়ে গেল। হাতে ধরা ফুলের গুচ্ছ আপছে–আপ্ তাঁর হাত থেকে খশে জমিনের উপর লুটিয়ে পড়লো। সজ্ঞাহীন অবস্থায় কিয়ৎকাল কাটানোর পর হুঁশ ফিরে আসতেই তিনি থর থর করে কাঁপতে লাগলেন।

ফরমান আলী সাহেব বিস্মিত কণ্ঠে বললেন–তাজ্জব! ব্যাপারটা কিছুই বুঝলাম না তো!

হাজেরা বিবি বললেন–এ আদমী আওয়ারা নাকি!

দিলারা বানু কাঁপতে কাঁপতে বললেন–বেঈমান, না– ফরমান!

চারিদিকে তখনও লোক সমাগম ছিল। তা লক্ষ্য করে হাজেরা বিবি বললেন–বহিন, চলুন– আগে মকানে যাই।

এরপর ফরমান আলীকে লক্ষ্য করে বললেন–এখানে আর দাঁড়িয়ে থেকে ফায়দা কি? চলুন এখন ওয়াপস্ যাই।

ফরমান আলী উদাস কণ্ঠে বললেন–হাঁ, তাই চলো–

মকানে ওয়াপস্ এসে দিলারা বানু কিছুক্ষণ অস্থির ভাবে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করার পর বিচানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন। হাজেরাকে ফাঁকে ডেকে ফরমান সাহেব চিন্তিত ভাবে বললেন–ব্যাপারটা কি, তুমি কিছু আন্দাজ করতে পারছো?

জবাবে হাজেরা বিবি বললেন–নাঃ! একদম না।

ঃ এদের মধ্যে কোন ঝগড়া বিবাদ হয়েছে?

ঃ মানে?

ঃ মানে দিলারা আর বখতিয়ারকে ঝগড়া করতে দেখেছো?

ঃ না, আমার চোখে পড়েনি। তেমন কিছু হলে অবশ্য আমি জানতাম।

ঃ দিলারা কি এই লোকটার সাথে খুব বেশী রকমের মেলামেশা করতো?

ঃ বেশী না হলেও, কম নয়। বখতিয়ার সাহেব আমাদের ঐ আজমীরের মকানে যে কয়দিন ছিলেন, সে কয়দিন দিলারা বহিন এক রকম উনাকে নিয়েই মশগুল ছিলেন। মানে উনার খেদমতেই একিন দীলে লেগে ছিলেন।

ঃ এতটা হতে দেয়া ঠিক হয়নি।

ঃ কি রকম?

ঃ তোমরা ওর রাশটা একটু টেনে ধরতে পারতে?

ঃ কি করে? আব্বাজান নিজেই ঐ বখতিয়ার সাহেবকে অত্যধিক পেয়ার করতেন। তিনি হামেশাই বখতিয়ার সাহেবের আদব আখলাক আর কলেজার তারিফ করতেন। দিলারা বহিনকে পুনঃ পুনঃ ডেকে বখতিয়ার সাহেবের তয়তদবীরের খবর নিতে বলতেন। তাছাড়া–

ঃ তাছাড়া?

ঃ শেষের দিকে তিনি তো বখতিয়ার সাহেবকেই আমাদের দিলারা বহিনের জন্যে পছন্দ করে বসলেন। একদিন তিনি সবাইকে একরকম জানিয়েই বলে বসলেন– বখতিয়ার সাহেবের মতো এত যোগ্য ছেলে দিলারা বানুর জন্যে তিনি আর কখনও পাননি। এমন ছেলেই মনে মনে তিনি চাইছিলেন।

ঃ বটে!

ঃ সেরেফ কি এই টুকুই? এদিক দিয়ে আমাদের দিলারা বহিনের নসীবটা খুব শানদার– এ কথা তিনি হামেশাই সবার সামনে বলে বলে খোশ প্রকাশও করলেন।

ফরমান আলী কিছুটা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন–সাদা দীলের লোকদের নিয়ে এখানেই হয় মুসিবত। একটা কিছু মনের মতো হলেই তারা হৈ চৈ করে তা জাহির না করে মনের ভেতরে চেপে রাখতে পারেন না।

ঃ জি?

ঃ আব্বাজানেরও এটা করা ঠিক হয়নি। একজনের সাথে সাদীর কথা যেখানে পাকা হয়ে আছে, সেখানে সেটা কায়েমীভাবে নাকোচ হয়ে না–যাওয়া তক, আর একজনকে নিয়ে এত বেশী বাড়াবাড়ি করা বা দিলারাকে তাঁর সাথে এত বেশী মিশতে দেয়া উচিত হয়নি।

হাজেরা বিবি এবার একটু হাসলেন। হাসতে হাসতে বললেন–আব্বাজানের কসুর না হয় হয়েছে, স্বীকার করি। কিন্তু আপনার বহিনের যে একমাত্র ঐ বখতিয়ার ভাই ছাড়া জিন্দেগীতে কাউকেই আর পছন্দ নয়–এ বীমারের দাওয়াই কি?

ঃ বখতিয়ার তো মনে হয় একটা পাগলা আদমী। মাথায় তাঁর গড়বড় আছে জিয়াদা।

ঃ তা সে যা–ই থাক, এখন ফায়সালাতো একটা কিছু চাই এর? ওদিকে আরমানখাঁ সাহেবের হালতও শুনছি বড্ড খারাপ। বাঁচার আশা আদৌ আর নেই। হেকিম সাহেব তামামই জবাব দিয়ে গেছেন। এদিকে ফের বখতিয়ার সাহেবের হঠাৎ এই পাগলামী। ভেতরের ব্যাপারটাতো খোঁজ করে দেখা দরকার।

ফরমান সাহেব গম্ভীর কণ্ঠে বললেন–হুঁ!

একটু পরেই হাজেরা বিবিকে সঙ্গে নিয়ে ফরমান আলী সাহেব দিলারা বানুর ঘরে এলেন। দিলারা বানু শুয়েছিলেন। ভাইজানকে ঘরে ঢুকতে দেখে ধড়মড় করে বিছানার উপর উঠে বসলেন।

একটা কুরসী টেনে দিলারার পাশে বসে ফরমান সাহেব দিলারাকে বললেন আমি তোমাকে গোটা কয়েক কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।

দিলারা বানু ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন–জি, বলুন?

ফরমান আলী বললেন–বখতিয়ারকে কি পুরোপুরি চিনতে পেরেছো তুমি?

দৃষ্টি কিঞ্চিৎ তীক্ষ্ণ করে দিলারা বানু প্রশ্ন করলেন–এ কথা কেন ভাইজান?

ঃ একটু দরকার আছে।

ঃ আপনিও তো চেনেন তাঁকে। তাঁর সম্বন্ধে আপনার কাছেই বেশী তারিফ শুনেছি আমি।

ফরমান আলী সাহেব ইতস্ততঃ করলেন। ইতস্ততঃ করে বললেন– না, মানে– আমার তো তার সাথে খুব বেশী মোলাকাত হয়নি। সাকুল্যে দুবার। পয়লা মোলাকাতেই তাকে আমার খুব ভাল লেগেছে–এটা ঠিক, কিন্তু একজন মানুষের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে না মিশলে তো তাকে সঠিক ভাবে চেনা যায় না, তাই বলছি।

ঃ মানে!

ঃ আমার চেয়ে তো অনেক বার আর অনেক বেশী কাছে থেকে তুমি তাকে দেখেছো। তোমার কি মনে হয়–আসলে লোকটার দিমাগটা কিছু গোলমেলে?

ঃ কি রকম?

ঃ মানে লোকটার মাথায় কিছু দোষ বা ছিট আছে কিনা, বা তাঁর বোল চালের মধ্যে কোন অসংলগ্নতা তোমার নজরে পড়েছে কিনা?

ঃ না, এমন কিছুই নজরে আমার পড়েনি।

ঃ তার কথা বার্তার মধ্যেও–

ঃ জিনা, এক বিন্দুও না। বরং এত যুক্তিপূর্ণ বা সুসংহত চিন্তাধারা খুব বেশী লোকের মধ্যে দেখিনি।

ফরমান আলীর ললাটে চিন্তার রেখা ফুটে উঠলো। একটু নীরব থেকে ফের তিনি প্রশ্ন করলেন–আচ্ছা, নেশাটেশা করার তার অভ্যেস্ আছে বলে কি কোন সন্দেহ তোমার হয়েছে?

ঃ না, তাও হয়নি।

এবার খানিকটা না–খোশ কণ্ঠেই ফরমান সাহেব প্রশ্ন করলেন–তাহলে তাঁর এই আচরণের কারণ কি মনে করো তুমি?

দিলারা বানু ধরা গলায় বললেন–আগে কিছু মনে করিনি। কিন্তু এখন ব্যাপারটা ক্রমেই আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

হাজেরা বিবি বললেন–কি রকম?

ঃ রকম কিছুই নয় ভাবী। আসলে এটা তার ফখর। অহংকার। উনি যে জব্বোর এক বাহাদুর–এই ফখরেই উনি মাতোয়ারা হয়ে আছেন। তার উপর আবার ইদানীং ঐ মগধ জয় করার ফলে তার কয়েকটা জিয়াদা হাত–পা গজিয়েছে।

হাজেরা বিবি চিন্তিতভাবে বললেন–তাহলে উনি যে আমাদের কাছে আসতে আসতে ফের ফিরে গেলেন, এটা ফখর করে ফিরে গেলেন?

ঃ হ্যাঁ, ফখর বৈ কি? খানিকটা ফখর আর বেশীটা আমাদের অপমান করা। তাঁকে আমরা গরীব বলে একদিন যে দয়া–অনুগ্রহ করেছি, একটা দেশের মালীক হয়ে, আমাদের তাচ্ছিল্য করে, উনি তার বদলা নিয়ে গেলেন। খন্নাস আদমী, বেইমান–জাত বেইমান।

আফসোসে দিলারা বানু মুখ তাঁর অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিলেন। হাজেরা বিবি ফরমান সাহেবকে বললেন–এসব আজগুবী চিন্তা ভাবনা করে কোন ফায়দা নেই। আপনার একবার তকলিফ করে এখন মগধেই যাওয়া উচিত। তাঁর নিজের জায়গায় গিয়ে সন্ধান–তালাশ করে আসল ঘটনা জেনে নিতে পারলে, আর কিছু না হোক, এই গোলক ধাঁধাঁ থেকে অন্ততঃ নাজাত পেতে পারি আমরা।

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর ফরমান আলী সাহেব ক্ষুণ্নকণ্ঠে বললেন–এত সময়–ফুরসৎ কৈ আমার? পরের নকরী করি–

হাজেরা বিবি জিদ ধরে বললেন–তবুও যে ফুরসৎটা করতেই হবে আপনাকে। আজ না হোক, সময় সুযোগ দেখে যে কোনদিন গিয়ে এর হদিস করে না আসাটা আদৌ আমাদের ঠিক হবে না।

চিন্তা গ্রস্ত অবস্থায় কুরসী থেকে উঠতে উঠতে ফরমান আলী বললেন–আচ্ছা দেখা যাক, কবে কি করতে পারি।

কিন্তু অধিক দিন দেখার অপেক্ষায় ফরমান আলী সাহেব বসে থাকতে পারলেন না। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁকে ছুটতে হলো মগধে। অর্থাৎ বখতিয়ারের বর্তমান আস্তানা মগধের বিহার শরীফে। স্রেফ হাজেরা বিবির অনুরোধটাই নয় পরিস্থিতিই তাঁকে বাধ্য করলো বিহার শরীফে যাত্রা করতে।

গরীবের গৃহে হাতীর পাঁড়া পড়লে কি হয়– বুজুর্গানরাই ভাল বোঝেন, কিন্তু আরমান খানের পঞ্জিরের উপর হাতীর পাঁড়া পড়ায় তার ফল দাঁড়ালো মারাত্মক। ভাঙ্গা হাড়ে পচন ধরায় রাজস্ব উজিরের জৌলুসদার দৌলতখানায় অন্ধকার পুরে দিয়ে খান–ই–খানান আরমান খান সাহেব হাতী মানুষের লড়াইয়ের কয়েকটা দিন পরেই আজরাইলের হাতে আত্মসমর্পন করলেন।

পুত্রহারা উজির সাহেব এতদিনে উপলব্ধি করলেন–বেকসুর দেওয়ান সাহেবের উপর অন্যায়ভাবে চাপ সৃষ্টি করাতে আল্লাহতায়ালা নারাজ হয়েছেন তাঁর উপর। সন্তানের আত্মার মাগফিরাতের ইরাদায় তাই দেওয়ান সাহেবকে হাতের কাছে না পাওয়ায় তিনি ফরমান আলীর কাছেই এসে মা'ফি মেঙ্গে নিয়ে গেলেন।

উজির সাহেবকে খাস দীলেই মাফ করলেন ফরমান আলী সাহেব। কিন্তু সেই মাফ করার বরকতে তাঁর বহিনকে নিয়ে চিন্তা করায় হাত থেকে মাফ তিনি পেলেন না। বরং সে চিন্তা আরো জোরদার হয়ে উঠলো এখন। পাশা যেমন ছুটছিলো তেমন ছুটলে আর মুসিবত কিছু ছিল না। কিন্তু উল্টে গিয়েই গড়বড় হয়ে গেল। বখতিয়ার খলজীর চালচলনের বৈপরীত্যই এই চিন্তার পয়দা করলো। জোরদার চিন্তার তাড়নায় তাই ফরমান আলী সাহেবকে জোরদার বেগেই ছুটতে হলো বিহারে।

কয়েকদিনের ছুটি মঞ্জুর করিয়ে নিয়ে হুকুমাতের কয়েকজন অযোধ্যাগামী লোকের সাথে ফরমান আলী সাহেবও মগধের পথে পা বাড়ালেন। কথা হলো, এই লোকেরাই তাকে মগধের পূর্ব প্রান্তে পৌঁছে দেবেন।

বখতিয়ার খলজীর সদর দপ্তরে এখন লোক সমাগম কম। হুকুমাতের মাথা–মুরুব্বী তামামই এখন বাইরে। বাইরের লোকের আসা–যাওয়াও তাই অনেক কম হয়েছে এখন। এদিকে সেপাই–সৈন্যও প্রায় বিলকুলই লড়াই করতে চলে গেছে। সে জন্যেও সদর দপ্তরে ভিড়টা এখন পাতলা। রাজধানীর হেফাজতে যে স্থায়ী বাহিনী আছে, তাদের ছাউনি সদর দপ্তরের কার্যালয় আর হেরেম থেকে দূরে। সেপাইরাও সব ছাউনির মধ্যেই থাকে। শাস্ত্রী–প্রহরী ইতস্ততঃ পাহারা দিয়ে ঘুরছে। বালা মুসিবত দেখা দিলে খবর দেবে তারাই। খবর পেলেই এই মজুত বাহিনী তলোয়ার হাতে ছুটবে। তার আগে এদের কারো করার কিছুই নেই।

লোকজনের ভিড় নেই। দাপ্তরিক কাজকাম, মন্দা। হুজুরগণ গর হাজির। তাই পাহারাদার শান্ত্রী-প্রহরীর মাঝে স্বাভাবিক ভাবেই বেশ একটা গাফলতি এসে গেছে। কাজে কামে তারা অনেক ঢিলে হয়ে গেছে এখন। পাহারা দেয়ার অছিলায় এদিক ওদিক ঘুরছে আর ঝিমুচ্ছে। কেউ বসে বসে ঝিমুচ্ছে, কেউ বা হেঁটে হেঁটেই ঝিমুচ্ছে।

বখতিয়ার খলজীর বিহার শরীফের সদর দপ্তর আর হেরেমটা লাগালাগি। হেরেমের সাথেই পেছন দিকে বাগিচা। বড় বড় গাছ-গাছড়ার ছায়াঘেরা বন পরিষ্কার-পরিছন্ন। আগাছা বা গুল্মলতার আবিলতা নেই। হেরেমটার খিরকী দুয়ার খুললেই এই বাগান।

দীর্ঘদিন পর্দার মধ্যে আটকে থাকায় ইওজ খলজীর স্ত্রী হুসনে আরা সহ শিরান খলজীর স্ত্রী, আহম্মদ খলজীর স্ত্রী, এমনকি আলীমর্দান খলজীর সদ্য পরিণীতা নব বধূটি পর্যন্ত হাঁপিয়ে উঠেছিল। সদর দপ্তরের দিকে লোকের ভিড় কম, হেরেমের এই পেছন দিকের প্রশ্নই কিছু উঠেনা।

তখন বিকেল বেলা। খিরকী দুয়ার খুলে বাগানটা একদম নির্জন দেখে হেরেমের এই আউরাত কুল জোশের বশে হুড় হুড় করে বাইরে বেরিয়ে এলেন। বাগিছায় ঢুকে ঘাসের উপর জটলা করে সবাই তারা বসে পড়লেন। চার পাঁচজন অন্তঃপুরা, আর দু'তিন জন আশ-পড়শী মিলে প্রায় দশ বার জন আউরাত জটলা করে বসেই এরা এদের প্রিয়বস্তু খোশ-গল্পে মসগুল হয়ে গেল। বয়সটা সবারই অল্প। অনেকের খুবসুরাতটাও আকর্ষণীয়। নিরিবিলি এলাকা হেতু পর্দার বালাই নেই। বসন আর ব্যসনেও দুরস্ত ছিল প্রত্যেকেই। ফলে, বাগানটার এ অংশ উজালা হয়ে উঠলো।

বাগানের এই কেনার দিয়েই দিলারা বানুর সহোদর ফরমান আলী সাহেব ঘোড়া হাঁকিয়ে আসছিলেন। লক্ষ্য তার বখতিয়ার খলজীর সদর দপ্তর। কিন্তু সদর দপ্তরের পথ এটা ছিল না। সদর দপ্তরের খাস এলাকায় এসেও পথ দেখানোর লোকের অভাবে ফরমান আলী সাহেব সিধাদিক ফেলে এই ভুল দিকে এসেছিলেন। দু'একজন পাহারাদার পথের মধ্যে পেলেও তাদেরকে বসে বসে ঝিমুতে দেখে ফরমান সাহেব তাদের সুখ সাধনায় ব্যাঘাত ঘটানো সমীচিন বোধ করেননি। সিধা পথেই যাচ্ছেন- এই আন্দাজে উল্টা পথে এসেছেন।

আওরাত কুলের অনেকটা কাছাকাছি এসে সামনের দিকে চোখ তুলেই ফরমান আলী সাহেব ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরলেন। জিয়াদা খুবসুরাতের বিপুল এই নারী সমাবেশ ক্ষণকাল তীক্ষ্ণ নজরে জরিপ করে তিনি ফের যেদিক দিয়ে এসেছিলেন সেই দিকেই ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে এগুতে লাগলেন। কিয়ৎ দূর আসার পর জনৈক

প্রহরীকে দ্রুত পদে ছুটতে দেখে তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং প্রশ্ন করলেন তোমাদের সদর দপ্তরে যাওয়ার পথটা ভাই কোন দিকে?

প্রহরীটি খুব ব্যস্ত ছিল। পথটার প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করে সংক্ষেপে সে বললো-ঐ যে, ঐ দিকে।

যে পথ থেকে ফরমান আলী ফিরে এলেন সেটার দিকে প্রহরীটির দৃষ্টি আকর্ষণ করে ফের তিনি প্রশ্ন করলেন-ওটা?

ঃ ওটা হেরেমে যাওয়ার পথ।

ঃ হেরেম!

ঃ হ্যাঁ। ঐ তো একটু দূরেই হেরেম। ওটা হেরেমের পেছন দিক। ওটা পেরিয়ে সামনে গিয়ে বাঁয়ে ঘুরলেই হেরেমের সদর ফটক। ওপথে বাইরের লোকের চলা ফেরা নিষেধ।

প্রহরীটি পথ ধরলো। ফরমান সাহেব আবার তাকে বললেন- এই যে ভাই, শুনুন! ঐ যে ওদিকে অনেকগুলো আউরাত দেখলাম। ওরা কারা?

প্রহরীটি ঘাড় ঘুরিয়ে জবাব দিলো- সর্বনাশ! ওদিকে আপনি গিয়েছিলেন? ওগুলো হেরেমের আউরাত।

ফরমান সাহেব তাজ্জব হয়ে বললেন-হেরেমের! মানে ইখতিয়ার উদ্দীন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার সাহেবের-

ঃ হ্যাঁ- হ্যাঁ, উনারই।

ঃ উনারই?

ঃ জি, বিলকুল উনারই আউরাত।

আর কোন দিকে না চেয়ে প্রহরীটি তার লক্ষ্য পথে দৌড় দিলো। ফরমান আলীর চিন্তার গতি আচমকা এক ঘোরপাক খেলো।

বখতিয়ার খলজীর লড়াইয়ে যাওয়ার পয়গাম ফরমান আলী বিহারে এসেই পেয়েছিলেন। সদর দপ্তরে পৌঁছে সেখানে কর্মরত লোকজনদের পরিচয় দিয়ে বললেন- দেখুন, আমি জনাব বখতিয়ার সাহেবের ঘনিষ্ঠ একজন আত্মীয়। দিল্লী থেকে উনার সাথে মোলাকাত করতে এসেছিলাম।

বলেই তিনি দিল্লী সরকারের পাঞ্জা ও সনদপত্র দেখালেন। গুপ্তচর নয়, সম্মানিত মেহমান এবং খোদ হুজুরের আত্মীয়। দপ্তরের সকলেই সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন এবং ফরমান আলী সাহেবকে সমাদরে মেহমান খানায় নিয়ে গিয়ে তাঁর আহার বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিলেন।

ফরমান আলী সাহেবের মাথাটা সেই থেকেই কেবলই ঘুরপাক খেয়ে চলেছে। একজন অকৃতদার মুসলমান। আত্মীয়-স্বজন মা-বোন কেউ নেই। ছাউনি বাসী সেপাই

নিয়ে দেশ জয় করে বেড়াচ্ছেন। রাত কাটছে ছাউনীতে আর দহলীজে। তার আবার হেরেম! সেই হেরেমে ফের ডাগর ডাগর আউরাত। তাও আবার এক দুই জন নয়, এক সাথে এক পাল।

কায়দা কৌশল করে নানাজনকে নানাভাবে প্রশ্ন করছেন ফরমান আলী। জানতে চাইছেন বখতিয়ারের ইতিবৃত্ত। তকমাধারী আলেম থেকে অদনা আদমী পর্যন্ত যার সাথে যে বাৎচিৎ শোভা পায়, সেই ধরনের আলাপ করেই ফরমান সাহেব ভেতরের খবর বের করতে চাইছেন।

কিন্তু বখতিয়ার এক ছুটন্ত উল্কা। জ্বলে উঠেছে বিস্ফোরকের মতো। তার সাথে তাল রাখার তাকত্ অনেক লোকেরই ছিল না। তার অতীত সম্বন্ধে সুস্পষ্ট উপলব্ধিও ছিল না। বখতিয়ারের কার্যক্রমে, তার সাফল্যে ও দুঃসাহসে অধিকাংশরাই সেরেফ চমকে চমকে উঠছিল। অতি অন্তরঙ্গ কয়েকজন ছাড়া বখতিয়ারের সঠিক প্রতিকৃতি এই বিজিত ও সদ্য আমদানীকৃত লোকজনের, কর্মচারী বা চাকর নফরের দেয়ার সাধ্য ছিলনা। ফলে, অনুমান আন্দাজের উপর তারা যা কিছু আলাপ আলোচনা করতে লাগলো তাতে দানাদার কিছু ছিল না এবং এক এক জনের এক এক রকম উল্টা পাল্টা বক্তব্যের মধ্যে ফরমান সাহেব যা পেতে লাগলেন তার মধ্যে কেমন যেন সন্দেহের গন্ধটাই জোরদার হয়ে উঠতে লাগলো। ফলে, স্বাভাবিক বিচার বুদ্ধির ক্ষমতা তাঁর ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়তে লাগলো।

তাঁর এই সন্দেহটা পোক্ত করলো খানিকটা পরিস্থিতি, অধিকটা মেহমান খানার বাগানের এক মালী। নাম তার হেকমত খাঁ। সে একজন নও মুসলিম। রঙটা বেজায় কালো, দেহটা খুবই ক্ষীণ, দুই গালে দুই বিশাল আকার বাদুর ঝোলা গোঁফ। তার সবচেয়ে বড় পরিচয় সে একজন পয়লা নম্বরের আহম্মক। কিন্তু সে কখনও নিজেকে আহম্মক মনে করে না বরং ভাবে, সারে জাহানে নখে-গণা যে কয়টা চৌখা মগজের মানুষ আছে, সে তাদেরই পয়লা সারির একজন। অবশ্য তার কথা বলার কায়দা এমন দুরস্ত যে, যে কোন অচেনা লোকের পক্ষে হঠাৎ করে তাকে আহম্মক বলে ঠাহর করা শক্ত।

ফরমান আলী সাহেব আহার অন্তে মেহমান খানার বিছানার উপর গড়াগড়ি দিচ্ছিলেন। হেকমত খাঁ মেহমান খানার বারান্দার নীচে বাগানে কাজ করছিলো। এই সময় মেহমান খানার একপাশে দুই জন লোককে উচ্চস্বরে কথা বলতে শোনা গেল। কথা গুলো কানে পড়তেই ফরমান সাহেব উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন এবং সেই দিকে কান পেতে রইলেন।

লোক দুইজনের একজন বললো– আরে মালীক যদি এমন নেশাখোর আর মাতাল হয়, তাহলে চাকর বাকর কয়দিক তার দেখবে বলো? এমন হুজুগে হয়ে দিনরাত হৈ হৈ করে বেড়ালে মাইনে করা লোকেরা কয়দিন তার যথা সর্বস্ব সামলাবে?

দ্বিতীয় জন বললো– কিছু বাহাদুরী পেয়েছেনা? এটা সেই গরম!

ঃ এমনটি আর কতদিন–

ঃ সবুর করো– সবুর করো! একে হুজুগে তার উপর আবার তিন তিনটে জরু ঘরে থাকতেও ভাড়া করা এমন গাদা গাদা আউরাতের আমদানী! এর নসীব টলতে আর কয় দিন। এসো– এসো। আদার বেপারী হয়ে ওসব জাহাজের খবর করতে গেলে মারা পড়বে।

ঃ তাই– তাই। চলো–

লোক দুইটি চল গেল। হেকমত খাঁ ওদের কথা শুনে আপন খেয়ালে সশব্দে স্বগতোক্তি করলো বাবা, এরই নাম বাহাদুরী!

লোক দুইটি দরবারের এক উমরাহের পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে কথা বার্তা বলছিলো। তাদের এক সহকর্মীকে অন্যায়ভাবে প্রহার করেছেন উমরাহটি। সকাল বেলার ঘটনা। এটা এক্ষণে মালী–চাকর–কর্মচারী– সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে।

শুনে ফরমান সাহেব পুনরায় চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ভাবতে লাগলেন– কার কথা বলছে ওরা? বখতিয়ার কি? ধরন দেখে তো তাই মনে হয়। ব্যাপার কি?

এমন সময় ফুল নিয়ে ঘরে ঢুকলো হেকমত খাঁ। ফরমান আলীকে সালাম দিয়ে সে ফুলদানীতে ফুল সাজিয়ে রাখতে লাগলো। নানা কিসিমের চিন্তা মাথায় নিয়ে তার হাতের কাজ দেখতে লাগলেন ফরমান সাহেব। দেখতে দেখতে এক সময় তিনি হেকমত খাঁকে প্রশ্ন করলেন– তুমি কি এই মেহমান খানায় কাজ করো?

হেকমত খাঁ হাসি মুখে জবাব দিলো–জি হুজুর। আমি এখানকার মালী। হুজুরদের খেদমত করাই কাজ আমার।

ঃ তাই নাকি? তা তোমার নাম?

ঃ গোলামের নাম হেকমত খাঁ।

ঃ কতদিন ধরে আছো এখানে?

ঃ এই মাহিনা খানেক হলো।

ঃ সেরেফ এক মাহিনা?

ঃ জি হুজুর।

ঃ এর আগে কোথায় ছিলে?

ঃ হেরেমের বাগিচায়।

ঃ হেরেমের বাগিচায় মানে! অন্দর মহলে?

ঃ জি।

ফরমান আলী সাহেব উৎসুক হয়ে উঠলেন। ফের প্রশ্ন করলেন– কতদিন ওখানে ছিলে?

ঃ তা ঢের দিনই হবে।

ঃ ঢের দিন?

ঃ জি হুজুর। হেরেমের কাজে যে ইমানদার আদমী চাই।

ঃ তুমি খুব ইমানদার আদমী তাইনা।?

ঃ তা আর কি বলবো হুজুর। আমাদের খোদ হুজুরে আলাও আমার ইমানদারীর তারিফ করেন।

ঃ ভাল, ভাল। খুব ভাল। তা তোমাকে যদি গোটা কয়েক প্রশ্ন করি আমি, ইমানের সাথে তার সঠিক জবাবটা তুমি দেবে তো?

ঃ এ্যাঁ! সঠিক জবাব?

ঃ হ্যাঁ সঠিক জবাব।

চমকে উঠলো হেকমত খাঁ। একবার এক অচেনা মেহমানকে সঠিক জবাব দেয়ার ফলে, জানটাই তার খতম হতে বসেছিল। সে লোকও এমন ভাবে সঠিক জবাব চেয়েছিল। এলোকও ফের সঠিক জবাব চায়!

বটে! হেকমত খাঁ হুশিয়ার হয়ে গেল। ইয়ার্কি পেয়েছে নাকি এরা? হেকমত খাঁকে আহম্মক সমঝে নিয়েছে? ব্যাটারা ঘুঘু দেখেছে ফাঁদ দেখেনি! হেকমত খাঁ কোন হিকমতই জানে না? মাথায় তাঁর কোন বুদ্ধিই নেই? হেকমত খাঁর মাথায় যে ঘেলু কতটা আছে, তা ভালকরে বুঝিয়ে দেবো এবার। প্রশ্ন একবার করেই দেখুক– কেমন "হ্যাঁ" কে "না" আর "না" কে "হাঁ বানাবার জবরদস্ত তাকত্ রাখে এই হিকমত খাঁ।

হেকমত খাঁকে নীরব দেখে ফরমান আলী ফের প্রশ্ন করলেন কৈ, একদম নীরব হয়ে গেলে যে?

আর এক দফা চমকে উঠলো হেকমত খাঁ। বললো– এ্যাঁ! না–মানে কি যে বললেন হুজুর?

ঃ কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাইলাম–

হেকমত খাঁ উৎসাহ ভরে বললো– হ্যাঁ হ্যাঁ, করুন হুজুর করুন!

ঃ আচ্ছা, বখতিয়ার সাহেবের অন্দরে যে আউরাত গুলো আছেন, তাঁরা তো তোমাদের বখতিয়ার হুজুরের কেউ নয় তাই না?

ঃ না হুজুর, তামাম গুলোই বখতিয়ার হুজুরের আউরাত।

ঃ মানে! বখতিয়ার তো অবিবাহিত?

ঃ না হুজুর, তিনি বিবাহিত। তিন তিনটে তাঁর জরু।

ঃ সেকি!

আসমান থেকে জমিনের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন ফরমান আলী সাহেব। এসব কি শুনছেন তিনি! ফরমান সাহেব প্রতিবাদ করে বললেন– না, এ অসম্ভব! তুমি মিথ্যা কথা বলছো।

ঃ না হুজুর, আমি বিলকুল সত্যি কথা বলছি। মিথ্যা আমি এক বিন্দুও বলি না। ঐ আউরাত গুলোও তামামই বখতিয়ার হুজুরেরই আউরাত। উনি ছাড়া ওদের আর দুস্রা মালীক নেই।

ঃ এসব কি বলছো তুমি?

ঃ আমরা গরীব মানুষ হুজুর। আমরা সত্যি কথা বললেও বড় লোকেরা ভাবেন, আমরা মিথ্য কথা বলছি।

ঃ তাজ্জব! উনি তাহলে নেশা টেশাও করেন নাকি?

ঃ হরদম। নেশা না করলে খামাখা মানুষ এত হুজুগে আর খামখেয়ালী হয়?

ফরমান আলীর সারা শরীরে কাঁপন ধরে গেল। আর তাঁর প্রশ্ন করার রুচি বা খাহেশ কিছুই রইলো না। রাস্তার ঐ প্রহরীটাও বলেছে– তামাম আউরাত বখতিয়ারের। আউরাতদের তিনি স্বচক্ষে দেখছেনও। একটু আগেও দুজন লোক এমন কথাই বললো। মালীটাও ফের ঐ একই কথা বলছে। আর কত প্রামাণ তাঁর দরকার?

ফরমান আলী সাহেব বিছানার উপর উঠে বসে হেকমত খাঁর সাথে বাক্যালাপ করছিলেন। ফের তিনি টান হয়ে বিছানার উপর শুয়ে পড়লেন। উঃ! বখতিয়ার খলজী এমন এক লম্পট আর নাফরমান!

ফরমান আলীকে শুয়ে পড়তে দেখে হেকমত খাঁ প্রশ্ন করলো– হুজুর, আর কিছু জিজ্ঞেস্ করবেন?

ফরমান সাহেব কোনমতে জবাব দিলেন– না, তুমি যাও এখন–

বুদ্ধির যুদ্ধে প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করার আনন্দে হেকমত খাঁ হাসি মুখে আর বিজয় গর্বে ফুলতে ফুলতে বেরিয়ে গেল। ফরমান আলী সাহেব পেরেশান দীলে রাতখানা ঐ মেহমান খানায় কাটিয়ে সবেরাতেই বিহার শরীফ ত্যাগ করলেন এবং নিদারুণ মর্মব্যথা বুকে নিয়ে কোন মতে দিল্লীর বুকে ওয়াপস্ এলেন।

ফরমান সাহেব নিজ মাকানের প্রবেশ করতেই সামনে পড়লেন হাজেরা বিবি! ফরমান সাহেবের হালত দেখেই তিনি চমকে উঠলেন। এ যেন ফরমান আলী সাহেব নন, তাঁর এক বিধ্বস্ত প্রতিমূর্তি। চোখ মুখের চেহারা একদম বিবর্ণ হয়ে গেছে। গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়েছে চোখ। শরীরটা কয়দিনেই নেমে এসেছে অর্ধেকে।

বিষণ্ণ ও বিপর্যস্ত মুখাকৃতি দেখেই হাজেরা বিবি বুঝতে পারলেন– কোন খোশ খবরের আলামত এটা নয়। তিনিও তাই সঙ্গে সঙ্গে কোন রকম সওয়াল জবাবে গেলেন না। সওয়াল জওয়াবের পরিবর্তে পরিশ্রান্ত খসমের শ্রান্তি বিমোচনে তিনি তৎক্ষণাৎ আত্ম নিয়োগ করলেন।

ফরমান আলী সাহেবও মকানে ওয়াপস্ এসে তৎক্ষণাৎ কোন কথা বললেন না। বিরাম বিশ্রাম অন্তে কিঞ্চিৎ সুস্থ হওয়ার পর তিনি হাজেরা বিবিকে ধীরে ধীরে তামাম ঘটনা বয়ান করে শুনালেন। শুনে হাজেরা বিবি নিস্পন্দ হয়ে গেলেন। আহাজারী বা আফসোসের জবান টুকুও হারিয়ে ফেললেন তিনি। একটু থেমে ফরমান আলী ফের অসহায় কণ্ঠে বললেন– এমন খবর দিলারাকে এখন বলা যায় কি করে এইটাই হলো–

দিলারা বানু আগেই এসে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কি এক কাজে এই কক্ষে আসতে গিয়ে এসব কথা কানে পড়তেই ওখানে তিনি দাঁড়িয়ে যান। ফরমান আলী সাহেবের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে তিনি ধীর অথচ অটল কণ্ঠে বললেন– আমাকে নিয়ে পেরেশান হতে হবে না ভাইজান। খবরটা যে এই রকম কিছু একটা আসবে– তা আমি আগে থেকেই জানতাম আর সেই মোতাবেক দীলকে আমি তৈয়ার করে নিয়েছি।

স্বামী-স্ত্রী উভয়েই আড়ষ্ঠ হয়ে গেলেন। বলার কিছুই কারো মুখে যোগালো না। দিলারা ফের বললেন– এ নিয়ে আর আফসোস আমার নেই। আফসোস সেরেফ একটাই যে, এমন মানুষের আকলাখও যখন এই, তখন বিশ্বাস করার মতো দুনিয়ায় আর একটা মানুষও রইলো না।

লহমা খানেক নিস্পন্দ আর নীরব থাকার পর ফরমান আলী সাহেব অস্ফুট কণ্ঠে বললেন– দিলারা!

দিলারা বানু তার আগেই সরে পড়েছেন ওখান থেকে।

পরের দিনই ফরমান আলী পিতার পত্র পেলেন। পত্রে দেওয়ান জান মোহাম্মদ সাহেব পুত্রকে জানিয়েছেন, আল্লাহ তায়ালার অশেষ রহমতে রাহা যখন সাফা হয়েই গেল, তখন বখতিয়ার খলজীর সাথে দিলারা বানুর সাদীর মাঝে আর কোন বালা মুসিবত নেই। বখতিয়ার খলজীর সাথে জলদী জলদী যোগাযোগ স্থাপন করে এদের সাদীর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হোক।

ফরমান আলী সাহেব সেইদিনই পিতার পত্রের জবাব পাঠিয়ে দিলেন। পিতাকে তিনি লিখলেন– বখতিয়ারের ঘরে তিন বিবি বর্তমান। তার বহিন গিয়ে চতুর্থ বিবির শূন্য স্থান পূরণ করুক–এমন খাহেশ তাঁর বা তাঁর বহিন দিলারার বিন্দুমাত্রও নেই।

নয়

নদীয়া বিজয় শেষ হলো। তিন দিন যাবত অফুরন্ত গনীমাত্ আহরণ অন্তে নদীয়ার বুকে মুসলমানদের হুকুমাত মজবুত ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হলো। অতঃপর তামাম ফৌজ কাতার বন্ধ করে বখতিয়ার খলজী হাঁক দিলেন– ভাইসব, রাজার সাথে মোকাবেলা আমাদের খতম। বাঙ্গলা মুলুকের বাঘ, সেনকুলের কুলমণি রাজাধিরাজ লক্ষ্মণ সেন জম্বুবৎ পালিয়ে গেছেন আত্মীয় স্বজন, আউরাতকুল, প্রজামণ্ডলী ও সেই সাথে শহর বন্দর রাজ নিবাসের যথা সর্বস্ব ফেলে। রাজার পালা খতম। সামনে এবার রাজধানী। রাজধানী গৌড়মণ্ডল। গৌড়ে চলো–

একেশ্বরবাদের আওয়াজ তুলে দূর্বার বেগে ছুটলো ফের দ্বীন ইসলামের ঝাণ্ডাবাহী জানবাজ সৈনিকেরা। অসংখ্য অশ্ব পদের দূরন্ত আঘাতে বখতিয়ারের গতিপথ আদিগন্ত প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। চমকে উঠলো বনারণ্য। পথের ধূলা ছুটতে লাগলো আসমানের সন্ধানে। তৌহিদের অমর বাণীর আত্মীক আকর্ষণে বাঙ্গালা মুলুকের ঘুনে ধরা সামাজিক অনুভূতি ভিত সমেত কম্পিত ও তোলপাড় হতে লাগলো। নয়া আবেগ, নয়া চেতনা ও নয়া দিগন্তের ইশারায় বখতিয়ারের গতি পথের দুই প্রান্ত আন্দোলিত হতে লাগলো। বাদশাহ– ফকির এক, উচ্চ নীচ ভ্রাতৃবৎ, ব্রাহ্মণ-শূদ্র ভেদ মুক্তঃ মানবিকতার এই অকল্পনীয় বন্যা কৌলিন্য প্রথার চাতুরীগত ভিতে বিপুল বেগে আঘাত হেনে যেতে লাগলো।

নদীয়া থেকে গৌড় বা লক্ষ্মণসেনের লক্ষ্মণাবতী অনেক দূরের পথ। বখতিয়ার খলজীর বাহিনী কুসুমাস্তীর্ণ পথের মতো সুদীর্ঘ এই রাহা বিনা বাধায় অতিক্রম করে চলে এলো। বখতিয়ারের গতি পথের নগর-বন্দর-শহরে পাক ইসলামের সুদীপ্ত পতাকা আতস বাজীর উৎসব মাফিক একের পর এক উড্ডীন হলো স্বয়ংক্রিয় গতিতে।

নদীয়া জয় করার পর বখতিয়ার খলজী সসৈন্যে নদীয়তেই হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন–নদীয়ারাজের রাজধানী গৌড় জয়ে আসবেননা– এ বিশ্বাস গৌড়ের কোন বাতুলেও করেনি। ফলে, বখতিয়ার তার বাহিনী নিয়ে গৌড়ে প্রবেশ না করতেই, সুরক্ষিত গৌড় এতিমের মতো অসহায় হয়ে গেল। রাজধানীতে অবস্থিত লক্ষ্মণসেনের বাহিনী রাজধানী ত্যাগ করে দূরে গিয়ে দাঁড়ালো এবং দূর থেকে পরিস্থিতিটা পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো। তাদের পরিকল্পনা পরিষ্কার। যদি বখতিয়ারের বাহিনীটা এঁটে ওঠার মতোন হয়, তাহলেই তারা সে বাহিনীর মোকাবেলায় এগুবে, অন্যথায় ওখান থেকেই উধাও হয়ে যাবে।

রাজধানীর এই বাহিনী গিয়ে কিয়ৎদূরে অবস্থান নেয়ার পর একটা ভিন্নতর পরিস্থিতির উদ্ভব হলো। বিভিন্ন স্থানের পলায়নরত সেনা সৈন্যের দীলে লড়াই করার নতুন এক সাহস ও খাহেশ পয়দা হলো। নদীয়া, শরকীগলি ও তেলিয়াগড় সহ বিভিন্ন স্থানের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সেপাই-সৈন্য এসে এদের সাথে সামিল হতে লাগলো। ফলে, রাজধানীর এই বাহিনী ক্রমান্বয়ে, বিশাল আকার ধারণ করলো। ভেগে-পড়া কয়েকজন সেনাপতির নেতৃত্বে বখতিয়ারের সাথে চূড়ান্ত এক মোকাবেলার উম্মিদ নিয়ে এই নয়া বাহিনী তৈয়ার হলো এবং রাজধানীর উপকণ্ঠে এগিয়ে এসে ওঁৎ পেতে রইলো।

বখতিয়ার খলজীর গতি সর্বত্রই অসামান্য। সাধারণের পক্ষে তাল রাখা দুঃসাধ্য। এখানেও ব্যত্যয় তার ঘটেনি। তাঁর বিপুল বাহিনীর সামান্য এক অংশ নিয়ে বখতিয়ার খলজী গৌড় এসে সর্বাগ্রে হাজির হলেন এবং অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি দিয়ে প্রতিপক্ষের অস্তিত্ব ও অবস্থান তালাশ করে ফিরতে লাগলেন।

বখতিয়ারের সাথে ছিল শদাবধি অশ্বারোহী। রাজবাহিনীর চর এটা পর্যবেক্ষণ করে গিয়ে রাজবাহিনীর সেনানায়কদের এই তথ্য পেশ করলো যে, সেরেফ একটা গুজব শুনেই খামাখা তারা প্রাণ রক্ষার্থে ছুটোছুটি করছে, আর ছুটোছুটি করতে হবে যাদের তারাই তাদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

সেনানায়কদের প্রশ্নোত্তরে চর তাঁদের জানালো যে- বখতিয়ার খলজীর সৈন্য সংখ্যা নখে গণা কয়েকজন। অশ্বারোহী হলেও তাদের এই এক সহস্র সেপাইয়ের জলযোগের যোগ্যও তারা নয়। এই পয়গাম পেয়েই দ্বিগুণ বিক্রমে লাফিয়ে উঠলো গৌড়ের এই বাহিনী। মার মার রবে সবাই তারা রাজধানীতে ওয়াপস্ এলো। কিন্তু এদের বদনসীব! ইতি মধ্যেই বখতিয়ার খলজীর পিছিয়ে পড়া কয়েক সহস্র অশ্বারোহী ফৌজের তামামই গৌড়ে এসে পৌছেছিল। "জয় মা তারা" আওয়াজ দিয়ে তারা বখতিয়ারের বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সাথে সাথে কয়েক সহস্র অশ্বারোহী এই পদাতিক সেপাইদের এমন তাড়া করলো যে, অশ্বের গতি ডিঙ্গিয়ে কেউ তারা পালিয়ে যাবার অবকাশটাও পেলো না। "জয় মা তারা" আওয়াজটা মুখের মধ্যে থাকতেই তাদের কিয়দংশ সঙ্গে সঙ্গে কয়েদ হলো আর বাদবাকীরা লাশ হয়ে গড়িয়ে পড়লো। ঐ ভুল এক তথ্যের জন্যে ফাঁকে থাকা এই বিপুল সংখ্যক সৈনিক সেধে এসে ঝাঁপ দিলো আগুনে আর প্রাণ দিলো পতঙ্গপ্রায়।

আসমান জমিন পুনর্বার প্রকম্পিত হয়ে উঠলো "আল্লাহু আকবার" আওয়াজে। গৌড়ের আকাশ চমকে দিয়ে সগৌরবে উড়ে উঠলো মুসলামানদের বিজয় নিশান।

বখতিয়ার খলজী অশ্বের লাগাম আপততঃ টেনে ধরলেন। খোলা তলোয়ার আপাততঃ খাপ বন্ধ করলেন। অপাততঃ ছেদ পড়লো তার দূরপ্রসারী দৃষ্টিপাতে। এই গৌড়কেই রাজধানী রূপে ঘোষণা দিয়ে বাংলা মুলুকের পয়লা সুলতান ইখতিয়ারউদ্দীন

মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী আনুষ্ঠানিক ভাবে বাঙ্গালার তখতে আরোহণ করলেন। বাস্তব হলো বখতিয়ারের আজন্মের খোয়াব। হাসিল হলো বখতিয়ারের আবাল্যের উম্মিদ। গরমশিরের মেঘে ঢাকা দেদীপ্যমান সূর্য শত শিখায় ফুটে উঠলো বাঙ্গালা মুলুকের আসমানে। তৌহিদের অনির্বান পূত- পূণ্য দীপ গুমরাহীর অন্ধকার দূর দুরান্তে ঠেলে দিয়ে আলোর বন্যা ছড়িয়ে দিলো গৌড়ের পথে প্রান্তরে।

লক্ষ্ণ সেনের রাজধানী গৌড় বা লক্ষ্ণণাবতী অতঃপর লাভ করলো-"লাখনৌতি" পরিচিতি।

মসনদে আরোহণ করার পর বখতিয়ার তার বন্ধুদের সেনানায়ক বা সালার পদে অলংকৃত করলেন। এরপর গৌড়কে কেন্দ্র করে তার চারপাশের এলাকায় কওমী ঝাঁণ্ডা উড়িয়ে দিতে বন্ধু সালার ইওজ খলজী, শিরান খলজী, আলীমর্দান খলজী ও আহম্মদ খলজীকে বখতিয়ার তলোয়ার হাতে পাঠিয়ে দিলেন। এমনিতেই তুর্কী হামলার আতংক আগে থেকেই মগধ ও বাংলার বুকে বিরাজমান ছিল, তার উপর নদীয়ার পতন ও গৌড় বাহিনীর শোচনীয় ঐ পরিণতির খবর চার দিকে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে সে আতংক আরো তীব্র হয়ে উঠলো। ফলে, বখতিয়ারের সেনাপতিরা অগ্রসর হওয়া মাত্রই গৌড় বা লাখনৌতির চার পাশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিপত্তিগুলো উর্দ্ধশ্বাসে পূর্ববঙ্গে ছুটলো, লাখনৌতির চারপাশের বিশাল ভূখণ্ড শত্রু মুক্ত হলো এবং সর্বত্র ইসলামের পতাকা উড়তে লাগলো।.

লাখনৌতির তখতে বসে কিছু সময় সুলতানী করার পর বখতিয়ার একদিন তার বন্ধুদের দরবার কক্ষে ডেকে নিয়ে এক অন্তরঙ্গ পরিবেশে বললেন- বন্ধুগণ, আমি মনেপ্রাণে এক সেপাই। রাজ্য জয়ের পর সেই রাজ্য ভোগ করার লালচে সেপাই আমি নই। আমি দ্বীন ইসলামের সৈনিক। ইসলামের আলোকবর্তিকা, তৌহিদের চেরাগ দূর দূরান্তে বয়ে বেড়ানোর মধ্যেই আমার আনন্দ। বসে বসে রাজ্যভোগে নয়। তলোয়ারে মরিচা ধরিয়ে রেখে প্রশাসনের লাঙ্গল চষা আমার একদম অসহ্য। প্রশাসনের হাল বাইবে তোমরা। আমি দেবো জমিন, জমিনকে কায়েমী করবে তোমরা। জমিন চষে ফসল ফলাবে তোমরা। জমিনকে সেই কায়েমী করার ব্যাপারে দুটি পরামর্শ আমি তোমাদের দিতে চাই। আমার এ পরামর্শ কার্যকর করতে তোমরা কেউ তকলিফবোধ করবেনা-এ অনুরোধও সেই সাথে রাখবো আমি।

ব্যস্ত ভাবে ইওজ খলজী বললো- আমরা জানি, দোস্ত আমাদের বীরই নয়, অত্যন্ত বুদ্ধিমানও বটে। সেরেফ তলোয়ারের জোরেই দোস্ত আমাদের আজকের এই কামিয়াবীর উচ্চ শিখরে উঠেনি, তলোয়ারের সাথে তার সুতীক্ষ্ণ মস্তিষ্কের সংযোগ ছিল বলেই সম্ভব হয়েছে এতটা। কাজেই তার যে কোন নসিহতকেই আমরা আমাদের চলার পথের পরম পাথেয় মনে করবো।

শিরান খলজী বললো–আমরা দেখেছি এবং শুনেছি, একটা মুলুক জয় করাটা তত কঠিন নয়, যত কঠিন সেই মুলুকে নিজ অধিকার টিকিয়ে রাখা।

বখতিয়ার ফের যোগ দিয়ে বললেন–বিশেষ করে সে মুলুক যদি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের আবাসভূমি হয়।

হাজেরান মসলিস সমস্বরে সমর্থন দিয়ে বললো–ঠিক ঠিক, বিলকুল কায়েমী কথা।

বখতিয়ার খলজী বললেন–মসনদে অধিষ্ঠিত সুলতান আর তার সেপাইরাই শুধু তলোয়ারের বলে একটা রাজ্য যুগ যুগ ধরে টিকিয়ে রাখতে পারেনা। একটা রাজ্য বা কোন কওমের একটা হুকুমাত তখনই টিকে থাকে, যখন সেই মুলুকের সার্বভৌমত্ব বা সেই কওমের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব সেই মুলুকের বাসিন্দার উপর বর্তে। এ মুলুকের অধিবাসীরা হিন্দু। অনার্যদের মুলুক অনার্যদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এই আর্য হিন্দুরা দীর্ঘদিন এই মুলুকে আধিপত্য করে আসছে। এরা চাইবেনা, এ রাজ্যে ইসলামের অনুশাসন আর মুসলমানদের হুকুমাত কায়েম থাকুক। এটা চাইবে এ মুলুকের মুসলমানেরা।

সকলেই ফের সমর্থন দিয়ে বললো–জরুর জরুর।

বখতিয়ার ফের বললেন–অতএব, বাঙ্গালা মুলুকে মুসলমানদের সংখ্যা এবং হুকুমাতের শুভাকাঙ্খীদের সংখ্যা দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি করা এখন আমাদের জন্যে ফরয্।

এবার আলী মর্দান প্রশ্ন করলো–মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা মানে তো হিন্দুদের মুসলমান করা?

জবাবে বখতিয়ার খলজী বললেন–না, করা নয়। যাতে করে তারা নিজেরাই স্বইচ্ছায় ইসলাম কবুলে আগ্রহী হয়, সেই পরিবেশ পয়দা করা। কিন্তু তার আগে এক্ষণে আমাদের প্রয়োজন মুসলমান সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। যে সব মুসলমান এই হিন্দুস্থানে আছেন বা বাইরে থেকে আসছেন, তাঁদের আগে বাঙ্গালা মুলুকে স্থায়ীভাবে বসবাস করায় আকৃষ্ট করা। তাদের জন্যে মসজিদ, মাদ্রাসা, এবং ধর্মপ্রচারে নিয়োজিত সুফী সাধকদের আকৃষ্ট করার জন্য খানকাহ শরীফ, মুসাফিরখানা ও অন্যান্য সেবামূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা। এসব সুযোগ সুবিধে দেখে তারা এসে এদেশে বসবাস শুরু করলেই একটা সুষ্ঠু মুসলমান সমাজ আপছে আপ গড়ে উঠবে। মুসলমানদের সুন্দর ও পবিত্র জীবনযাত্রা দেখলে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরাও তখন নিজেরাই মুগ্ধ হয়ে সানন্দে ইসলাম কবুল করবে। তর তর করে বৃদ্ধি পাবে মুসলমানদের সংখ্যা।

শিরান খলজী বললো–সোবহান আল্লাহ!

ইওজ খলজী সহকারে অন্যান্যরা বললো–মারহাবা! মারহাবা!

আহম্মদ খলজী বললো–মা'শা আল্লাহ একটা দিক পরিষ্কার হলো। মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির সুন্দর পথ পাওয়া গেল। এখন ওটা? মানে মুসলমানদের হুকুমাতের শুভাকাঙ্খীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা কথাটার অর্থ?

বখতিয়ার খলজী জবাবে বললেন–অর্থ এই যে, এই দেশবাসী, বিশেষকরে নিম্ন বর্ণের হিন্দুরা, কৌলিণ্য প্রথার যাঁতাকলে দীর্ঘদিন যাবত নিষ্পেষিত হয়ে আসছে। এই নির্যাতন থেকে নাজাত পাওয়ার উম্মিদে তারা দিওয়ানা হয়ে উঠেছে। হন্যে হয়ে তারা মুক্তির রাহা খুঁজে বেড়াচ্ছে। ইসলামের নির্দেশিত সহনশীলতা এবং বিধর্মীদের প্রতি ইসলাম প্রদত্ত সহানুভূতিশীল আচরণের দিকে আমরা যদি যত্নবান হই, এই নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ইসলামের আদর্শ দেখেই মুসলমানদের হুকুমাতের শুভাকাঙ্খীতে রূপান্তরিত হবে। কৌলিণ্য প্রথার জুলুম থেকে নাজাত পাওয়ার আনন্দেই তারা এই হুকুমাতের দীর্ঘায়ু কামনা করবে। ঐ নিষ্পেষণে তারা আর ফিরে যেতে চাইবে না।

তাজ্জব হয়ে ইওজ খলজী বললো–সাব্বাস্ দোস্ত্! এত গভীর তোমার চিন্তা শক্তি!

বখতিয়ার খলজী বললেন– এতো আমার কোন নিজস্ব চিন্তা নয় দোস্ত্! যে কোন দানেশমান্দ ও বিবেকবান ইনসানেরই চিন্তা ইনসানের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া ও সদাচরণ করা। সদাচারীদের বন্ধু বা শুভাকাঙ্খীর অভাব আল্লাহ তায়ালার এই দুনিয়ায় খুব একটা হয় না।

আহম্মদ খলজী বললো– ঠিক ঠিক! এবার তাহলে বলুন, আমাদের কাকে কি করতে হবে?

ঃ সবার আগে আপনার প্রতি আমার অনুরোধ, আমাদের প্রায় অর্ধেক ভাগ এখনও বিহার শরীফে পড়ে আছে। আপনি গিয়ে অচিরেই তাদের নিয়ে আসুন। সাথে আরো সঙ্গী সাথী নিয়ে আমাদের মা–বোন, বাল–বাচ্চা, চাকর–নফর, কর্মচারী–কর্মকর্তা এবং সদর দপ্তরের তামাম আনযাম লাখনৌতিতে পার করুন। আর অস্থায়ী নয়, এখন আমাদের স্থায়ী দপ্তর এই লাখনৌতি। এইটেই আমাদের মঞ্জিল, এই বাঙ্গালাই আমাদের মুলুক।

জবাবে আহম্মদ খলজী বললো– উস্তাদজী নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, এ দায়িত্ব আমি ইমানের সাথে পালন করবো।

ঃ বহুৎ আচ্ছা। এবার দোস্ত ইওজ খলজী আর শিরান খলজীর উপর দায়িত্ব রইলো– তারা আমাদের এই অধিকৃত এলাকার সর্বত্র ঘুরে ঘুরে জনসাধারণের সুখ দুঃখের সাথে একত্ব ঘোষণা করবেন। সেই সাথে মুসলমানদের নামাজের জন্য মসজিদ, তাদের বালবাচ্চাদের শিক্ষার জন্য মাদ্রাসা, সুফী সাধকদের জন্যে খানকাহ

প্রতিষ্ঠা– অর্থাৎ মুসলমান সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াকে মূলমন্ত্র করে নিয়ে এ মুলুকের শাসন কার্য পরিচালনা করবেন। আর বন্ধুবর আলী মর্দানের নজর থাকবে দুষমনদের উপর। এ মুলুকের তিনদিকেই এখন হিন্দু মুলুক। আপাততঃ পূব এবং দক্ষিণ সীমান্তের হেফাজতি বন্ধুবর আলী মর্দান নিশ্চিত করবেন।

আলী মর্দান সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করলো– উত্তর সীমান্ত?

ঃ ও দায়িত্ব আমার। আমি আগেই বলেছি– তলোয়ারে মরিচা পড়ুক, এটা আমার অসহ্য। তলোয়ারে জং ধরলে বেঁচে থাকার কোন অবলম্বনই আর আমার থাকবে না।

বলতে বলতে বখতিয়ার খলজী উদাস হয়ে উঠলেন। একমাত্র ইওজ খলজী ছাড়া এ উদাসীনতার মর্ম কেউ বুঝলোনা। ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস চেপে ইওজ খলজী বললো– দোস্ত্!

বখতিয়ার খলজী বললেন– আমি যাবো তলোয়ার হাতে উত্তরে। আমাদের বাহিনীর ছোট্ট একটা অংশ হলেই চলবে আমার। লাখনৌতি থেকে উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা। এর কোল ঘেষে আছে কিছু উপজাতির বাস। দ্বীন ইসলামের চেরাগটা আমি ওখানেও জ্বালিয়ে দিয়ে আসবো।

শিরান খলজী চিন্তিত কণ্ঠে বললো–কিন্তু আপনি একা–

বখতিয়ার খলজী হাসলেন। স্মিতহাস্যে বললেন–একা দেখলে কোথায়? একাতো নই। আল্লাহ তায়ালা আমার সঙ্গে আছেন।

ঃ উস্তাদ!

ঃ মাৎ ঘাবড়িয়ে!

ফের ছুটলো বখতিয়ারের তাজী। পেছনে তার এক সহস্র অশ্বারোহী। এলাকার পর এলাকা তাঁর সামনে নতি স্বীকার করে পাক ইসলামের পতাকা উড়িয়ে দিতে লাগলো। লাখনৌতি বা গৌড় থেকে উত্তর দিকে অনেক পথ অতিক্রম করে আসার পর বখতিয়ারের সামনে পড়লো সুদৃশ্য এক নগর। নগরের নাম দেবকোট। অতীতে দেবকোট পার্বত্য এলাকার এক রাজার আনন্দপুরী বা আনন্দ ভবন ছিল। লক্ষ্মণসেন তাঁর জিন্দেগীর আউয়াল ওয়াক্তে একবার এই দেবকোটের উপর আধিপত্ব বিস্তার করেন। এক্ষণে দেবকোটের শাসনকর্তা এক বর্ণ হিন্দু রাজকীয় কায়দায় স্বাধীন ভাবে দেবকোটে শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করছিলেন। বখতিয়ার খলজীর আগমন বার্তা পেয়েই তিনি সপরিবারে পার্বত্য এলাকায় পালিয়ে গেলেন। দেবকোটের সেপাইরা অধিকাংশই নিম্নবর্ণের হিন্দু। তারা প্রতিরোধ গড়ে না তুলে খোশ আমদেদ জানিয়ে বখতিয়ারকে বরণ করে নিলো।

বখতিয়ার প্রীত হলেন। তিনি খোশদীলে তামাম এই সেপাইদের নিজ দলের অন্তর্ভুক্ত করলেন। বখতিয়ার ও তাঁর সেপাইদের বেরাদর মাফিক আচরণ ও বৈষম্যহীন ব্যবহারে দেবকোটের এই সেপাইরা মুগ্ধ হয়ে গেল এবং অল্পদিনের মধ্যেই তারা বখতিয়ারের অন্যতম অনুগত ও বিশ্বস্ত দলে পরিণত হলো।

উড্ডীন হলো পাক ইসলামের ঝান্ডা। দেবকোটের হৃদয়গ্রাহী প্রাকৃতিক দৃশ্য ও সুরম্য নগর পরিকল্পনা বখতিয়ারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। স্পর্শ করলো বখতিয়ারের দীল। ফলে, দেবকোটকে বখতিয়ার তার উপ–মোকামের মর্যাদা দিয়ে এখানে এক সেনানিবাস স্থাপন করলেন।

অতঃপর ফের ছুটলেন বখতিয়ার। দেবকোট থেকে একটানা পূবদিকে ছুটে তিনি আর এক পাহাড়ী রাজার অধিকারভুক্ত এক সমভূমিতে হাজির হলেন। যুদ্ধের নামে সামান্য এক প্রতিরোধ পয়দা করে রাজা তাঁর ফৌজ নিয়ে পশ্চাৎ ধাবন করলেন। সমভূমিটা তামামই বখতিয়ার খলজীর হস্তগত হলো। বখতিয়ার এখানে এক নগর প্রতিষ্ঠা করলেন। নাম দিলেন রঙ্গপুর।

এরপর পুনরায় উত্তর দিকে অগ্রসর হলেন বখতিয়ার। অগ্রসর হতে হতে একদম হিমালয়ের কাছাকাছি চলে এলেন। পর পর তিন তিনটি উপজাতির বাস ছিল এই অরণ্য ঘেরা পার্বত্য এলাকায়। কোচ, মেচ, থারু নামের তিন তিনটি উপজাতি হিমালয়ের এই পাদদেশকে তিন ভাগে ভাগ করে নিয়ে তারা দখল করে বসে ছিল। এরা খুবই দুর্ধর্ষ ও বন্য। কিন্তু উপকারীর প্রতি এদের কৃতজ্ঞতা বোধ প্রকট। উপকারীর জন্যে এরা জান কোরবান করতে হরগিজ তৈয়ার। এদের মধ্যে সর্বাধিক শক্তিশালী উপজাতির নাম মেচ।

প্রচন্ড না হলেও বেশ এক শক্ত লড়াই লড়ার পর বখতিয়ার খলজী কোচ উপজাতিকে পরাস্ত করে তাদের এলাকা দখল করে নিলেন। এর পরেই মেচ উপজাতির এলাকা। মেচেরা বড় বেশী বেপরোয়া। এ খবর বখতিয়ার খলজী আগেই সংগ্রহ করেছিলেন। মেচ সর্দার আল্‌লু মেচ অত্যন্ত পরাক্রমশালী, দুর্দান্ত ও বিশেষ ধী সম্পন্ন ব্যক্তি হিসাবে সুপ্রসিদ্ধ ছিল।

এই মেচ এলাকার দিকে এবার পা বাড়ালেন বখতিয়ার। মেচ এলাকায় এসে কিয়ৎ দূর এগুতেই প্রতিরোধের পর প্রতিরোধ সামনে আসতে লাগলো। আদমী– আউরাত, বুঢঢা– বাচ্চা, তামাম কিসিমের মেচ তীর ধনুক লাঠি বল্লম সহকারে বখতিয়ারকে রুখে দাঁড়াতে লাগলো। এরপর সামনে এলো খোদ আল্‌লুমেচ। তার সঙ্গে এলো দুর্ধর্ষ পাহাড়ী ফৌজ।

দুই দলে চরম লড়াই শুরু হলো। মেচ জাতিরা অশ্বারোহী ও জানবাজ তুর্কী ফৌজকে এঁটে উঠতে না পারলেও, পিছু তারা হটলো না। সারাদিনের লড়াই শেষে সাম ওয়াকে ওখানেই তারা ওঁৎ পেতে রইলো। বখতিয়ারও মেচদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে ওখানেই ছাউনী ফেলে রাত্রি যাপন করতে লাগলেন।

রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর পেরিয়ে গেছে। ঢলে পড়েছে কৃষ্ণ পক্ষের শেষ প্রহরের জোৎস্না। বখতিয়ার তার ছাউনি থেকে বেরিয়ে এলেন। মেচদের অবস্থান ও গতিবিধি দেখার জন্যে তিনি আশে পাশে সন্তর্পনে ঘুরতে লাগলেন। তার দেহরক্ষী অনুচরেরা আশে পাশেই রইলো। ঘুরতে ঘুরতে বখতিয়ার তার ছাউনি থেকে কিয়ৎ দূরে ছায়াঢাকা বনারণ্যের ভেতরে এক খোলা জায়গায় চলে এলেন। এই সময় তার কানে এলো এক কচি শিশুর কান্না।

সঙ্গে সঙ্গে বখতিয়ার তার তলোয়ারটার অবস্থান পরখ করে নিলেন। শক্ত হাতে ধরলেন হাতের বল্লম। অতঃপর সে আওয়াজ বরাবর ছুটে গেলেন।

খোলা জায়গায় উপচে পড়ছে মুক্ত আকাশের জোৎস্নালোক। প্রাঙ্গণটা দিন বরাবর স্বচ্ছ। ছুটে এসে বখতিয়ার খলজী দেখলেন একটা কচি বাচ্চাকে পিঠের উপর তুলে নিয়ে একটা নেকড়ে দ্রুত বেগে ময়দান পেরিয়ে ওপার থেকে এপারের দিকে আসছে।

বল্লমটা তাক করে নিয়ে বখতিয়ার খলজী ওঁৎ পেতে রইলেন। নেকড়েটা কিঞ্চিৎ নিকটবর্তী হতেই তার উদর বরাবর বখতিয়ার তাঁর বল্লম ছুড়ে মারলেন। অব্যর্থ নিশানা। বল্লমটা নেকড়েটার উদর ভেদ করে একদম অপরদিকে ঠেকে গেল।

সগর্জনে লাফিয়ে উঠে উল্টে পড়লো নেকড়েটা। মাটিতে পড়ে দাফাদাফি করতে লাগলো। বাচ্চাটা তার পিঠ থেকে এক পাশে ছিটকে পড়লো।

সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেলেন বখতিয়ার। তলোয়ারের আঘাতে নেকড়েটাকে আরো খানিক কাবু করে বাচ্চাকে তিনি কোলের উপর তুলে নিলেন। বাচ্চাটার আঘাত খুব কঠিন নয়। এক হাতে কামড়ে ধরে বাচ্চাটাকে নেকড়েটা তার পিঠের উপর ফেলেছিল। ফলে, হাতটারই কিয়দংশ ক্ষত বিক্ষত হয়েছিল। বখতিয়ার তার পরিধেয়ের এক অংশ ছিঁড়ে বাচ্চাটার ক্ষত-স্থান বাঁধতে লাগলেন।

ইতি মধ্যেই পড়িমরি বল্লম হাতে ছুটে এলো আংলু মেচ। সঙ্গে এলো তার স্ত্রী জুমদি মেচ। আরো এলো কয়েকজন সশস্ত্র সেপাই।

ঘটনাঃ এ বাচ্চা আংলু মেচের। সুরক্ষিত ও নিরাপদ আশ্রয় ত্যাগ করে বউ বাচ্চা সহকারে অরণ্যের মাঝে লড়াইয়ের জন্য আখড়া পেতেছে আংলু মেচ। ফাঁক পেয়ে তার বাচ্চাকেই তুলে নিয়েছে নেকড়েটা।

পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। বাচ্চাকে ফিরে পেয়ে আংলু মেচ বখতিয়ারের পায়ের উপর পড়ে গেল। তীর ধনুক ঢাল বল্লম বখতিয়ারের পায়ের উপর রেখে সে সদলবলে বখতিয়ারের বশ্যতা স্বীকার করলো। শুধু তাই-ই নয়, কৃতজ্ঞতার আধিক্যে আংলু মেচ সপরিবারে ইসলাম কবুল করলো। বখতিয়ার তার কৃতজ্ঞতাবোধ দেখে তাজ্জব বনে গেলেন। তিনিও তাকে দোস্ত হিসাবে নিজের বুকে টেনে নিলেন। অতঃপর আংলু মেচের নাম হলো আলী মেচ আর জুমদি মেচের নাম হলো জোবেদা বিবি।

বখতিয়ারকে কয়েকদিন আলী মেচের মেহমানদারী কবুল করতেই হলো। মেহমানদারী অন্তে বখতিয়ার ফের রওয়ানা হলেন আরো উত্তরে। এবার তার সঙ্গে রইলো আলী মেচ ও আলী মেচের অনুচরগণ। আলী মেচ ও তার দলবলের মদদে বখতিয়ার খলজী অনায়াসেই থারু এলাকা জয় করলেন। এরপর আরো উত্তরে এগিয়ে বখতিয়ার একদম হিমালয়ের তলদেশে পৌছে গেলেন।

এখানে এসে হিমালয়ের ওপারে কোন দেশ তা জানতে চাইলে আলী মেচ তাঁকে জানালো যে, সে তথ্য সঠিক তার জানা নেই। তবে সেটা তুর্কীস্তান হওয়াই সম্ভব।

এ খবরে বখতিয়ার খলজী চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। যদি তুর্কীস্তান হয় তো কোন কথাই নেই, না হলেও কোন কথা নেই। তুর্কীস্তান এখান থেকে উত্তর পশ্চিমেই হবে। তিনি জিদ ধরলেন। বাঙ্গালাদেশ থেকে তুর্কীস্তানের সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের পথ একটা চাই-ই তাঁর। সে পথে যত বাধাই থাকুক, তা পরাভূত করে তুর্কীস্তানের সাথে তিনি বাঙ্গালা মুলুকের সংযোগ স্থাপন করবেনই।

আলী মেচ তাকে জানালো—এদিকটা দুর্ভেদ্য। হিমালয় পর্বত মালার মূল অংশটাই ঘিরে আছে এ অঞ্চল। তুর্কীস্তানে যেতে হলে একমাত্র তিব্বত জয় করার পরই সে চিন্তা করা যায়। তিব্বতের দিক দিয়ে তুর্কীস্তানে যাওয়া সম্ভব হলেও হতে পারে। কারণ, তিব্বতের বাজারে লক্ষ লক্ষ টাঙ্গন অর্থাৎ টাট্টুঘোড়া পাওয়া যায় এবং এই ঘোড়াগুলো তামামই তুর্কীস্তানের ঘোড়া। ব্যাপারটা যখন এই, তখন তুর্কীস্তানের সাথে তিব্বতের একটা যোগসূত্র ওদিক দিয়ে আছেও বা হয়তো।

আলী মেচ নিশ্চিত নয়। সবই তার অনুমান। তবু এই অনুমানের পয়গামই বখতিয়ার খলজীর কাছে খুবই বড় হয়ে উঠলো। স্বদেশের সাথে স্বাধীনভাবে এইদিক দিয়ে যোগাযোগের পথ যদি পাওয়া যায় একটা, তাহলে তার বাড়া নেই। পর মুলুকের মধ্যে দিয়ে দিল্লীর তখ্তের মন খুগিয়ে নানা দিক দিয়ে ঘুরে ঘুরে তুর্কীস্তান, গজনী, গরমশির, সিস্তান-ইত্যাদির সাথে যোগাযোগ তার পক্ষে অত্যন্ত তকলিফের ব্যাপার।

অতএব এই দিক দিয়ে একটা সিধাপথ তাঁর চাই-ই। আর সেজন্য তিব্বত জয় করতেই হবে তাঁকে। পথটা যদি না-ই মিলে নসীবগুণে, টাঙ্গন ঘোড়ার ঐ মূল্যবান বাজার টাতো কব্জা তাঁর হবেই।

বখতিয়ার খলজীর আগ্রহ দেখে আলী মেচ আরো-জানালো যে, তিব্বত যাওয়ার অনেকটা পথ চেনা তার। পথগুলো খুব দুর্গম ও খতরনাক। তবু যদি বখতিয়ার খলজী একান্তই বেরুতে চান তিব্বত জয়ে, তাহলে সে বখতিয়ারের পথ প্রদর্শক হতে কোন গাফিলতি করবেনা।

বখতিয়ার খলজী মতলব তার স্থির করে ফেললেন। আলী মেচকে তিনি জানালেন- লাখনৌতি ফিরে গিয়ে আরো অধিক সেনা-সৈন্য নিয়ে তৈরী হয়ে আসবেনই তিনি তিব্বত জয়ে এবং তখন আলী মেচের মদদ টুকু প্রয়োজন তাঁর হবেই।

লাখনৌতে ফিরে এসেই বখতিয়ার ফের যুদ্ধের আনযাম করতে লাগলেন। তাঁর তামাম মুলুক তিনি ছোট বড় কয়েকটি 'ইক্তায়' ভাগ করে তাঁর ঐ তিন চার জন বিশ্বস্ত ইয়ার বন্ধুদের এক একজনকে এক এক ভাগের দায়িত্ব দিয়ে তাদের পদবী দিলেন "মুক্তা"। এরপর এদের উপর তামাম মুলুকের দায়-দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে বখতিয়ার তিব্বত জয়ের আনযাম করতে লাগলেন।

লাখনৌতির শাহী মাকানের মধ্যেও চার চারটি ছোটবড় মহল পয়দা হলো। ইওজ খলজী, শিরান খলজী, আলী মর্দান খলজী ও আহম্মদ খলজী নিজ নিজ স্ত্রী পুত্র নিয়ে পৃথক পৃথক ভাবে এই চার মহলে ঘর সংসার খুলে বসলো। অন্দরের মূল অংশ খাস মহল রূপে বখতিয়ার খলজীর রইলো। এর চার পাশে চার জন চার মহলে স্থানান্তরিত হলো।

ইওজ খলজীর মহলটা খাশ মহলের পাশেই। সেদিন ইওজ খলজীর মকানে দাওয়াত ছিল বখতিয়ারের। খানাপিনা অন্তে দুই দোস্ত্ গল্পগুজবে রত হলো। দু'চার কথার পরই তারা যুদ্ধের কথায় চলে এলো। বখতিয়ার খলজীর নয়া লড়াইয়ের আনযামের প্রেক্ষিতে ইওজ খলজী বললো-এর অর্থ কি দোস্ত্? লড়াই থেকে ওয়াপস্ এসেই ফের এই লড়াইয়ের প্রস্তুতি?

বখতিয়ার খলজী হেসে বললেন- লড়াইয়ের প্রস্তুতির অর্থ তো আর সাদীর প্রস্তুতি নয় দোস্ত, লড়াইয়ের প্রস্তুতি মানে লড়াইয়ের আনযাম। এটা না বোঝার তো কারণ কিছু দেখিনা!

ঃ সেটা তো বুঝলাম। কিন্তু লড়াই থেকে ওয়াপস্ আসার পরতো খুব বেশী দিন গত হয়ে যায়নি?

ঃ বেশী দিন গত হলে যে তলোয়ারে আমার জং ধরবে। ওটা আমার তো হবার নয়?

ঃ তা যদি নয়, তাহলে এই লাখনৌতির পূর্ব দক্ষিণে বিরাট মুলুক পড়ে আছে। বাঙ্গালা দেশের এক অংশই জয় করেছি আমরা। এখনো ব্যাপক অংশ পড়ে আছে। এসব অঞ্চল ফেলে রেখে দূরান্তের ঐ দুর্গম অঞ্চল-

ইওজ খলজীকে থামিয়ে দিয়ে বখতিয়ার খলজী বললেন- বখতিয়ারতো পয়দাই হয়েছে দুর্গমকে সুগম করার জন্যে দোস্ত্! দুরূহের সাথে পাঞ্জা লড়ার জন্যে। সহজ এলাকা জয় করা সহজ কাজ। এই সহজ কাজটাই আমি যদি করে যাই, তোমরা করবে কি? এদিক গুলো তোমাদের জন্যেই থাকবে। যে কয়দিন বাঁচি, কঠিন কাজ যা কিছু আছে, সাধ্যমত সেগুলোর আমি ফয়সালা করে যেতে চাই।

কোন এক কাজে দরজার কাছে এসে দুই দোস্তের আলাপ শুনে হুসনে আরা বেগম দরজার আড়ালে দাঁড়ালো এবং সেখান থেকে বললো- ছোটমিয়া ফের কিসের ফয়সালা করছেন?

হুসনে আরাকে শ্রোতা পেয়ে ইওজ খলজীর জোরটা আরো বেড়ে গেল। বললো- দেখো, দেখো, তোমার ছোট মিয়ার কাণ্ডটা ফের দেখো। বাহাদুর বলে তোমরা তার দিমাগটা এমনই বিগড়ে দিয়েছো যে, সেই বাহাদুরীর ঠেলায় এখন সেরেফ দুষমনেরাই নয়, দোস্তেরাও রীতিমতো ঘায়েল হয়ে যাচ্ছে। হুসনে আরা বিস্মিত কণ্ঠে বললো- মানে!

ইওজ খলজী এ কথার ধারে কাছেও গেল না। সে আপন খেয়ালে বলেই চললো- আরে বাহাদুর শব্দের অর্থ কি? বাহাদুর যে বলো তোমরা, এর আসলে যুক্তিটা কি? সেরেফ কয়েকটা রাজ্য জয় করার নামই বাহাদুরী? আজ পর্যন্ত একটা আউরাতের দীল জয় করার হিম্মত যার হলোনা সে আবার বাহাদুর হলো কি করে? একটা বুঝদীল না-লায়েকেরও দুই তিনটি বিবি থাকে। ঘুরতে ফিরতে মওকা পেলে আরো আউরাতের দীল তারা বেকারার করে দিয়ে আসে। আর একটা মুলুকের সুলতান হয়ে একটা আউরাতের দীলেও জাররা পরিমাণ তুফান তুলতে যে পারেনা, সে আবার

হুসনে আরা অধীর হয়ে বললো- আহ্হা! আপনি থামবেন?

ইওজ খলজী না-খোশ কণ্ঠে বললো- আমি থামছি। তুমি এবার তোমার ছোটমিয়াকে থামাও।

ঃ ছোট মিয়াকে থাবাবো মানে? কি করেছেন তিনি?

ঃ কিছু করেননি। উনি চলেছেন।

ঃ কোথায়?

ঃ লড়াইয়ে।

ঃ মানে?

ঃ লড়াই শব্দের মানে জানোনা?

ঃ তাতো জানিই। লড়াই থেকে তো এলেন উনি।

ঃ ফের ঐ লড়াই লড়তেই চলেছেন।

ঃ কার সাথে?

ঃ আজরাইলের সাথে!

ঃ মানে! কোথায় উনি লড়াই লড়তে যাচ্ছেন?

ঃ জাহান্নামে।

ঃ মরণ!

ঃ হ্যাঁ, ঐ মরণটাই এখন বাকী। আর ঐটার জন্যেই দোস্ত আমার দীওয়ানা হয়ে উঠেছেন।

একেবারেই পেরেশান হয়ে হুস্‌নে আরা বললো-উঃ। আর পারলাম না! ছোটমিয়া কিছু বলবেন?

বখতিয়ার খলজী হাসতে লাগলেন। হাসতে হাসতে বললেন– সবাই বললে শুনবে কে ভাবী? শুনার লোক চাইতো। বরং আপনাদের, বিশেষ করে দোস্তের মুখে বাহাদুরীর এই ব্যাখ্যাটা শুনতে আমার ভালই লাগছে।

হুস্‌নে আরা ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বললো-আপনিও হেঁয়ালী শুরু করলেন?

ঃ হেঁয়ালী!

ঃ হেঁয়ালীইতো। ঐ পাগলের পাঁচালীর জবাবতো কিছু দিলেনই না, বরং আপনিও হেঁয়ালী শুরু করলেন। তলোয়ারে আপনার জং ধরা চলবেনা, ফের আপনি লড়াই করতে বেরুচ্ছেন,-কি, ব্যাপার কি?

বখতিয়ার খলজী ফাঁপড়ে পড়ে গেলেন। তাকে কিছুটা শাসন করার–এই একটা লোকই আছে এই দুনিয়ায়। কৈশোর কাল থেকেই বখতিয়ার খলজী আপছে আপ সে অধিকার এই মহিলার হাতে ন্যস্ত করে দিয়েছেন। এতদিনে সে অধিকার পোক্ত হয়ে গেছে। বখতিয়ার খলজী ইতস্ততঃ করে নতশিরে বললেন–না–মানে, কিছুটা আলতু ফালতু বললেও, সে কথাতো দোস্ত আমার বলেই ফেলেছে।

ঃ তার মানে লড়াই করতে যাচ্ছেন আবার?

ঃ জি।

ঃ কোথায়?

ঃ তিব্বতে।

ঃ তিব্বতে! সেটা কোথায়?

ঃ অনেক দূরে ভাবী, আমারও সঠিক জানা নেই।

ঃ তবু সেখানেই আপনাকে যেতে হবে লড়াই করতে?

ঃ তিব্বত দিয়ে সরাসরি তুর্কীস্তানে যাওয়ার একটা পথ বের করতে পারলে এই বাঙ্গলা মুলুকে আমাদের কওমের আখের বড় উজালা হবে ভাবী, আমাদের এই আজাদী বড় মজবুত হবে। তাই তিব্বত জয় করতে পারলে আমার এই জিন্দেগীর শেষ উম্মিদটুকুও পূরণ হয়।

হুসনে আরার দীলে গিয়ে কথাটা বড় বাজলো। স্থির নয়নে কিছুক্ষণ বখতিয়ার খলজীর মুখের দিকে চেয়ে থেকে হুসনে আরা ক্ষীণ একটা খেদোক্তি করলো– জিন্দেগীর শেষ উম্মিদ ঐ তিব্বত জয়ই হলো আপনার? এর বাইরে আর কোন কিছুই নেই?

হুসনে আরার ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে বখতিয়ার খলজী উদাস কণ্ঠে বললো– ভাবী!

ঃ ওদিকের আর কোন খোঁজ খবরই নিলেন না? অন্ততঃ বেচারীটা এখন কি হালে আছে–

ঃ যা চুকে বুকে খতম হয়ে গেছে, সে প্রসঙ্গ আবার টেনে ফায়দা কি ভাবী? বরং এসব কথা এখন আমার না পছন্দ। এতে আমি অস্বস্তি বোধ করি।

আর কথা চলে না। দীলকে যে বাজারের পণ্য করতে চায়না, এ কথার পর তার সাথে এ প্রসঙ্গে কিইবা আর বলার থাকে? হুস্‌নে আরা খামোশ হয়ে গেল।

হিমালয়ের পাদদেশ তক উত্তরাঞ্চল জয় করে ওয়াপস্ এসেই বখতিয়ার খলজী কুতুব উদ্দীন আইবকের সাথে সৌহার্দ্য বজায় রাখার নিয়্যতে দূত মারফত এক প্রতীক উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন। এর অর্থ, সময় করে অল্পদিনের মধ্যেই আরো কিছু সম্মানী নিয়ে বাঙ্গালা মুলুকের সুলতান বখতিয়ার খলজী নিজে আসছেন দিল্লীর মালীক কুতুব উদ্দীন আইবকের দীদারে।

কুতুব উদ্দিন আইবক আগে থেকেই বখতিয়ারের উপর প্রীত ছিলেন। এই প্রতীক উপঢৌকন লাভ করে তিনি আরো খুশী হলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছু খেলাতসহ তিনি দূত পাঠালেন বখতিয়ারের দরবারে।

বখতিয়ার খলজী সেদিন দরবারের কাজ সকাল সকাল শেষ করলেন। দরবারীরা একে একে সকলেই বিদেয় হলো। কিন্তু বখতিয়ার খলজী তখনও দরবারেই রয়ে গেলেন। ইওজ খলজীকে সঙ্গে নিয়ে প্রশাসনিক এক বিষয়ে আলাপে রত হলেন। কিছু কাল অতিবাহিত হতেই দিল্লীর দূত খিলাত সহ এসে বখতিয়ার খলজীর দরবারে

প্রবেশ করলো এবং কুর্নিশ করে দিল্লীর মালীক প্রদত্ত খিলাত বখতিয়ারের দিকে বাড়িয়ে ধরলো।

বখতিয়ার খলজী খুশী হয়ে খিলাত গ্রহণ করলেন ও দিল্লীর দূতকে সসম্মানে আসন প্রদান করে দিল্লীর হাল হকিকত সম্বন্ধে দূতের সাথে বাৎচিৎ শুরু করলেন। দিল্লীর দূত এক পর্যায়ে বললো– জনাব, আমাদের জনাবে আলা কুতুব উদ্দীন আইবক আপনার খুব তারিফ করেন। বলেন, এমন বাহাদুর কমই তিনি এ জিন্দেগীতে দেখেছেন।

জবাবে বখতিয়ার খলজী হেসে বললেন– দিল্লীর মালীক দরাজদীল লোক। তার মহানুভবতার পরিচয় আমি পেয়েছি।

ঃ সেদিন তিনি এক ব্যাপারে বড়ই আফসোস্ করছিলেন।

ঃ আফসোস্

ঃ জি। আপনার এক ব্যাপার নিয়েই আফসোস্ করছিলেন আমাদের হুজুর।

ঃ এঁ্যা! কোন ব্যাপার– একটু খোলাসা করে বলুন–

বখতিয়ার খলজী কিছুটা শংকিত হয়ে উঠলেন। হয়তো তাঁর কোন আচরণ বা কার্যকলাপ না–পছন্দ হয়েছে তাঁর। জবাবে দিল্লীর দূত একটু হেসে কুণ্ঠার সাথে বললো– জনাবের ঐ হাতী–মানুষের লড়াইয়ের ব্যাপার নিয়ে।

বখতিয়ার খলজীর আশংকা কেটে গেল। তিনি খোশ দীলে বললেন– আচ্ছা! তা আফসোস কেন করছিলেন।

ঃ বলছিলেন, বদলোকের নসিহত শুনেই ঐ আহম্মকীটা তিনি করেছিলেন। আল্লাহ তায়ালার রহমে আপনি কামিয়াব হতে পেরেছিলেন বলেই দীলে তিনি স্বস্তি পেয়েছেন। যদি খারাবী কিছু হতো– মানে আপনার জানটাই যদি ঐ মুসিবতে খতম হয়ে যেতো, তাহলে তিনি মস্তবড় গুনাহগার হয়ে যেতেন।

ঃ তাই?

ঃ জি হুজুর। আমাদের হুজুর বলছিলেন, এতবড় একজন বাহাদুর এভাবে নষ্ট হয়ে গেলে, দীলে তিনি বড়ই চোট্ পেতেন!

ঃ তা বদলোকের নসিহত মানে?

ঃ হ্যাঁ হুজুর, বদলোকেরাইতো এই যুক্তি আমাদের হুজুরকে দিয়েছিল।

ঃ কারা সেই বদলোক?

ঃ সংখ্যা তো তাদের অনেক হুজুর। তবে দিল্লীর আরিজ আর বিশেষ করে রাজস্ব বিভাগের উজিরই এদের মধ্যে প্রধান।

রাজস্ব বিভাগের উজিরের কথা উঠতেই বখতিয়ার খলজী উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন। বললেন– রাজস্ব বিভাগের উজির?

দিল্লীর দূত উৎসাহ ভরে বললো– জি হুজুর। ব্যাপারটা যে কিছু দিন পরই ফাঁস হয়ে গেছে। রাজস্ব বিভাগের উজিরই ঐ বদমতলবের কর্ণধার। তিনি যদি আমাদের হুজুরকে এত বেশী চাপ না দিতেন, তাহলে ঐ অমানুষিক কাজ দিল্লীর মালীক কখনও মঞ্জুর করতেন না।

ঃবটে।

ঃ ঐ উজিরকে তো আমাদের হুজুর কঠোর শাস্তি দিতেন। শুধু একটা দুর্ঘটনার জন্যই তিনি বেঁচে গেছেন।

ঃ দুর্ঘটনা!

ঃ জি। ঐ সময়ই উনার আওলাদটা ইন্তেকাল করেন কিনা।

চমকে উঠলেন বখতিয়ার। বললেন– ইন্তেকাল করেন। কার আওলাদ ইন্তেকাল করেন?

ঃ ঐ উজিরের আওলাদ।

ঃ রাজস্ব উজিরের?

ঃজি।

ঃ কোন আওলাদ?

ঃ আওলাদ তো উনার একটাই।

ঃ আরমান খান সাহেব।

ঃ জি– জি!

ঃ সে কি!

ঃ হুজুর দেখছি উনাদের সবাইকে চেনেন।

বখতিয়ারের নিঃশ্বাস তখন রুদ্ধ হয়ে আসছে। তিনি একটু দম নিয়ে বললেন– না, সবাইকে চিনিনা, তবে উনাকে একটু চিনতাম। তা কবে ইন্তেকাল করলেন উনি?

ঃ তখনই হুজুর। আপনি দিল্লী থেকে ওয়াপস্ আসার কিছুদিন পরেই।

ঃ তাজ্জব। কি, বীমারটা কি?

ঃ কোন বীমার–টিমার নয়! হাতীর পায়ের চাপা খেয়ে পাঁজরটা তাঁর ভেঙ্গে যায়। বেশ কিছুদিন ভুগে ভুগে শেষ অবধি মারাই গেলেন।

বখতিয়ার খলজী এবার একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর তিনি ইতস্ততঃ করে দিল্লীর দূতকে বললেন– আচ্ছা, আপনি তো দেখছি অনেক খবরই জানেন ওদের। আর একটা খবর দিতে পারেন? মানে আরমান খাঁ সাহেবের বিবিটা এখন কোথায় আছেন?

ঃ জি?

ঃ অবশ্য এটা একজনের অন্দরের ব্যাপার, তবে আমি আরমান খাঁ সাহেবের শ্বশুরদের সবাইকে জানি কিনা, অনেক দিন ওদের নিমক খেয়েছি আমি। আর তাই এসব জিজ্ঞাসা করা।

তাজ্জব হয়ে দিল্লীর দূত ফ্যাল ফ্যাল করে বখতিয়ারের মুখের দিকে চেয়ে রইলো। একটু পর সে বিস্মিত কণ্ঠে বললো– হুজুর তাঁদের নিমক খেয়েছেন–কিন্তু কোন খবরই রাখেন না দেখছি।

ঃ মানে!

ঃ আরমান খাঁ সাহেবের বিবি এলো কোত্থেকে আর শাদীটাই বা– হলো কবে?

বখতিয়ার খলজী আর একদফা চমকে উঠলেন। বললেন, শাদী হয়নি?

ঃ না! শুনেছি শাদীর আনযাম চলা কালে পাত্রী বেজায় অসুস্থ হয়ে পড়েন, আর তার পরেই তো দুর্ঘটনা।

আনন্দে, উল্লাসে আর নিদারুণ উত্তেজনায় বখতিয়ারের দশ দিক তখন বন বন করে সমানে ঘোরপাক খাচ্ছে। নিজেকে সংযত রাখা তখন তাঁর পক্ষে দুরূহ হয়ে পড়েছে। আর মাত্র দুই এক কথার পরই তিনি দূতকে মেহমান খানায় পাঠিয়ে দিয়ে ইওজ খলজী বাদে দরবার থেকে দ্বারী প্রহরী সবাইকে বাইরে পাঠিয়ে দিলেন। সকলে বিদায় হতেই বখতিয়ার খলজী মসনদ থেকে লাফিয়ে উঠে ইওজ খলজীকে একদম বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে বিপুল উচ্ছ্বাস ভরে চীৎকার করে আওয়াজ দিলেন–দোস্ত–!

ইওজ খলজীর নিঃশ্বাসও রুদ্ধ হয়ে এসেছিল। এবার সেও বুক ভরে দম নিয়ে চীৎকার করে বললো– মিষ্টি– মিষ্টি। দোস্ত, মিষ্টির তুফান ছোটানো ছাড়া এ আনন্দ সামাল দেয়া যাবে না।

দরবার থেকে বেরিয়ে ইওজ খলজী এক রকম দৌড়ের উপর অন্দর মহলে পৌঁছলো এবং ছুটে এসে এই খোশ পয়গাম হুসনে আরা বেগমের কাছে পেশ করলো। সঙ্গে সঙ্গে অন্দর মহলে তুফান উঠলো খুশীর। হুসনে আরা বেগমকে ধরে রাখাই এক রকম দায় হয়ে উঠলো। দিলারা বানুর বিয়ে হয়নি। এখনও তিনি অমনই আছেন! উঃ! কি আনন্দ! ছোট মিয়ার তামাম দুঃখের অবসান এবার নযদীক্। তার দীলের জং সাফা হওয়ার রাহা এবার উন্মুক্ত!

বাইরে ছুটলো মিষ্টির তুফান। সেপাই–সেনা, দ্বারী– প্রহরী, আমলা– নফর এবং অন্দর মহলের অন্যান্য সবাই সহ বাইরের লোকেরা জানলো– দিল্লীর মালীকের পক্ষ থেকে খিলাত পেয়েছেন বাঙ্গালার সুলতান ইখতিয়ার উদ্দীন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী। এই আনন্দ সেই কারণেই।

পরের দিনই বখতিয়ার খলজী কুতুবউদ্দিন আইবককে উপঢৌকন দেয়ার অছিলায় বাঙ্গালা মুলুক ত্যাগ করে দিল্লীর পথে ছুটলেন। অনর্থক কোথাও কালক্ষয় না করে বনজঙ্গল পাহাড় প্রান্তর পেরিয়ে অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে তিনি দিল্লীতে এসে পৌঁছলেন। প্রথমে তিনি হাজির হলেন দিল্লীর মালীকের দরবারে। উপঢৌকনাদি প্রদানে তিনি কুতুবউদ্দীন আইবকের তুষ্টি ও প্রীতি হাসিল করলেন। এরপরই তিনি তালাশ করে ফরমান আলী সাহেবের দিল্লীস্থ মকানে এসে হাজির হলেন।

তামাম পথ বখতিয়ার খলজী দ্রুতপদে পেরিয়ে এলেন। কিন্তু ফরমান সাহেবের ফটকে এসেই পা তাঁর অত্যন্ত ভারী হয়ে গেল। পা আর উঠেনা। বুকে তখন ঝড় তাঁর। দীলে তাঁর তুফান। চরণযুগল অবশ। দ্বিধাদ্বন্দ্বে এন্তার দোল খাচ্ছে হৃদয়। কে জানে কি অবস্থায় আছে এখন দিলারা। আছে কিনা আদৌ সে ফরমান সাহেবের মকানে! ফরমান আলী সাহেবই বা কোন নজরে দেখবেন তাকে। তিনিও বা মকানে এখন হাজির কিনা, কেজানে।

ফটকটা পেরিয়ে দ্বিধা জড়িত চরণে কয়েক কদম এগুতেই ছুটে এলো পাহারাদার। সেলাম দিয়ে প্রশ্ন করলো––জনাব কোথা থেকে তসরীফ আনছেন?

জবাবে বখতিয়ার খলজী বললো– বাঙ্গালা মুলুক থেকে।

ঃ জনাবের নাম?

ঃ ইখতিয়ার উদ্দীন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী।

ঃ তসরীফ আনার হেতু?

ঃ জনাব ফরমান আলী সাহেবের সাথে মোলাকাত করতে চাই।

ঃ আসুন–

এবার বখতিয়ার খলজীর সওয়াল করার পালা। তিনি বললেন–ফরমান আলী সাহেব কি মকানে আছেন এখন?

পাহারাদার জবাব দিলো–জি আছেন?

ঃ কোথায় আছেন?

ঃ দহলীজে।

ঃ আর কেউ কি আছেন সেখানে?

ঃ জি– না। উনি একাই বসে কাগজ পত্রের কাজ করছেন।

বখতিয়ার খানিক চিন্তা করলেন। তারপর ফের প্রশ্ন করলেন–আচ্ছা, এই এতবড় মকানে কি একাই থাকেন ফরমান আলী সাহেব?

ঃ না। হুজুরের বিবি আর বহিন তাঁর সাথে থাকেন।

ঃ সবাই তাঁরা সহি সালামতে আছেন?

ঃ জি। কিন্তু আপনি এত জানতে চাইছেন– আপনি কি হুজুরের কোন রিস্তেদার?

ঃ এ্যাঁ- হ্যাঁ মানে রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও-

ঃ আসুন জনাব, আসুন-

পাহারদার বখতিয়ারকে দহলীজের দুয়ারে এনে পৌছে দিলো। দহলীজের দুয়ার খোলাই ছিল। ঘরে ফরমান আলীকে একা দেখে বখতিয়ার খলজী সোল্লাসে আসসালামু আলাইকুম ভাই সাহেব- বলে দহলীজে প্রবেশ করলেন। ওয়ালাইকুমস্ সালাম- বলে ফরমান আলী মুখ তুলে চেয়ে বখতিয়ারকে দেখেই সঙ্গে সঙ্গে নীরব হয়ে গেলেন। তার চোখে মুখে নিদারুণ ঘৃণার অভিব্যক্তি স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

বখতিয়ার খলজী অতঃপর মোসাফেহা করার জন্যে হাত বের করে অগ্রসর হলেন। কিন্তু ফরমান আলী সাহেব উঠেও এলেন না, বা মোসাফেহা করার জন্য হাতও বের করলেন না।

বখতিয়ারের ধারণা ছিল, তাঁকে দেখে ফরমান আলী সাহেব খুশিতে লাফিয়ে উঠবেন। কিন্তু একেবারেই এই বিপরীত আচরণ দেখে বখতিয়ার খলজী যারপরনেই তাজ্জব বনে গেলেন। তিনি আরো তাজ্জব হলেন এই ব্যাপারে যে, কক্ষের মধ্যে তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেও ফরমান আলী তাঁকে বসার কথাও বললেন না। কিছুক্ষণ একেবারেই মৌন অবস্থায় কেটে গেল। বখতিয়ার এখন কি করবেন তা ভাবতেই ফরমান আলী সাহেব একটা কুরশী দেখিয়ে দিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন- বসুন। হতবুদ্ধি বখতিয়ার বুঝতে না পেরে বললো- জি?

ঃ এখানে আপনি কোথায় উঠেছেন?

ঃ না, কোথাও এখনও উঠিনি। দিল্লীর দরবারে কিছু কাজ ছিল-

ঃ ও, আপনিতো আবার সুলতান এখন। একটা মুলুকের মালীক।

ঃ জি?

ঃ ইনসানের উন্নতির সাথে তার আদব আখলাখেরও উন্নতি হয়, এইটেই বরাবর জেনে এসেছি। কিন্তু তার যে চরম অধঃপতনও হয়-এটা জানা ছিল না।

বখতিয়ার খলজী একেবারেই অসহায় কণ্ঠে বললেন- আমি বুঝতে পারছিনে, কি হয়েছে আপনার, আর আপনি এসব কথা বলছেন কেন?

ঃ যখন আর যাকে যে কথা বলা প্রয়োজন, আমি তাই বলছি। মোটেই আচানক কিছু বলিনি।

ঃ মানে!

ঃ আপনি ফের এখানে এসেছেন কেন? আপনার তো আর কোন কিছুর অভাব নেই?

ঃ অভাব!

ঃ হ্যাঁ, অভাব! আগে আপনি অভাব অনটনের মধ্যে ছিলেন। ফুর্তি ফার্তার মওকা কিছু পাননি। তাই এখানে সেখানে ঘুরে ঘুরে ভাঁওতাবাজীর মাধ্যমে আপনাকে মওকা করে নিতে হয়েছে। এখনতো আর তকলিফ কিছু নেই। এখন আপনি সুলতান! মুখের একটা কথা খসালেই নিত্য নয়া ফুর্তির আনযাম আপনার জন্য তৈয়ার থাকবে।

অপমানে ও বিস্ময়ে বখতিয়ারের চোখ মুখ লাল হয়ে উঠলো। তিনি বললেন- আমি সোচ্ করে হয়রান হচ্ছি, আপনি এমন কসম খেয়ে আমাকে অপমান করতে লেগেছেন কেন?

ঃ অপমান? হ্যাঁ সত্যি ঘটনার উল্লেখ কারো জন্য কখনও অপমানের ব্যাপারই হয়।

ক্রোধে ও ক্ষোভে বখতিয়ার খলজী থর থর করে কাঁপতে লাগলেন। তার মুখ দিয়ে কিছুক্ষণ কোন কথাই বেরুলো না। নিজেকে সামলে নিতে অনেক্ষণ তার সময় লাগলো। এরপর তিনি সংযত কণ্ঠে বললেন- আমার কসুরটা আমি বুঝতে পারছি। সেদিন আচানক ভাবে আপনাদের সামনে থেকে আমি পালিয়ে যাই। আগেও একবার ছোট্ট একটা খত দিলারাকে লিখে যাই। কিন্তু এসবের পেছনে যথেষ্ট কারণ আছে। সে কারণটা না জেনেই আপনি সেই সব কসুরের জন্যে-

ঃ না- না, ওসব কোন কসুর-কসরতের ব্যাপার নয়। আপনাকে আমরা আগে সাঠিক ভাবে চিনতামনা, তাই আমাদের যথেষ্ট বোকা বানিয়েছেন এ যাবত। চেনা এখন খতম। কাজেই সে মওকা আর নেই আপনার।

ঃ তার অর্থ?

ঃ আপনার সাথে আর কোন সম্পর্ক নেই আমাদের। আর তা ছাড়া, এখন কোন কথাও আর নেই আমার। আপনি এখন যেতে পারেন।

ঃ একজনকে নিজ মকানে পেয়ে এভাবে অপমান করার নজীরটা আপনিই স্থাপন করলেন।

ঃ মানে?

ঃ মানে, আপনি না বললেও যে এরপরও আমি এখানে থাকবো, এমন সন্দেহ আপনার পক্ষে মানায় না। তা যাক সে কথা। মেহেরবানী করে একটু উপকার করুন আমার।

ঃ উপকার!

ঃ দিলারাকে দয়া করে একটু ডেকে দিন। তাকে দুটো কথা বলেই আমি চলে যাব।

জ্বলে উঠলেন ফরমান আলী সাহেব। বললেন- দিলারাকে ডেকে দেবো মানে? দিলারা কি বাজারের পণ্য, না আপনার কেনা বাঁদী যে, ডাকলেই সে আপনার খেদমতে

পড়িমরি ছুটে আসবে? ও হুকুম বাঙ্গালা মুলুকে ওয়াপস্ গিয়ে আপনার হেরেমের উপর রাখুন গে, সঙ্গে সঙ্গে উম্মিদ আপনার হাসিল হবে। এখানে সে আশা জাররা মাত্র নেই।

মুখ ঘুরিয়ে নিলেন ফরমান আলী সাহেব। সীমাহীন ধৈর্যের প্রতিভূ হিসাবে তখনও নীরব হয়ে বখতিয়ার খলজী ভাবতে লাগলেন– কি করবেন তিনি এখন!

ঠিক এই সময়ই "ভাইজান–ভাইজান, শুনলাম বখতিয়ার সাহেব এই দিল্লীতেই"–বলতে বলতে খোলা মাথায় এলো চুলে দিলারা বানু ছুটতে ছুটতে এই ঘরে এসে ঢুকলেন। ফরমান সাহেব একাই এই ঘরে আছেন বোধে দিলারাবানু জমিনের দিকে নজর রেখে ছুটে এলেন। চোখ তুলতেই তিনি এক দম বখতিয়ারের মুখোমুখী হয়ে গেলেন। বখতিয়ারকে দেখা মাত্র তিনি বেহুঁশ হয়ে ঐ ভাবে ওখানেই মুহূর্ত খানেক দাঁড়িয়ে রইলেন।

হুঁশ ফিরে আসতেই তিনি কাঁধের ওড়না মাথায় তুলে পিছু হটতে চেষ্টা করলেন। বখতিয়ার খলজী মরিয়া হয়ে শক্ত কণ্ঠে বললেন– দাঁড়ান, আপনার সাথে কথা আছে।

ক্ষিপ্ত ভাবে ঘুরে দাঁড়ালেন দিলারা বানু। তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললেন– কথা! আমার সাথে ফের কথা কি আপনার? গোন্ডা গোন্ডা বিবিজান আর দিলরুবা– মেহবুবার সাথে কথা বলেও খাহেশ মেটেনি আপনার? আবার এসেছেন রুচি বদলাতে?

বখতিয়ার খলজী আঁতকে উঠলেন দিলারার এই আচরণে! একি বিস্ময়! বললেন– দিলরুবা–মেহবুবা!

একই রকম ঝাঁঝালো কণ্ঠে দিলারা বানু বললেন–হ্যাঁ–হ্যাঁ, সখী–সজনী–সোহেলী! আর কত সোহেলী চাই আপনার?

ঃ দিলারা!

ঃ খবরদার! আমার নাম ধরে ডাকার অধিকার কে দিয়েছে আপনাকে? আপনি–আপনি–

দিলারা তাঁর মুখের কথা শেষ করতে পারলেন না। থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে রুদ্ধ কণ্ঠে তৎক্ষণাৎ মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে উল্টো দিক হয়ে দাঁড়ালেন।

বখতিয়ার খলজী বললেন– তাজ্জব! ব্যাপার কি তা আমাকে বলবেন তো আপনারা খোলাখুলি?

জবাব দিলেন ফরমান আলী। তিক্ত কণ্ঠে বললেন– খোলাখুলি ব্যাপারটা হলো এইযে, কোন চরিত্রহীন লোকের সাথে কোন সম্পর্ক নেই আমাদের। আপনি বেরিয়ে যান–

বখতিয়ার খলজী শেষ বারের মতো দিলারাকে প্রশ্ন করলেন– আপনিও তাহলে আমাকে বেরিয়ে যেতেই বলছেন?

priyoboi.com

মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন দিলারাবানু। তাঁর বুক তখন ভেসে যাচ্ছে দুই নয়নের পানিতে। তিনি এবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বললেন– হ্যাঁ– হ্যাঁ, যান আপনি! চলে যান! আর আমি সহ্য করতে পারছিনে–

আর্তনাদ করে কেঁদে উঠে দিলারা বানু বখতিয়ারের দিকে এক পলক চাইলেন এবং সশব্দে কাঁদতে কাঁদতে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

প্রাণহীন মূর্তির মতো কিছুক্ষণ নীরবে ও স্পন্দনহীন অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইলেন বখতিয়ার খলজী। পরে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ব্যথিত কণ্ঠে বললেন– আমি বুঝতে পারছি, কোথাও একটা গোলমাল আছে মস্তবড়। কিন্তু আমার বদনসীব! সে গোলমালটা খণ্ডন করার মওকা আমাকে দেয়া হলো না!

নত মস্তকে ধীরে ধীরে ফরমান আলীর কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন বখতিয়ার।

ঘোড়া ছুটলো বখতিয়ারের। সেই যে ঘোড়া ছুটতে শুরু করলো–দিল্লী থেকে বাঙ্গালা মুলুকে এসেও সে ঘোড়ার গতি আর থামালো না। তার তিন ইয়ারকে বাঙ্গালা মুলুকের তিন দিকের পাহারায় এবং আহম্মদ খলজীকে শাহী মহলের হেফাজতে থাকার নির্দেশ দিয়ে দশহাজার অশ্বারোহী ফৌজ নিয়ে বখতিয়ার খলজী তিব্বতের পথে রওনা হলেন। হুসনে আরার নিষেধ, ইয়ার বন্ধুদের অনুরোধ– কোন কিছুতেই কান দিলেন না বখতিয়ার। হুসনে আরা আর ইওজ খলজীর বিপুল ঔৎসুক্যের আর অন্যান্য শতজনের শত প্রশ্নের জবাবে তিনি একটা কথাই বললেন– নামটা আমার বখ্ত্–ইয়ার। কিন্তু বখ্ত্ আমার কিছুতেই ইয়ার কোনদিন হলো না। আজন্ম আমি কমবখ্ত্ই রয়ে গেলাম!

দশ

আবার শয্যা নিলেন দিলারা বানু বেগম। আজমীর থেকে বখতিয়ারের ঐ নিরুদ্দেশ হওয়ার পর যে হালত তাঁর হয়েছিল, এবার তাঁর হালতটা তার চেয়েও অনেকগুণে কঠিন আকার ধারণ করলো। সাধ্যি সাধনা করেও তাঁকে কেউ বিছানা থেকে তুলতে বা দানাপানি কোন কিছুই তাঁর মুখে দিতে পারলো না। খবর পেয়ে জান মোহাম্মদ সাহেব হন্তদন্ত ছুটে এলেন দিল্লীতে। কন্যার অবস্থা দেখে ভেঙ্গে পড়লেন তিনি। পানাহারে রাজী করানোর ইরাদায় কন্যাকে অনুনয় বিনয় করতে করতে তিনিও যখন অনাহারে শয্যা গ্রহণ করলেন– একমাত্র তখনই হুঁশ ফিরলো দিলারার। বৃদ্ধ পিতার মুখের দিকে চেয়ে

এবং তার করুণ অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করে দিলারা ফের আহার তুললেন নিজের মুখে এবং পিতার মুখেও তিনি নিজের হাতে আহার্য তুলে দিলেন। অতঃপর পিতাপুত্রী উভয়েই আস্তে আস্তে অনেকখানি সুস্থ হয়ে উঠলেন।

আরো খানিক সুস্থ হওয়ার পর পুত্রকন্যাদের নিয়ে নিরিবিলিতে বসে একদিন দেওয়ান জান মোহাম্মদ সাহেব দিলারা বানুকে বললেন–আচ্ছা মা, একটা কথা তোমাকে বলতে চাই।

জিজ্ঞাসুনেত্রে দিলারাবানু ওয়ালেদের মুখের পানে চাইলেন এবং প্রশ্ন করলেন– কি কথা আব্বাজান?

দেওয়ান সাহেব ইতস্ততঃ করে বললেন– কথাটা মানে–

ঃ জি বলুন–

ঃ মানে বখতিয়ারকে সাদী করতে কি খুবই আপত্তি আছে তোমার?

চমকে উঠলেন দিলারা বানু বেগম। বললেন– আব্বাজান!

ঃ দুই তিনটে সতীনতো অনেক মানুষেরই থাকে! তারাও তো স্বামীর ঘর করে! বিশেষ করে একজন সুলতানেরতো একাধিক বিবি থাকা আদৌ কোন বিস্ময়কর ব্যাপার নয়।

ঃ মানে!

ঃ এমন তো হতে পারতো, তাকে তুমি সাদী করার পর সুলতান হয়ে বখতিয়ার ফের এই সাদীগুলো করলো! তাহলে কি করতে? খসম বলে তাকে তখন অস্বীকার করতে পারতে?

ওয়ালেদের আকঙ্খা অনুধাবন করার পর দিলারা বানু বললেন– শুধু একাধিক বিবিটার কথাই শুনেছেন আব্বাজান, তাঁর হেরেম ভর্তি বেশুমার আউরাতদের কাহিনী কিছুই আপনি শুনেননি। সেরেফ যদি নিকেহ–বিয়ের ব্যাপার হতো, তবু না হয় কিছুটা চিন্তা করার অবকাশ ছিল। কিন্তু অসংখ্য আউরাতের সাথে হরদম যার অবৈধ মেলামেশা, সে চরিত্রহীনের কথা ভাবতেই আমার গায়ের রক্ত মাথায় উঠে।

জান মোহাম্মদ সাহেব আপাততঃ নীরব হয়ে গেলেন। চিন্তার মধ্যে নিমগ্ন হলেন তিনি। অনেকক্ষণ পর চাপা একটা নিঃশ্বাস ফেলে অস্ফুট কণ্ঠে বললেন– তার যা মানসিক অবস্থা এখন, তাতে এর জন্যে তার খুব কসুর ধরা যায় না।

ফরমান আলী সাহেব তাজ্জব হয়ে বললেন– মানে!

জান মোহাম্মদ সাহেব বললেন– সে নিজে যখন স্বেচ্ছায় এখানে এসেছিল, তখন তার সাথে অতটা খারাপ আচরণ করা ঠিক হয়নি তোমাদের।

ফরমান আলী সাহেব তাজ্জব হয়ে বললেন– সেকি আব্বাজান! আপনার দিমাগে কিছু কসুর দেখা দিলো না কি? অনন্ত আউরাত নিয়ে যে দিনরাত ফূর্তি করে কাটায়, সে আবার একটা মানুষ, না তার সাথে সদাচরণ সম্ভব?

সব সময়ই মানুষ আপন ইচ্ছায় খারাপ হয়না ফরমান আলী– এ কথাটা ভুলে গেলে চলবে কেন?

ঃ অর্থাৎ?

ঃ পরিস্থিতিও মানুষকে খারাপ হতে বাধ্য করে। আর সেজন্যে ইনসানের আচরণটা না–পসন্দ হলেও, ইনসানকে হেয় করা অন্যায়।

ফরমান আলী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। বললেন– কি যে বলেন আব্বাজান! ওর মতো ইনসান তো জানোয়ারেরও অধম। শুধুই কি চরিত্রহীন? একজন চরম নেশাখোর। সোরাব–গাঁজা– ভাং–এহেন বস্তু নেই, যাতে সে অনভ্যস্ত!

জান মোহাম্মদ সাহেবও এবার কিছুটা গোস্বা হলেন। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন–ওর অবস্থায় তুমি পড়লে, হয় আত্মহত্যা করতে, নয় সেরেফ নেশাতেই বুঁধ হয়ে পড়ে থাকতে। দুনিয়াটা আছে, না ফানা হয়ে গেছে– চোখ মেলেও দেখতে না!

ফরমান আলী আহত কণ্ঠে বললেন– আব্বাজান!

দেওয়ান সাহেব বললেন– তাকে আমি হাজার বার মোবারকবাদ জানাই যে, এ অবস্থার মধ্যেও দ্বীন–ইসলামের এতবড় খেদমত সে করতে সক্ষম হয়েছে। এত ব্যথা দীলে নিয়েও একদম শূন্য অবস্থা থেকে সে নিজেকে বিশাল এক মুলুকের সুলতান পদে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সত্যিই সে বড় কলেজার মানুষ। একমাত্র বখতিয়ারের মতো চরম মনোবলের মানুষের পক্ষেই এতটা সম্ভব।

দিলারা বানু তাজ্জব হয়ে দেওয়ান সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। তিনি ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন– আব্বাজান! আপনি যেন কিসের একটা–

দেওয়ান সাহেব এবার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন– তোমার এই দুর্ভাগ্যের জন্যে একমাত্র আমিই দায়ী মা, তোমার এই স্বার্থপর আওলাদই দায়ী।

ঃ আব্বাজান!

ঃ আমার নিজের আর এই ফরমান আলীর আখের মজবুত করতে গিয়ে তোমার আখের আমিই মেস্মার করে দিয়েছি। সব কসুর আমার মা!

ঃ তার মানে!

ঃ বখতিয়ারের ঐ অধঃপতন তার নিজের দোষে নয় মা, আমার জন্যে। আমার অনুরোধ ফেলতে না পেরে তোমার জন্য যে ব্যথা সে দীলে নিয়ে গেছে, তা নিজে আমি জানি। তার বেধারাক আঁসু দেখে আমি বিলকুলই বুঝেছি।

উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠে এবার ফরমান আলী প্রশ্ন করলেন কি, ব্যাপারটা কি আব্বাজান?

ঃ ব্যাপার আমাদের স্বার্থবোধ, আর কিছুই নয়। আরমান খাঁর আব্বা যখন আমাদের অস্তিত্ব বিনাশ করতে উদ্যত হলো, তখন আমি বখতিয়ারের কাছে তামাম কথা খুলে বলে, জোড়হাত করে তার সামনে দাঁড়ালাম। ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললাম– "তুমি দিলারার পথ থেকে সরে না দাঁড়ালে আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো বাবা, মেসমার হয়ে যাবো। তুমি আমাকে কথা দাও, দিলারার সামনে থেকে সরে দাঁড়াবে তুমি!"

দিলারার চোখ দুটো ফুটে উঠলো–তিনি অসহায় কণ্ঠে আওয়াজ দিলেন– আব্বাজান–

বলেই চললেন দেওয়ান সাহেব– আমার কথা শুনে তার চোখ মুখ কালো হয়ে গেল। কিন্তু আমার অবস্থা চিন্তা করে, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সে আমাকে ফিরিয়ে দিতে পারলো না। আমাকে সে কথা দিলো। বললো– তাই হবে। এরপর কি বলবো মা, পুরুষ মানুষের চোখে যে এত পানি থাকে তা আমার আগে জানা ছিল না। যে কান্না চাপতে চাপতে সেদিন সে বেরিয়ে গেল আমার ঐ আজমীরের মকান থেকে, যদি কোন পাষণ্ডও তা দেখতো, বোধকরি ঐ মুহূর্তে তার চোখেও ঢল নামতো পানির!

বলতে বলতে হু হু করে কেঁদে ফেললেন দেওয়ান সাহেব। নিজেকে সংযত করতে না পেরে, তিনি ছেলে মেয়েদের সামনে থেকে পালিয়ে গিয়ে নিজেকে আড়াল করতে চাইলেন।

দেওয়ান সাহেব কয়েক কদম এগুতেই আব্বাজান বলে আর্তনাদ করে উঠে আবার মূর্চ্ছা গেলেন দিলারাবানু বেগম।

হৈ চৈ শুনে ছুটে এলেন হাজেরা বিবি। ছুটে এলো আয়া– ঝিয়েরা। সবাই মিলে শুশ্রূষা করে দিলারাকে ফের সুস্থ করে তুললো। সুস্থ হয়ে উঠেই দিলারাবানু পয়লা যে কথা বললো তা হলো– তাইতো তিনি আমাদের কাছে আসতে গিয়েও ফের চমকে উঠে ঘোড়া ছুটিয়ে সরে গেলেন!

ফরমান আলী সাহেব অতঃপর একটানা অনুশোচনায় ভুগতে লাগলেন। আফসোস করে বলতে লাগলেন– বেচারার প্রতি সত্যিই বড় অন্যায় আচরণ করা হয়েছে– নির্দয় আচরণ করা হয়েছে।

দিলারাকে আর ধরে রাখা গেল না। এতটার পরও বার বার বখতিয়ারই এসে শু আঘাত খেয়ে ফিরে ফিরে যাবে আর তিনি নিজে আত্মাভিমানে দিল্লীতেই গাঁট হয়ে বসে থাকবেন– এটা হতে পারে না। বখতিয়ারের কসুর কি? কসুর তো সব তাঁদেরই এরপরও যে বখতিয়ার ফের এসেছে এই তো যথেষ্ট।

দিলারাবানু পিতার কাছে বাঙ্গালা মুলুকে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। বললেন– যে কসুর তাঁরা করে ফেলেছেন, তার একটা সংশোধন দরকার। বখতিয়ারের আর আসার পথ তো খোলা তাঁরা রাখেননি। এবার গেলে যেতে হবে তাঁকেই।

কাজটা কিছু দুরূহ হলেও, দেওয়ান সাহেব তাঁকে নিরুৎসাহ করলেন না। বর এটা তিনি খোশ দীলেই অনুমোদন করলেন। নিজে তিনি বৃদ্ধ বলে দিলারাকে বাঙ্গাল মুলুকে পাঠানোর দায়িত্ব ফরমান আলীর ঘাড়ের উপরই পড়লো।

ফরমান আলীও অল্পতেই এ প্রস্তাব সমর্থন করলেন। বহিন যখন অন্য কাউকেই সাদী করতে রাজী নয়, তখন এ দিকেই এগুনো ছাড়া দুসরা কোন রাহাও আর নেই। বাঙ্গালা মুলুকে যাবার পথ তাঁর অনেক দূর তক চেনা। এছাড়া বখতিয়ারকে অপমান করে ফিরিয়ে দেয়ার কারণে দীলে তাঁর অনেকটা আফসোসও ছিল। তিনি অল্পতেই রাজী হলেন।

বিদায়ের দিন হাজেরা বিবি দিলারাকে নিজের হাতে সাজিয়ে দিলেন। সাজানোর কালে মস্করা করে বললেন– তাহলে সতীনের ঘরই বহিনের আমার পছন্দ হলো শেষ পর্যন্ত?

দিলারাবানু কথাটা সহজভাবে নিয়ে বললেন– কি করবো ভাবী, নসীবে যা আছে আমার, তার বাইরে যাবো কি করে?

ঃ তা অবশ্য ঠিক। তবে দুই ভাইবোন মিলে বেচারাকে যে ঠ্যাঙ্গান ঠেঙ্গিয়েছেন আপনারা, তাতে বহিনকে আমার বড্ড বেশী নেশাখোরটার হাতে পায়ে ধরতে হবে।

এবার দিলারা বানু অল্প একটু হেসে বললেন– ভাবী, ভাইজানকে আপনি যেমন জানেন, তেমনই তাঁকেও আমি কম জানিনে। আসলে তাঁর দীলটা বড় নরম।

কপট রোষে হাজেরা বিবি বললেন– ও–ব্বাবা! তলে তলে এতো?

দিলারা বানু অমনিভাবে জবাব দিলেন– তো কি আর অমনি?

ঃ তার উপর আবার সুলতান!

ঃ সে তো বটেই!

ঃ তা দেখবেন বহিন, সুলতানের বেগম হয়ে আমাদের যেন বিলকুল ভুলে বসে থাকবেন না! খসমকে সঙ্গে নিয়ে জলদি আসবেন কিন্তু বেড়াতে।

কৌতুক করে দিলারা বানু বললেন– না ভাবী, এই যাচ্ছি, আর আমি আসবো না। এ ছাড়া, তাঁকেও আসতে দেবোনা।

ঃ কেন–কেন?

ঃ কেন আবার? উনি এলেই আপনারা সবাই মিলে তাঁর পেছনে লাগেন। হয় আব্বাজান, নয় ভাইজান, একজন না একজন তাঁকে কাঁদিয়ে তবে ছাড়েন। খামাখা তাঁকে কাঁদতে আমি আসতে দেবো কেন?

ঃ ওমা! গাছে না চড়তেই এক ধামা!

দুইজনেই হেসে ফেললেন!

দিলারাকে নিয়ে সুদীর্ঘ পথ পেরিয়ে বাঙ্গালা মুলুকে আসতে ফরমান আলী সাহেবের অনেক সময় লাগলো। লাখনৌতিতে পৌছেই তারা খবর পেলেন– বখতিয়ার খলজী রাজধানীতে নেই। উনি লড়াই লড়তে বেরিয়েছেন। এ খবরে ভাইবোন– দুইজনই অনেকটা দমে গেলেন। কিন্তু এতপথ এসে আর পথ থেকেই ওয়াপস্ যাওয়া কোন যুক্তির কথা নয়। দিলারা বানুও ওয়াপস্ যেতে নারাজ। তাঁরা সামনেই এগিয়ে এলেন। রাজধানীতে পৌছে কোন দপ্তর–দরবারে না গিয়ে তাঁরা সরাসরি শাহীমহলের ফটকে এসে দাঁড়ালেন।

দ্বার প্রান্তে মেহমান দেখে শাহী মহলের নফর–বাঁদী–প্রহরীরা ছুটে এলো। ফটকের প্রহরী এসে ফরমান সাহেবকে সালাম দিয়ে বললো– হুজুরের পরিচয়?

ফরমান আলী বললেন– আমরা দিল্লী থেকে আসছি। আমরা বাঙ্গালার সুলতানের অতি পরিচিত ও আপনজন।

এর পর দিলারার প্রতি ইঙ্গিত করে ফরমান আলী ফের বললেন– ইনি বেগমদের সাথে মোলাকাত করতে চান।

মহলের নফর–বাঁদীরা নযদিকই ছিল। বেগমদের কথা উঠতেই এক নফর এগিয়ে এসে বললো– আসুন হুজুর, ভেতরে আসুন। আমরা বেগম সাহেবাদের খবর দিচ্ছি।

সুলতানের আপনজন বোধে নফরটি ফরমান সাহেবকে নিয়ে এসে সরাসরি খাশ মহলের বালাখানায় বসালো। বাঁদীদের ইঙ্গিত দিতেই বাঁদীরা বেগমদের সংবাদ দিতে ছুটলো।

ফরমান সাহেব বেগম বলতে বখতিয়ার খলজীর স্ত্রীদের কথা বোঝালেন। বাঁদীরা বেগম বলতে বখতিয়ার খলজীর চার ইয়ারের বিবিদের কথা বুঝলো। ফলে, বাঁদীরা জনে জনে মহলে মহলে ছুটলো।

দিল্লী থেকে সুলতানের আত্মীয় আর আত্মীয়া এসেছেন শুনে প্রত্যেক মহল থেকেই বিবি সাহেবাদের সাথে অন্যান্য আরো আউরাত ছুটে এসে বালাখানার পাশের কক্ষে জড়ো হলো।

এ পয়গামে যারপরই তাজ্জব হলেন হুস্নে আরা বেগম। বখতিয়ার খলজীর কোন আত্মীয় দিল্লীতে আছেন–এটা সে বিশ্বাস করতে পারলো না। দ্বিধা দ্বন্দ্বে দুলতে দুলতে সেও এসে হাজির হলো বালাখানার পাশের কক্ষে।

পাশের কক্ষের সাথে সংযোগকারী বালাখানার দুয়ারটা খুলে গেল। দুই কক্ষের মাঝের দুয়ারে একটা পর্দা ঝুলে রইলো। ফরমান আলী সাহেব বালাখানায় বসে রইলেন। দিলারাবানু কম্পিত পদে পাশের কক্ষে প্রবেশ করলেন।

কক্ষে তখন অনেক আউরাত। দিলারা বানু সবাইকে সালাম দিয়ে দাঁড়াতেই সামনে এলো হুস্নে আরা বেগম। দিলারা বানু বললেন–আপনি সুলতান বাহাদুরের বেগম।

হুস্নে আরা হেসে বললো–না বহিন, আমি তাঁর দোস্তের বিবি।

দিলারা এবার শিরান খলজীর স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বললেন–তবে কি ইনি?

হুস্নে আরাই জবাব দিলো–না। ইনিও তাঁর আর এক ইয়ারের বিবি।

তৃতীয়জনকে ইঙ্গিত করলে হুস্নেআরা জানালো যে, তিনিও সুলতানের বেগম নন, অন্যজনের স্ত্রী।

এবার দিলারা বানু বিস্মিত কণ্ঠে বললেন– কসুর নেবেন না বহিন, আমি সুলতানের বেগমদের সাথে মোলাকাত করতে চাই।

হুস্নে আরা আসমান থেকে পড়লো। বললো– সুলতানের বেগম!

দিলারা বানু বললেন––মানে তাঁর তিন তিনটে বেগমের কেউ কি এখানে আসেন নি?

ঃ তিন তিনটে বেগম! কার?

ঃ সুলতান বাহাদুরের। মানে সুলতান ইখতিয়ার উদ্দীন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজীর।

হুসনে আরার কপালে কুঞ্চন দেখা দিলো। সে তাজ্জব হয়ে আগন্তুক আউরাতের মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললো–বহিন, কোথায় যেন আপনারা একটা মস্তবড়

গোলমাল করে ফেলেছেন। তা সে যাক, এবার মেহেরবানী করে বলুন, দিল্লীর কোথা থেকে আপনারা এসেছেন? আপনাদের পরিচয়টা কি?

দিলারা বানুর অনিন্দ সুন্দর মুখের দিকে অন্যান্য মহিলারা এক নজরে, কেউ কেউ বা ঈর্ষান্বিতভাবে চেয়েছিল। হুসনে আরা বেগম প্রথম থেকেই গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে এই তুলনাহীন খুবসুরাত দেখছিলো আর মনে মনে কিসের এক যোগবিয়োগ কষছিলো। দিলারা বানু বললেন–ঐ যে বালাখানায় বসে আছেন উনি আমার ভাই। উনি দিল্লীর দরবারের একজন সদস্য। আমাদের ওয়ালেদ দিল্লীর দেওয়ান। নাম জান মোহাম্মদ সাহেব।

হুসনে আরা বেগম চমকে উঠে বললো–উনি আজমীরে থাকেন? মানে, আজমীরের দেওয়ান সাহেবের কন্যা?

ঃ জি–হাঁ।

ঃ আপনার এই ভাইয়ের নাম কি ফরমান আলী সাহেব?

ঃ জি।

ঃ আপনার নাম কি দিলারা বানু বেগম?

ঃ জি– হাঁ। কিন্তু–

হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো হুসনে আরা বেগম। দিলারাকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে বললো– ওরে বহিনরে! সেই আপনি এলেন, আর কয়েকটা দিন আগে এলেন না কেন?

দিলারা বানু ঘাবড়ে গেলেন। বালাখানায় উপবিষ্ট ফরমান আলী সাহেবেও কি এক অজ্ঞাত আশংকায় ভীত হয়ে উঠলেন।

দিলারা বানু বললেন– তার মানে!

চোখের পানি মুছতে মুছতে হুসনে আরা বললো– বহিন, আপনাকে না পেয়েই তো, আমার ছোট মিয়া, মানে ঐ সুলতান বখতিয়ার খলজী, নিদারুণ মর্মব্যথা সহ্য করতে না পেরে এক আত্মঘাতী লড়াইয়ে চলে গেলেন। এ লড়াই থেকে তাঁর ফিরে আসার সম্ভাবনা খুবই কম।

দিলারা বানু আঁতকে উঠে বললেন– সেকি!

হুসনে আরা প্রশ্ন করলো– কি হয়েছিল আপনাদের বহিন? কি বলেছিলেন আপনারা তাঁকে? নাকি দেখাই হয়নি আপনাদের সাথে? নাকি দেখাই করেননি আপনি?

হুসনে আরা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চললো। দিলারা এর কি জবাব দেবেন, স্থির করতে পারলেন না। পরে থত মত করে বললেন, না সাক্ষাৎ আমাদের হয়েছিল। তবে–

ঃতবে? তবে কি?

সে সব কথা নিশ্চয়ই উনি ওয়াপস্ এসে তাঁর বেগমদের বলেছেন। তাদের কেউ-

ঃ দাঁড়ান– দাঁড়ান!

দিলারাকে থামিয়ে দিয়ে হুসনে আরা বললো– আপনি এসে অবধি বেগম বেগম করছেন। কার বেগম বহিন?

দিলারাও এমন প্রশ্নে তাজ্জব হলেন। বললেন– কেন, বললামই তো সুলতানের বেগম। সুলতান ইখতিয়ার উদ্দীন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজীর?

বিপুল বিস্ময়ে দম বন্ধ করে পুনরায় দিলারার মুখের দিকে চেয়ে রইলো হুসনে আরা। পরে নিঃশ্বাস ছেড়ে বললো–হুঁউ! এবার আমি বুঝতে পারছি গোলমালটা কোন জায়গায় বেধেছে!

ঃ জি?

ঃ সুলতান বখতিয়ার সাদী করলেন কবে আর তাঁর বেগমই বা কোত্থেকে এলো?

বিপুল এক কম্পনে দিলারা বানুর সর্বাঙ্গ শিহরিত হলো।

বললেন– সেকি! সাদী উনি করেননি?

ঃনাঃ।

ঃ উনার নাকি তিন তিনটে বিবি?

ঃ এসব কোথায় পেলেন আপনি?

ঃ এ্যাঁ!

ঃ এই তিন তিনটে বিবিই তাহলে মাথা খেয়েছে আপনার, তাইনা বহিন?

ঃ জি?

ঃ আর এই জন্যে নিজেও আপনি মরলেন, ঐ বেচারাকেও মারলেন?

দিলারা বানু আকুলি বিকুলি করে উঠলেন। বললেন–সেকি! তাহলে–

গলায় কাশির আওয়াজ তুলে পর্দার এপার থেকে এবার ফরমান আলী বললেন– কসুর মাফ করবেন বহিন। আমি এর আগেও আপনাদের কাছে এসেছিলাম– মানে বিহারে। আপনাদের সেখানকার মেহমান খানার এক মালী আমাকে এই খবর দিয়েছিল।

ভেতর থেকে হুসনে আরা বললেন–মেহমান খানার মালী? সে কি বলেছিল আপনাকে?

ফরমান আলী বললেন– সে অনেক কথা বহিন। সব কথা বলাও যাবে না। তবে সে আমাকে নিশ্চিতভাবে বলেছিল যে, সুলতান বখতিয়ার খলজী বিবাহিত, তার তিন তিনটে বেগম আছে এবং তার চূড়ান্ত নেশা করার অভ্যাস আছে।

হুসনে আরা তাজ্জব হয়ে বললো– বলেন কি? মেহমান খানার মালী আপনাকে এই কথা বলেছিল?

ঃ জি বহিন।

ঃ তার নামটা আপনার মনে আছে– মানে–

ঃজি। নাম তার খুব সম্ভব হেকমত খাঁ। মস্ত মস্ত গোঁফ।

ঃ ওহ্‌হো, ঐ হেকমত খাঁ?

ঃ জি।

ঃ উহ্‌। বেয়কুফটার জন্যে তো দেখছি পদে পদে সর্বনাশ হতে লাগলো!

দাঁতের উপর দাঁত পিষে হাতে তিনবার তালী বাজালেন হুসনে আরা। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন শান্ত্রী এসে বালাখানায় দাঁড়ালো। হুসনে আরা তাদের উদ্দেশ্যে বললো– মালী হেকমত খাঁকে চাই। ওকে কয়েদ করে নিয়ে এসো।

শান্ত্রীরা ফের ছুটলো। হুসনে আরা স্বগতোক্তি করলো– ওর ঐ আহম্মকীর জন্যে অন্দর মহল থেকে তাড়িয়েও রেহাই আমরা পেলাম না? চরম সর্বনাশ করেই তবে ছাড়লো আহম্মকটা!

এর পর হুসনে আরা দিলারাকে বোঝালো– তামাম খবর মিথ্যা। সেরেফ একটা ভুল তথ্যের উপর ঘোরপাক খাচ্ছেন দিরারা বানু ও তাঁর বাপ– বেরাদর, আত্মীয়–স্বজন।

খানিক পরেই হেকমত খাঁকে বেঁধে নিয়ে শান্ত্রীরা ফের বালাখানায় হাজির হলো। হুসনে আরা হেকমত খাঁকে উদ্দেশ্য করে বললো– দেখোতো এই সাহেবকে পয়চান করতে পারো কিনা?

আচানক বাঁধা পাড়ায় হেকমত খাঁর হুঁশ বুদ্ধি যাওবা একটু ছিল, তা তামামই লোপ পেয়ে গেলো। সে ফরমান আলীকে না দেখেই বলে উঠলো– না– না, উনাকে আমি চিনি না। বাপজনমেও দেখিনি।

ফরমান আলী সাহেব হেকমত খাঁকে সনাক্ত করে বললো– হ্যাঁ, হ্যাঁ এই সেই মালী।

হুসনে আরা হেকমত খাঁকে ধমক দিয়ে বললো– খামোশ! ভাল করে দেখো আগে।

এবার হেকমত খাঁ ফরমান সাহেবের দিকে নজর তুলে চাইলো। ফরমান আলীকে দেখেই সে আপন খেয়ালে বলে উঠলো– আরে সেই হুজুর না? সালাম হুজুর, সালাম। আবার কবেএলেন? হেকমত খাঁর মগজ কেমন চৌখা, তা বুঝতে পেরেছেন তো? হুঁ– হুঁ বাবা, সব হাঁড়িতে হাত দিলেই পোলাও–কোর্মা মেলেনা।

হুসনে আরা বললো–চিনতে পারছো?

হেকমত খাঁ জোর দিয়ে বললো–চিনতে পারবোনা মানে? জরুর চিনতে পারছি আরে দু তিনটে দিন উনি ঐ বিহার শরীফে এক রকম আমার হাতেই রইলেন, আর আমি চিনতে পারবোনা? আসলে আমার মগজটা যে আর পাঁচজনের চেয়ে বিলকুল আলাদা–এটা–

হুসনে আরা অবার একটা ধমক দিয়ে বললো– থামো! এঁকে ওখানে কি বলেছিলে?

ঃ হুজুরাইন!

ঃ সুলতানের বেগম সম্বন্ধে ওকে তুমি কি বলেছিলে?

হেকমত খাঁ উৎসাহিত হয়ে উঠে বললো– ও এই কথা? এবার আর ভুল করিনি হুজুরাইন। এই হেকমত খাঁর যে মগজ আছে, হেকমতি সেও কিছু জানে, এবার সেটা ঠিক ঠিক প্রমাণ করে ছেড়েছি।

ঃ কি রকম?

ঃ ইনি চালাকী করে আসল খবর জানতে চাইলেন। আরে, আমি কি বুদ্ধিহীন যে অচেনা লোককে আসল খবর বলে দেবো? কায়দা করে তামাম খবরই উল্টা করে দিয়েছি।

ঃ সুলতানের সাদী হয়েছে– একথা বলেছো?

ঃ শুধু সাদী হুজুরাইন! তাঁর তিন তিনটে জরু আছে, তাও আমি কায়দা করে বলেছি।

ঃ নেশার কথা?

ঃ জি জি! ওখানেও এক হাত দেখিয়ে দিয়েছি। বলে দিয়েছি– সুলতান সারাদিন নেশা করে বুঁদ হয়ে থাকে। এ ছাড়া, এ কথাও বলেছি যে, আপনারা তামাম গুলোই লা– ওয়ারিশ, তামামগুলোই সুলতানের–

ঃ খামোশ!

ঃ হুজুরাইন!

শান্ত্রীদের উল্লেখ করে হুসনে আরা বললো–এই উল্লুকটাকে এখনই কয়েদখানায় নিয়ে যাও। পরে ওর উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

শুনে হেকমত খাঁ চীৎকার করে বলতে লাগলো–আমার কসুর কি হুজুরাইন। খামাখা আমাকে তকলিফ্ দেবেন কেন?

হুসনে আরা সক্রোধে বললেন– তুমি ইনাকে বিল–কুল মিথ্যা খবর দিয়েছিলে কেন?

হেকমত খাঁর চোখ দুটো কপালের উপর উঠে গেল। বললো– আরে তাজ্জব! কেন দেবোনা হুজুরাইন? একবার সত্যি জবাব দিয়ে তো বেয়াকুফী করে ফেলেছিলাম। আমাদের সেপাই সংখ্যা কত, কয়জন সালার, কোথায় আমাদের সেপাইদের মূল ঘাঁটি, সুলতান এখন কোন দিকে গেছেন–এমন আরো অনেক কথার সত্যি জবাব দিয়েছিলাম বলে সুলতান আমাকে শূলে চড়াতে গেলেন। এবার কায়দা করে তামাম কথার মিথ্যা জবাব দিলাম, তবু আমাকে কয়েদ করবেন কেন?

ঃ শুধুই কয়েদ? যে সর্বনাশ তুমি করেছো, তাতে তোমার মাথাটা রাখারও আর যুক্তিনেই।

অতঃপর শান্ত্রীদের লক্ষ্য করে সে বললো, নিয়ে যাও, বাঁদরটাকে কয়েদখানায় পুরো আগে।

হেকমত খাঁকে নিয়ে শান্ত্রীরা বেরিয়ে গেল। হেকমত খাঁ "আমার কি কসুর– আমার কি কসুর" বলে চীৎকার করতে লাগলো।

তামাম ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে যেতেই দিলারা বানু 'বহিন' বলে ডুকরে উঠে হুসনে আরার বুকের উপর আছাড় খেয়ে পড়লেন। এমন একটা আহম্মকের কথাকে চরম সত্য মনে করার নির্বুদ্ধিতার জন্যে ফরমান আলী সাহেব নিজের বাহু নিজেই কামড়াতে লাগলেন।

বখতিয়ারের খাশ কামরা দিলারার জন্যে খুলে দেয়া হলো। ফরমান আলী সাহেবকেও খাস্ কামরার পাশের কামরাতেই জায়গা করে দেয়া হলো। সান্ত্বনা ও সেবার মাধ্যমে সুস্থ হয়ে উঠার পর দিলারা বানু তাদের তামাম কথা হুসনে আরাকে খুলে বললেন। হুসনে আরাও বখতিয়ারের দীলের খবর দিলারার কাছে তুলে ধরলো। দিলারার বিয়ে না হওয়ার খবর পেয়ে বখতিয়ারের ঐ মিষ্টির তুফান ছুটানোর ব্যাপারটাও বাদ দিলো না।

অবশেষে হুসনে আরা দিলারাকে বয়ান করে শুনালো যে, বখতিয়ারের শক্তির বড় উৎস দিলারাই। এমনই সে এক জানবাজ নওজোয়ান, দিলারার সংস্পর্শ তাকে আরো দুর্বার করে তুলেছে। এর সূচনা হয় দিলারা বানুর গজনীর ঐ খত থেকেই। তিব্বত জয়ে হয়তো বা যেতোই সে একদিন। যে বেপরোয়া মানুষ, অসাধ্য সাধনের ঝোঁক টানতোই

তাকে তিব্বতে। তবে দিলারার পক্ষ থেকে এই আঘাতটা দীলে তার না লাগলে, হয়তো এই ভরা শীতে ঐ শীত প্রধান অঞ্চলে সে যেতো না।

হুসনে আরার বয়ান শুনে দিলারা বানুর বুকখানা যেমন ফুলে উঠলো একদিকে, অন্য দিকে তেমনি অনুশোচনার জ্বালা অন্তরে তাঁর অবিরাম সূঁই ফুটাতে লাগলো। দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলে হুসনে আরার তামাম কথার জবাবে দিলারা বানু বললেন– নসীব বহিন, তামামই আমার নসীব।

ফরমান আলী সাহেব দিন দুই তিন বহিনের সাথে থাকলেন। অধিককাল অপেক্ষা করা তাঁর পক্ষে আদৌ সম্ভব ছিল না। দিল্লীর দরবারে তাঁর উপস্থিতির প্রয়োজন এখন অনেক। সাব্যস্ত হলো–দিলারা বানু লাখনৌতিতেই থাকবেন আর ফরমান সাহেব ওয়াপস্ যাবেন দিল্লীতে। আল্লাহ পাকের রহমতে বখতিয়ার খলজী সহিসালামতে তিব্বত থেকে ফিরে এলে, ফরমান সাহেব তাঁর ওয়ালেদকে সঙ্গে নিয়ে ফের আসবেন বাঙ্গালায়।

ফরমান আলীর বিদায় কালে হুসনে আরা বেগম তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললো– বহিনের জন্যে দীলে কোন পেরেশানী রাখবেন না ভাই সাহেব, আমাদের এই দিলারা বহিন বাঙ্গালা মুলুকের মেহমান নন, এই মুলুকের তিনিই হলেন সত্যিকারের বেগম। এই মহলে আর মুলুকে অতঃপর দিলারা বহিনের ইচ্ছাই অগ্রাধিকার পাবে।

এর সংক্ষিপ্ত জবাবে ফরমান সাহেব বললেন– সবই আপনাদের নেক নজর আর সবার উপরে ঐ আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা।

এগারো

আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার উপর কারো হাতে নেই। নসীবের হাতে ইনসান বড় অসহায়। প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষ বড় কমজোর। প্রতিকূল পরিবেশ ও ইনসানের বেইমানী, অসামান্য প্রতিভা আর উত্তাল উদ্দাম তামামই নসাৎ করতে নিয়তই সক্ষম।

বখতিয়ার শিকার হলেন এমনই এক পরিবেশের, এমনই এক প্রকৃতির, এমনই এক বেইমানীর। নসীব তাঁকে মার দিয়েছে মহব্বতে। এবার দিলো হিম্মতের খেলাতেও। জিন্দেগীর এই প্রথম এবং শেষবারের মতো, বখতিয়ার তার মকসুদ হাসিল না করেই

পথ থেকে ওয়াপস এলেন তলোয়ার হাতে। পরিবেশ আর বেইমানীর অসহায় শিকার হয়ে তিব্বত জয় না করেই বখতিয়ার খলজী পেছন ফিরলেন পথ থেকে। পেছন ফিরে মূল মোকামেও পৌছলেন না। হাজির হলেন দেবকোটে। বহাল তবিয়তে নয়। আধিব্যধি আর ঘাত-প্রতিঘাতে জরাজীর্ণ হয়ে।

ঘটনা বড় করুণ! দশ হাজার অশ্বারোহী ফৌজ নিয়ে তিব্বত জয়ে বেরিয়ে বখতিয়ার এসে হাজির হলেন দেবকোটে। আলীমেচ আগে থেকেই তৈরী ছিল। তারই পথ নির্দেশনায় তিব্বত মুখে রওনা হলেন বখতিয়ার। কিয়দ্দূর এগুতেই সামনে পড়লো বেগমতি স্রোতস্বিনী। বিশাল সে নদী। অতিক্রমের পথ নেই। ফলে,নদীর তীর বেয়ে বেয়ে পূব-উত্তর বরাবর চলতে লাগলেন বখতিয়ার। পথ তাঁর কামরূপ রাজ্যের মধ্যে দিয়ে। সাব্যস্ত হলো কামরূপই তিনি জয় করবেন আগে। পথটাকে মজবুত করে তবে যাবেন তিব্বতে।

বেইমানীর খেলাটা ঠিক এখানে শুরু হলো। নদীয়া থেকে পালিয়ে লক্ষ্মণ সেনের মন্ত্রী হলায়ুদ মিশ্র বিভিন্ন হিন্দু মুলুক ঘুরে ঘুরে তুর্কী হামলার বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী জোট গঠনের কোশেশ করে বেড়াচ্ছিলেন। এ সময় তিনি কামরূপেই ছিলেন। বখতিয়ার খলজী তিব্বত জয়ে বেরিয়েছেন শুনেই তিনি কামরূপ রাজকে বললেন-মহারাজ, পথ যখন আপনার রাজ্যের মধ্যে দিয়েই, তখন এ রাজ্য জয় না করে বখতিয়ার খলজী এগুবেনা। যে রাজ্য সামনে পড়ে সবার আগে সেটা তার জয় করা চাই-ই। সেটা জয় না করে সামনে সে এগোয়না। অর্থাৎ পেছনে শত্রু রেখে বখতিয়ার খলজী সামনের দিকে এক ধাপও তোলেন না। এটা আমাদের অভিজ্ঞতার শিক্ষা।

ভীত সন্ত্রস্ত কামরূপরাজ বললেন-তাহলে এখন উপায়? বখতিয়ারকে রোখার মতো পুরোপুরী তৈরী তো আমি নই এখন?

ঃ তার সাথে দোস্তীর খেলা খেলুন মহারাজ। ঐ তুর্কীরা এদিকে বড় বোকা। দোস্তীর হাত কেউ বাড়িয়ে দিলে তার সাথে দুষমনী তারা করেনা।

ঃ তা না হয় হলো। তাই বলে ঐ অস্পৃশ্য তুর্কীদের দোস্ত হয়ে থাকবো আমি আজীবন?

ঃ আরে ছিঃ! ছিঃ! কি যে বলেন মহারাজ? তাই কেউ থাকতে পারে, না থাকা তার উচিত?

ঃ তবে?

ঃ কায়দায় পেলেই সাবাড় করে ফেলতে হবে ওকে। কিন্তু হামদরদী দেখিয়ে আপাততঃ ঠেকাতে হবেনা কুগ্রহটাকে? একটা ফাঁক পেলেই না শক্তি সঞ্চয় করতে পারবেন লড়ার মতো?

ঃ হাঁ, তা ঠিক।

ঃ তিব্বতে সে তবুও যদি যেতে চায়, দরদ দেখিয়ে, বন্ধু সেজে নিজের রাজ্যটা আগে বাঁচান। এর পর দিন ঠেলে তিব্বতে। তিব্বতে সে এগুলেই শুরু করুন দোস্তীর খেলা। সমুদয় উপজাতিদের উস্কিয়ে দিয়ে তাদের নিয়ে ওর ফেরার পথটা রুদ্ধ করে ফেলুন- ব্যস! বাজীমাৎ!

কথাটা মনে ধরলো কামরূপ রাজের। তিনি দূত পাঠালেন বখতিয়ার খলজীর কাছে। রাস্তার মাঝে দূত এসে বখতিয়ারকে সালাম দিয়ে কামরূপরাজের পত্র বখতিয়ারের হাতে দিলো।

কামরূপরাজ বিনয় করে লিখেছেন যে,তিব্বত জয়ের সময় এটা নয়। এবার সে ফিরে গেলে পরের বছর কামরূপ রাজ নিজেও ফৌজ নিয়ে তাকে সাহায্য করবেন তিব্বত জয়ে। এর একমাত্র কারণ বখতিয়ারের মতো একজন দোস্ত পাওয়া ভাগ্যের কথা।

হলায়ুদ মিশ্রের অনুমানটাই ঠিক হলো। কামরূপের এই স্বতঃস্ফূর্ত আন্তরিকতায় বখতিয়ার খলজী গলে গেলেন। যদিও কামরূপের শক্তি বখতিয়ারের ফৌজের কাছে তৃণের অধিক নয়, এবং যদিও পেছনে দুষমন রেখে বখতিয়ার খলজী এগোন না, তবু তিনি এই প্রথমবার এবং জিন্দেগীর শেষবার খলদের বিশ্বাস করলেন এবং জিন্দেগীর চরম সর্বনাশ ডেকে আনলেন। কামরূপরাজকে দরাজদীল মনে করে তিনি তার পরিকল্পনা থেকে কামরূপ জয় বাদ দিলেন এবং একলক্ষ্যে তিব্বতের দিকে এগুতে লাগলেন। শুধু তাই নয়, ঐ দূত মারফতই বখতিয়ার কামরূপরাজকে জানালেন যে, কামরূপ রাজের এই নেক দীলের পরিচয় পেয়ে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। এই দোস্তীর যথাযথ মর্যাদা বখতিয়ার খলজী আজীবন দেবেন। তবে তিব্বত জয়ে যাওয়া থেকে তিনি বিরত থাকতে পারছেন না বলে কামরূপ রাজের কাছে তিনি ক্ষমা প্রার্থী।

নদীর তীর বেয়ে বেয়ে দিন দশেক এগিয়ে কামরূপ রাজ্যের সীমান্ত এলাকায় নদীর উপর একটা প্রস্তর নির্মিত পুল পাওয়া গেল। এই পুল পর্যন্ত বখতিয়ারকে এগিয়ে দিয়ে আলীমেচ সীমান্তের এপারে এন্তেজারে রয়ে গেল। কামরূপকে মিত্র জেনে পুল পাহারার শক্ত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন বখতিয়ার খলজীর দীলে উদয় হলো না। সামান্য ক'জন সেপাইকে পুল পাহারায় রেখে বখতিয়ার খলজী তিব্বতের দিকে এগুতে লাগলেন।

শীতকাল। উদ্ভিদহীন মালভূমি এলাকা। একটানা একপক্ষের অধিককাল চলার পর বখতিয়ার এক শস্য-শ্যমলা ক্ষেত্র এবং সেখানে এক সুরক্ষিত দুর্গ দেখতে পেলেন। এ

দুর্গ ছিল এই পার্বত্য এলাকার সেনানিবাস। বখতিয়ার সেখানে এগুতেই কল্পনারও অধিক পরিমাণ সেপাই ঐ দুর্গ থেকে বেরিয়ে এলো এবং বখতিয়ারকে ঘিরে ধরলো। এরাও অশ্বারোহী ফৌজ এবং এদের অশ্ব গুলোও তুর্কীস্তানের অশ্ব। তদুপুরি এই সেপাইরা এই তীব্রতম শীত এলাকার লোক। শীত কোন প্রতিবন্ধকই নয় এদের। শীতে কাবু বখতিয়ারের সেপাইদের এরা বাঘের মতো ঘিরে ধরলো।

শুরু হলো তীব্রতম লড়াই। দিনমান জানপ্রাণ লড়ে বখতিয়ার এই দুর্গ জয় করলেন বটে, কিন্তু এই যুদ্ধে তার সৈন্য সংখ্যা অর্ধেকে নেমে এলো। বাঁকী যারা রইলো প্রচন্ড শীতে তারাও অত্যন্ত কমজোর হয়ে পড়লো। এছাড়া, এ দুর্গের বন্দী কিছু সেপাইদের কাছে বিশ্বস্ত ভাবে খবর নিয়ে জানা গেলো—সেখান থেকে ক্রোশ বিশেক দূরে করমবর্তন শহরে পঞ্চাশ হাজার অশ্বারোহী বখতিয়ারকে ঘায়েল করতে ওঁৎ পেতে আছে।

পরিবেশ প্রতিকূল। প্রকৃতি ক্রুদ্ধ। প্রচণ্ড শীতের পথঘাট বিবর্জিত এলাকা। সর্বোপরি বখতিয়ারের অবশিষ্ট সেপাইদের অধিকাংশই অসুস্থ। বাধ্য হয়ে বখতিয়ারকে এবারের মতো তিব্বত জয় স্থগিত রেখে পেছনের পথ ধরতে হলো।

ফেরার পথে কিয়দ্দূর এগিয়েই বখতিয়ারের চোখ উঠলো কপালে। তিনি যার পর নেই তাজ্জব হলেন কামরূপ রাজের আচরণে। মুখোশ খুলে ফেলেছেন কামরূপ রাজ। প্রতি ধাপে ধাপে কামরূপ রাজের ফৌজ স্থানীয় উপজাতিদের সাথে নিয়ে বখতিয়ারের বাহিনীর উপর হামলা চালাতে লাগলো। এদের বিরুদ্ধে প্রাণপণে লড়তে লড়তে বখতিয়ারকে এগিয়ে আসতে হলো। সুদীর্ঘ পথের মধ্যে একটা কদম পথও বখতিয়ারের ফৌজ তলোয়ার কোষ বদ্ধ করে এগিয়ে আসতে পারলো না। সেরেফ তাই নয়, বখতিয়ারের পথের দুই ধারে মানুষের এবং ঘোড়ার তামাম আহার্য কামরূপ রাজ বিনষ্ট করে দিয়েছিলেন। কোথাও কোন ঘাস, শস্যকণা বা মানুষের এবং ঘোড়ার কোন আহার্যের অস্তিত্বই তিনি রাখেননি। সুদীর্ঘ এক পক্ষকাল বিলকুল অনাহারে থেকে ঘোড়াগুলি মুমূর্ষু হয়ে যেতে লাগলো। খাদ্যের অভাবে দুর্বল ও মুমূর্ষু ঘোড়াগুলো জবেহ করে খেয়ে খেয়ে সেপাইরা পথ চলতে লাগলো।

তামাম রাস্তা কামরূপ রাজ আর উপজাতিদের সাথে লড়তে লড়তে শ্রান্ত ক্লান্ত বখতিয়ার তার শ্রান্ত ক্লান্ত বাহিনী নিয়ে নদীর নিকট পৌঁছে দেখেন পাহারারত সেপাইদের হত্যা করেছে কামরূপরাজের ফৌজ এবং নদীর মাঝখানে পুলের দুইটি খিলান বিলকুল ভেঙ্গে দিয়েছে তারা। নদী পারের আর পথ নেই। পথ নেই বখতিয়ার খলজীর স্বমুলুকে ওয়াপস্ আসার।

সামনের পথ দুর্লঙ্ঘ, পেছনের পথ রুদ্ধ। নদীটি আর অতিক্রম করতে না পেরে বখতিয়ার নদীর তীরেই এক মন্দিরের মধ্যে সসৈন্য আশ্রয় নিলেন এবং নদী পারের ভেলা বা নৌকা সংগ্রহের প্রয়াস পেতে থাকলেন। কিন্তু কামরূপরাজ সে অবকাশও দিলেন না। নিজের এবং কয়েকটি অঙ্গরাজ্যের ফৌজ নিয়ে এসে ঐ মন্দির ঘিরে ফেললেন এবং তাঁর সৈন্যরা মন্দিরের চার পাশে বাঁশ পুঁতে অবরোধ প্রাচীর তৈয়ার করলো। চারদিকের তামাম রাহা বন্ধ হয়ে আসছে দেখে বখতিয়ার তার অবশিষ্ট মুমূর্ষু ফৌজ নিয়ে মরিয়া হয়ে হামলা করে প্রাচীরের এক অংশ ভেঙ্গে ফেললেন এবং মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে নদীর তীরে দাঁড়ালেন। কয়েকজন সেপাই ইতি মধ্যেই নদীতে নেমে অনেক দূর এগিয়ে গেল তবু বুকের উপরে পানি নেই দেখে তারা চীৎকার করে বললো– পথ পাওয়া গেছে, পথ পাওয়া গেছে–

সঙ্গে সঙ্গে ফৌজ নিয়ে বখতিয়ার খলজী নদীতে ঝাঁপ দিলেন। কিন্তু বদনসীব! নদীর ঐ স্থানটি ছিল একটা মগ্নচরা। এর পরেই নদীটি খুব গভীর। মরু অঞ্চলের এই তুর্কীরা সাঁতারে খুবই অপটু। ফলে, সঙ্গে সঙ্গে বখতিয়ারের অবশিষ্ট ফৌজের প্রায় তামামটাই সলিল সমাধি লাভ করলো। মাত্র শত খানেক সেপাই নিয়ে বখতিয়ার যখন কোন ক্রমে নদীর এপারে এলেন, তখন তারা সকলেই উত্থান শক্তি রহিত।

আলীমেচ তার আত্মীয় স্বজন নিয়ে নদীর এপারে এন্তেজারেই ছিল। তাদের সাহায্যে বখতিয়ার খলজী কোন মতে দেবকোটে এসে পৌঁছলেন। তখন তিনি জ্ঞানহীন। আধিব্যাধি আর ক্ষতের ব্যথায় তিনি তখন মুমূর্ষু। ফলে দেবকোটেই তিনি শয্যা গ্রহণ করলেন এবং মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়তে লাগলেন।

লাখনৌতিতে বসে তখন নয়া জিন্দেগীর আঁক কষছেন দিলারা বানু বেগম। অতীত তার তিমিরাচ্ছন্ন হলেও, সামনে তাঁর এক অত্যুজ্জ্বল সোনালী দিনের হাতছানি। ভুল বুঝাবুঝির পালা তাদের খতম। তামাম দুঃখের সমাপ্তি এখন সন্নিকট। আল্লাহর রহমে বখতিয়ার খলজী লড়াই থেকে ওয়াপস্ এলেই তাঁর রিক্ত জীবন ভরে উঠবে কানায় কানায়। খুলে যাবে তাঁর নয়া জিন্দেগীর আলো ঝলমল রাহা।

সম্ভাব্য সুখ স্বপ্নের বুক ভরা আশা নিয়ে দিন কাটছে দিলারার। নিঁদের মাঝেও অশ্ব পদের শব্দ শুনে চমকে চমকে উঠছেন তিনি। ভাবছেন—ঐ বুঝি ওয়াপস এলেন বখতিয়ার! হর রাতেই খোয়াবের মাঝে বখতিয়ার খলজীর মুখ দেখছেন তিনি। খবর পাচ্ছেন ফিরে এসেছেন বখতিয়ার! এমনি ওয়াক্তে দেবকোট থেকে লাখনৌতিতে

পয়গাম এলো তিব্বত থেকে ফিরে এসেছেন বখতিয়ার। তিনি এখন দেবকোটে। তবে, এখন তিনি রোগশয্যায় এবং অবস্থা তার সংকটজনক।

খবর পেয়েই দিলারা বানু দিওয়ানা হয়ে উঠলেন। হুসনে আরার বুকের উপর আছড়ে পড়ে বললেন– বহিন, এখন উপায়?

উপায় তখন হাতের কাছে সত্যিই কিছু ছিল না। বখতিয়ার খলজীর ইয়ারেরা সবাই তখন রাজধানী থেকে দূরে। বখতিয়ার খলজীর তদারকে যাওয়ার মতো সেপাই–সৈন্য ছাড়া নিকটের কোন পুরুষ মানুষ মহলে তখন ছিল না। আহম্মদ খলজীও ইওজ খলজীর আহবানে গত পরশুই জরুরী এক কাজে গঙ্গতীরে চলে গেছে।

তবু কিঞ্চিৎ চিন্তা করার পর হুসনে আরা দিলারাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো–অধীর হয়োনা বহিন। মুসিবতে ধৈর্য হারালে চলবে কেন? চিন্তার কোন কারণ নেই। এক্ষুণি আমি সব ব্যবস্থা করে ফেলছি।

দিলারা বানু অসহায় কণ্ঠে বললেন– কি রকম?

ঃ মানে ছোট মিয়ার বন্ধুদের কাছে এখনই আমি পয়গাম সহ লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি। পয়গাম পেলেই তাঁরা সবাই ছুটে যাবেন দেবকোটে। যা করণীয় তারাই তখন করবেন।

হুসনে আরা তৎক্ষণাৎ সেপাইদের তলব দিলো এবং তাদের মারফত উওজ খলজী ও শিরান খলজীর কাছে খবর পাঠিয়ে দিলো। অপেক্ষাকৃত এরাই তখন হাতের কাছে ছিল।

কিন্তু দিলারাকে শান্ত করা গেলনা। বখতিয়ার খলজী দেবকোটে রোগ শয্যায়। দিলারা বানু এখানে সুখশয্যায় রাত কাটান কেমন করে! আল্লাহ না করুন, খারাপ কিছুও ঘটে যেতে পারে। এহেন অবস্থায় দিলারা বানু নিশ্চিন্ত থাকেন কি করে? নিজের জান বাজী রেখে যে তাঁর জান বাঁচিয়েছেন একদিন, সেই বখতিয়ারের জান আজ বিপন্ন। মহব্বতের প্রশ্ন কিছু না থাকলেও, দিলারা তার পাশে গিয়ে না দাঁড়িয়ে অন্যের উপর ভরসা করে চুপচাপ বসে থাকেন কি করে। সবার উপরে, নিদঘুম ছেড়ে দিয়ে যে বখতিয়ারের পথ চেয়ে বসে আছেন দিলারা, ওয়াপস্ আসার পরও বখতিয়ারের সান্নিধ্যে না গিয়ে কি দিলারা বানু পারেন, বিশেষ করে, তার অবস্থা যখন সংকটজনক?

দিলারা বানু জিদ ধরলেন–দেবকোটেই যাবেন তিনি। তাঁর ইচ্ছাকে কিছুমাত্র অগ্রাধিকার দেয়া হলে, তাঁর দেবকোটে যাবার ব্যবস্থা করা হোক।

দিলারা বানু নাছোড় বান্দা। অগত্যা দেবকোটেই দিলারা বানুকে পৌছানোর ব্যবস্থা করা হলো। সুসজ্জিত পালকী এসে হাজির হলো। দিলারা বানু পালকীতে উঠে বসলেন।

শক্তিশালী চার বেহারা কাঁধে নিলো পাল্কী। দেবকোটের পথ ধরে একটানা ছুটে চললো তারা। সঙ্গে রইলো বিশ্বস্ত এক অধিনায়কের অধীনে সুশৃঙ্খল এক পাহারাদার বাহিনী।

কিন্তু তামামই পন্ডশ্রম। পথের পাল্কী পথের মাঝেই রয়ে গেল। দেবকোটে জীবন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো বখতিয়ারের। হেকিমের পর হেকিম এসে হতাশ দীলে ওয়াপস্ চলে গেল। আর কোন আশাই নেই বখতিয়ারের জীবনের। জীবনীশক্তি তামামই তাঁর শেষ হয়ে এসেছে। সংজ্ঞালুপ্ত অসাড় তাঁর দেহখানা শয্যার উপর পড়ে আছে। নাক দিয়ে কোন মতে ক্ষীণ একটা বায়ু প্রবাহ আসা-যাওয়া করছে। যে কোন সময় থেমে যাবে এ প্রবাহ।

বখতিয়ারের অন্যতম ইয়ার আলী মর্দান খলজী এ সময় বাঙ্গালার এই উত্তরাঞ্চলের দায়িত্ব নিয়েছিল। সংবাদ পেয়েই আলী মর্দান ছুটে এলো দেবকোটে। বন্ধুর কক্ষে ছুটে গিয়ে সে অবস্থা দেখে খামোশ হয়ে গেল। বাঁচার আর সত্যিই কোন আশা নেই বন্ধুর! ঐ বন্ধ চোখ খোলার আর তিলমাত্র সম্ভাবনাও নেই।

আচানক তার কপালে একটা কুঞ্চন দেখা দিলো। মুহূর্তখানেক নিশ্চুপ হয়ে চিন্তা করলো আলী মর্দান। লাখনৌতির মসনদ এখন ফাঁকা। দাবীদার তার অনেক। দাবীর ক্ষেত্রে তার স্থান তিন বা চারের পর। অথচ আগে যে বসতে পারবে, বাঙ্গালার মসনদ তার।

চকিতে সে চারদিকে নজর দিলো। কক্ষে কেউ নেই। কক্ষের বাইরে অল্প কিছু জনসমাগম থাকলেও, রোগীর কক্ষ নির্জন। কটিদেশের খাপ থেকে সে নিঃশব্দে খঞ্জর টেনে বের করলো। দ্রুত পদে এগিয়ে গেল রোগীর পাশে। ক্ষিপ্রহস্তে মৃতপ্রায় বখতিয়ার খলজীর বুকে তা আমূল বসিয়ে দিলো।

কিঞ্চিৎ নড়ে উঠলেন বাঙ্গালা মুলুকের প্রথম সুলতান ইখতিয়ার উদ্দীন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী। অতঃপর সব স্তব্ধ! স্তব্ধ হলো ক্ষীণ সেই বায়ু প্রবাহটুকুও। জিন্দেগীর তামাম রণ, কওমের তামাম খেদমত, অসাধ্য সাধনের তামাম আনযাম চুকিয়ে দিয়ে গরম শিরের সেই লা-ওয়ারিশ নওজোয়ান নিঃসঙ্গ অবস্থায় দেবকোটের নির্জন এক কক্ষে চির নিদ্রায় শায়িত হয়ে রইলেন। বাঙ্গালা মুলুকে মুসলমান হুকুমাতের এই বেপরোয়া পথিকৃৎ লড়ে গেলেন জীবন ভর, দিয়ে গেলেন অনেক, কিন্তু পেলেন না কিছুই।

পাল্কীর মধ্যে থাকতেই এই দুঃসংবাদ দিলারা বানুর কানে গেল। পাল্কীর দুয়ার যখন খোলা হলো, তখন দেখা গেল, দিলারা বানু নেই। পাল্কীর মধ্যে পড়ে আছে তার লাশ।

খতম